অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

॥ দ্বিতীয় খণ্ড ॥

সিগনেট প্রেস ॥ কলকাতা ২০
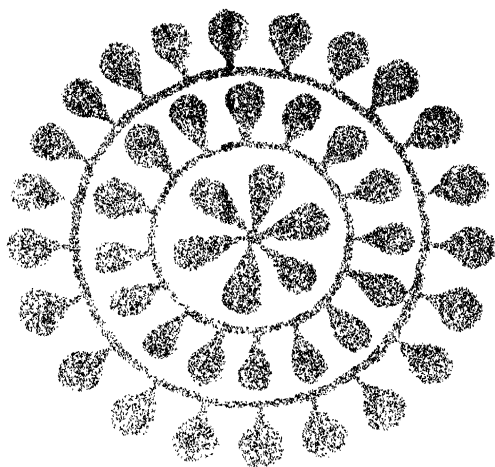
"তুমি সংসারে থেকে ঈশ্বরের প্রতি মন রেখেছ, এ কি কম কথা? যে সংসারত্যাগী সে তো ঈশ্বরকে ডাকবেই। তাতে আর বাহাদুরি কি! সংসারে থেকে যে ডাকে সেই ধন্য। সে বিশমণ পাথর সরিয়ে তবে দেখে।"—**শ্রীরামকৃষ্ণ**

"যস্য বীর্যেণ কৃতিনো বয়ং চ ভুবনানি চ।
রামকৃষ্ণং সদা বন্দে শর্ব্বং স্বতন্ত্রমীশ্বরম্॥
যাঁর শক্তিতে আমরা ও সমুদয় জগৎ কৃতার্থ সেই শিবস্বরূপ স্বাধীন ঈশ্বর শ্রীরামকৃষ্ণকে আমি সদা বন্দনা করি।"—**স্বামী বিবেকানন্দ**

"শ্রীরামকৃষ্ণ ভারতবর্ষের সমগ্র অতীত ধর্ম-চিন্তার সাকার বিগ্রহস্বরূপ। যে তাঁকে নমস্কার করবে সে সেই মুহূর্তে সোনা হয়ে যাবে।"—**স্বামী বিবেকানন্দ**

॥ ওঁ ভগবতে শ্রীরামকৃষ্ণায় নমঃ ॥

প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় যা লিখেছি দ্বিতীয় খণ্ডেরও সেই কথা। দিয়াশলাই জেবলে সূর্যকে দেখানো যায়না, কিন্তু গৃহকোণে পূজার প্রদীপটি হয়তো জ্বালানো যায়। আমার এ বই শুধু সেই দীপ-জ্বালানো পূজা, দীপ-জ্বালানো আরতি।
এ বইয়ে যত তথ্য সংগৃহীত হয়েছে সবই কোনো না কোনো পূর্বলিখিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থ থেকে আহৃত। কোনো তথ্যই আমার কপোলকল্পনা নয়।
বাক্য ঈশ্বরের বিভূতি, কিন্তু ঈশ্বর আবার সমস্ত বাক্যের অতীত। অথচ বচন ছাড়া সে অনির্বচনীয়ের আভাস আনি কি করে? শব্দ ছাড়া কি করে বোঝাই আমার কান্না? কিন্তু সব সময়ে ভয়, বাক্য বুঝি আভরণ না হয়ে আবর্জনা হয়ে উঠল! আর, আভরণ হলেই বা কি, আভরণ দিয়েই কি রূপ বোঝানো যায়? বর্ণ দিয়ে কি বোঝানো যায় অবর্ণনীয়কে? তবু ভয়, এই বুঝি মহিমান্বিতকে খর্ব করে ফেললাম!
কিন্তু ভগবানকে ছোট করি এমন আমাদের সাধ্য কি! তিনি নিজের থেকেই ছোট হয়েছেন ভক্তের জন্যে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, ভক্তের কাছে ঈশ্বর ছোট হয়ে যান, যেমন ঠিক অরুণোদয়ের সূর্য। তিনি ছোট না হলে তাঁকে ধরি কি করে? মধ্যাহ্নের সূর্যের তেজে চোখ যে ঝলসে যাবে। ধরা দেবার জন্যে তিনি স্বেচ্ছায় ছোট হয়েছেন। সুলভ হয়েছেন আমরা দুর্বল বলে। সুকোমল হয়েছেন যেহেতু আমরা ভঙ্গুর। রিক্ত হয়েছেন যেহেতু আমরা নিঃসম্বল। বললেন শ্রীরামকৃষ্ণ, 'ভক্তের জন্যে ভগবানের নরম ভাব হয়ে যায়, তিনি ঐশ্বর্য ত্যাগ করে আসেন।'
তিনি তো খাজনা আদায় করতে আসেননি, তিনি প্রেম ভিক্ষা করতে এসেছেন। বালগোপাল হয়ে এসেছেন ননী ভিক্ষা করতে। তাই দুয়ারের বাইরে ফেলে এসেছেন তাঁর প্রতাপের রাজমুকুট, তাঁর ঐশ্বর্যের সাজসজ্জা। প্রবঞ্চিতের বন্ধু বলে নিষ্কিঞ্চন হয়ে এসেছেন। রাজ্যেশ্বর হয়ে ফিরছেন কাঙালের মত। 'ওরে, তারে কেউ চিনলি না রে,' বললেন শ্রীরামকৃষ্ণ : 'সে পাগলের বেশে দীন হীন কাঙালের বেশে ফিরছে জীবের ঘরে-ঘরে।' যে কাঙাল তার কী আর আছে যে কেড়ে নেব?

'ভক্তি তাঁর কেমন প্রিয়?' বললেন শ্রীরামকৃষ্ণ : 'খোল দিয়ে জাব যেমন গরুর প্রিয়।' শুধু দেখতে হবে জাবে খোল মেশানো হল কিনা। বাক্যের মধ্যে আন্তরিকতা আছে কিনা। ডাকের মধ্যে আছে কিনা অন্তরঙ্গতার সুর। নিমন্ত্রণের মধ্যে আছে কিনা আতিথেয়তার আস্বাদ।

কাঁদতে-কাঁদতে যেমন শোক হয়, তেমনি নাম করতে-করতে প্রেম জাগুক। পঙ্কশয্যা থেকে জাগুক এবার নিষ্কলঙ্ক শতদল। জীবনের নির্বাসনে আসুক এবার মুক্তির সুসংবাদ—নির্বাসনার স্বাক্ষরে। সমস্ত অন্ধকারে জ্বলুক এই প্রার্থনার দীপশিখা।

৬ই ফাল্গুন ১৩৫৯

অচিন্ত্যকুমার

পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ
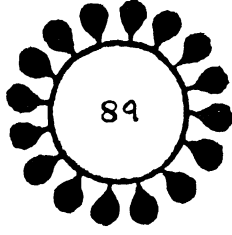
সমস্ত সাধনার ইতি করে দিলে রামকৃষ্ণ।

আর পাখা চালিয়ে কী হবে? দক্ষিণ থেকে চলে এসেছে মলয় হাওয়া। আর কী হবে দাঁড় টেনে? ব্যাঁক কাটিয়ে অনুকূল বায়ুতে পাল তুলে দে নৌকোর। সাধনের প্রথম অবস্থাতেই খাটনি। তার পরে পেনসন। প্রথমে সিঁড়ি ভাঙা, পরে পাহাড়ের চূড়ায় পরেশনাথের মন্দির।

সিদ্ধি-সিদ্ধি বললে কি হয়? সিদ্ধি গায়ে মাখলেও নেশা হয় না। খেতে হয় একটু। দুধে মাখন আছে বললেই কি মাখন হবে? দুধকে দই পেতে মন্থন করো নির্জনে।

'হরিসে লাগি রহ রে ভাই। তেরা বনত বনত বনি যাই।'

হরিতে লেগে থাকো। লেগে থাকতে-থাকতেই হরি হয়ে যাবে। বলতে-বলতেই হরি ব'নে যাবে।

রামকৃষ্ণ হরি হয়ে গেছে। যে আছে সে-ই হয়েছে। এই হওয়া অর্থ থাকাটিকেই প্রকাশিত করা। এর পর আবার সাধন কি?

বাউল বৈষ্ণবরা বলে, সাঁই। 'সাঁইয়ের পর আর কিছু নাই।'

রামকৃষ্ণেরও আর কিছু নেই। রামকৃষ্ণের পরেও আর কিছু নেই।

বৈষ্ণব বাউলরা একেই বলে সহজ অবস্থা। সহজ অবস্থার দুটি লক্ষণ। প্রথম, কৃষ্ণগন্ধ গায়ে নেই। তার মানে ঈশ্বরের ভাব অন্তরে ওতপ্রোত, বাইরে কোনো চিহ্ন নেই, মুখে হরিনাম পর্যন্ত বলছে না। আর দ্বিতীয়, পদ্মের উপরে অলি বসবে অথচ মধু খাবে না। তার মানে, জিতেন্দ্রিয়, কাম-কাঞ্চনে স্পৃহা নেই। রামকৃষ্ণের এখন সেই সহজ অবস্থা।

অনেক পিত্ত জমলে ন্যাবা লাগে, তখন চার দিক হলদে দেখায়। অনেক ভক্তি জমলে মধু লাগে, তখন চার দিক হরি দেখায়। শ্রীমতী যখন শ্যামকে ভাবলে, সমস্ত শ্যামময় দেখলে। আর নিজেকেও শ্যাম বোধ হল। রামকৃষ্ণ সমস্ত বিশ্ব ঈশ্বরময় দেখল, দেখল সেও ঈশ্বর। পারার হ্রদে শিশে অনেক দিন থাকলে শিশেও পারা হয়ে যায়। রামকৃষ্ণ ভগবানের মধ্যে আচ্ছন্ন হয়ে থেকে ভগবান হয়ে গেল। কুমুরে পোকা ভাবতে-ভাবতে আরশুলা নিশ্চল হয়ে যায়, নড়ে না, শেষে তাকে আস্তে-আস্তে কুমুরে পোকাই হতে হয়। রামকৃষ্ণ ব্রহ্ম ভাবতে-ভাবতে ব্রহ্ম হয়ে গেল। যে নিরাকার ছিল সে হয়ে দাঁড়াল নরাকার।

তার আবার সাধন ভজন কি! হরি আবার কবে হরিনাম করে!
যার খোলা নেমেছে তার আবার জ্বাল কিসের?
কিন্তু খোলা নামবে কখন? এক জন বাউল এসেছে রামকৃষ্ণের কাছে। রামকৃষ্ণ তাকে শুধোল : 'তোমার খোলা নেমেছে?'
বাউল তাকিয়ে রইল অবাক হয়ে।
'বলি রসের কাজ সব শেষ হয়ে গেছে? যত জ্বাল দেবে তত "রেফাইন" হবে রস। প্রথম আকের রস, পরে গুড়, পরে দোলো, পরে চিনি—তার পর মিছরি—কিন্তু, জিগগেস করি, খোলা নামবে কখন? অর্থাৎ সাধন কবে শেষ হবে?'
বাউল শুনতে লাগল মন্ত্রমুগ্ধের মত।
'যখন ইন্দ্রিয় জয় হবে। তার আগে নয়। যেমন জোঁকের উপর চুন দিলে জোঁক আপনি খুলে পড়ে যায় তেমনি শিথিল হয়ে যাবে ইন্দ্রিয়। তার আগে নয়।'
জ্বাল নিভিয়ে খোলা নামিয়ে বসে আছে রামকৃষ্ণ। সে এখন আকাশের মৌন। সমুদ্রের শান্তি। ধরিত্রীর সমর্পণ।
ওঁকার ধনু, আত্মা শর আর ব্রহ্ম লক্ষ্য। নির্ভুল চোখে লক্ষ্য ভেদ করতে হবে, তার পর তীরের মুখে লক্ষ্যের সঙ্গে তন্ময় হতে হবে। ব্রহ্মতল্লক্ষ্যমুচ্যতে।
'কিন্তু জানিস, তাঁকে যখন লাভ হয়, তখন আর ওঁ উচ্চারণ করবারও যো নেই। সমাধি থেকে অনেক নিচে নেমে না এলে ওঁ বলতে পারি না।'
শাস্ত্রে যেমন বলা আছে তেমনি দর্শন হয় রামকৃষ্ণের। কখনো দেখে জগৎময় আগুনের স্ফুলিঙ্গ। কখনো দেখে চার দিকে যেন পারার হ্রদ ঝকঝক করছে। কখনো বা গলিত রুপোর স্রোত। কখনো বা গ্রহতারায় রংমশালের ফুলঝুরি। নীলিমাভ্রমের ঊর্ধ্বে কখনো বা অন্তহীন অন্তরীক্ষের শুভ্রতা।
রামকৃষ্ণ এখন একটি অখণ্ড প্রাপ্তি, একটি অখণ্ড প্রত্যুত্তর।
একটি আকাশবিস্তীর্ণ প্রশান্ত স্তব্ধতা।
কিন্তু ব্রহ্ম নিয়ে আমি কতক্ষণ থাকব? ছাদে উঠে আবার সিঁড়িতে নামা। কখনো লীলায় কখনো নিত্যে—যেন ঢেঁকির পাটে ওঠা-নামা করছি। এক দিক নিচু হয় তো আরেক দিক লাফিয়ে ওঠে। যেদিকে তাকাই সেদিকে তিনি। অন্তর্মুখে সমাধিস্থ হয়ে আছি তখনো তিনি, বহির্মুখে জীবজগৎ নিয়ে আছি তখনো তিনি। যখন আরশির এ পিঠ দেখছি তখনো তিনি, আবার যখন উলটো পিঠ দেখছি তখনো তিনি।
শিব হয়ে আছি, তিনি। জীব হয়ে আছি, তিনি।
তুষের দ্বারা আবৃত থাকলেই ধান্য, তুষ থেকে মুক্ত হলেই তণ্ডুল। জীবে-শিবে ভেদ নেই। ভেদ হচ্ছে ভ্রান্তির ফল। কোরকে যেমন পুষ্পভাব, প্রস্ফুটিত পুষ্পেও তেমনি কোরকত্ব। ঈশ্বরে যেমন জীবভাব, জীবে তেমনি ঈশ্বরভাব।
কিন্তু যাই বলো বাপু, নির্বিকল্প ব্রহ্ম হয়ে বসে থাকতে পারব না। বালকের মতন থেকেছি, থেকেছি উন্মাদের মত। কখনো জড় হয়েছি, কখনো পিশাচ। তারপর আবার নিত্য থেকে চলে এসেছি লীলায়। রামলালাকে কোলে নিয়ে

বেড়িয়েছি, নাইয়েছি-খাইয়েছি। হনুমান সেজে গাছে উঠে বসেছি, আস্ত-আস্ত ফল খেয়েছি। তারপর শ্রীমতী হয়ে কৃষ্ণময় হয়ে গেলাম। আবার লীলা ছেড়ে নিত্যে মন উঠে গেল। ত্যাজ্য-গ্রাহ্য রইল না। সজনে তুলসী সব এক হয়ে গেল। যত ঈশ্বরীয় পট বা ছবি ছিল সব খুলে ফেললাম। হয়ে গেলাম সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ আদি পুরুষ। সেই আদি যার আর অন্ত নেই।

সব রকম সাধনই করেছি। তামসিক, রাজসিক আর সাত্ত্বিক। জয় মা কালী, দেখা দিবিনে? দেখা যদি না দিবি তো গলায় ছুরি দেব। এই হল তামসিক সাধন।

রাজসিক সাধনে নানারকম ক্রিয়াকলাপ, অনুষ্ঠানের সমারোহ। এত তীর্থ করতে হবে, এত পুরশ্চরণ, এত পঞ্চতপা! আর সাত্ত্বিক সাধনা শান্তশীলের সাধনা। ফলাকাঙ্ক্ষা নেই, শুধু নামটি নিয়ে নির্নিমেষ হয়ে পড়ে থাকো। নাম দিয়ে-দিয়ে কাম ধুয়ে ফেল।

আর কাম ঘুচলেই মনস্কাম।

আমারই মতন রূপ কে একজন প্রবেশ করলে আমার মধ্যে। দেহের ঘটপদ্ম ফুটে উঠল তার আবির্ভাবে। নিম্নমুখ ছিল, ঊর্ধ্বমুখ হয়ে উঠল।

আমি জীবের জন্যে এসেছি জীবের মধ্যেই থাকব। থাকব "ডাইলিউট" হয়ে। আমার আপন জন কত আসবে আমার কাছে, কত আহ্লাদের দিন আছে, কত ভাবের আস্বাদের দিন।

গাঁজাখোরকে দেখলে গাঁজাখোরই আহ্লাদ করে। গায়ে পড়ে কোলাকুলি করে। অন্য লোক দেখলে মুখ লুকোয়। গরু আপন জনকে দেখলে গা চাটে, অন্য লোক দেখলে ঢুঁ মারে।

আমার আপন জন সব যখন আসবে তখন আমাকে আপন ভাষায় কথা বলতে হবে। ব্রহ্ম হয়ে বোবা হয়ে থাকলে আমার চলবে কেন?

পাকা ঘির কোনো শব্দ থাকে না। কিন্তু যখন আবার পাকা ঘিয়ে কাঁচা লুচি পড়ে, তখন একবার কলকল করে ওঠে। কাঁচা লুচিকে পাকা করে আবার সে চুপ হয়ে যায়।

এই ঘিয়ে পড়বে অনেক কাঁচা লুচি। তাই একটু কলকল না করে উপায় নেই।

মৌমাছি যতক্ষণ ফুলে না বসে ভনভন করে। ফুলে বসে মধু খেতে আরম্ভ করলে চুপ হয়ে যায়। মধু খেয়ে যখন মাতাল হয় তখন আবার আনন্দে গুনগুন করে।

তাই আমাকে গুনগুন করতে দিস। গান গাইতে দিস প্রাণ ভরে।

'ত্রিসন্ধ্যা যে বলে কালী
পূজা সন্ধ্যা সে কি চায়?
সন্ধ্যা তার সন্ধানে ফেরে
কভু সন্ধি নাহি পায়।'

পুকুরে কলসীতে জল ভরবার সময় একবার ভক-ভক করে। পূর্ণ হয়ে গেল আর শব্দ হয় না। কিন্তু আরেক কলসীতে যদি ঢালাঢালি হয় তখন আবার শব্দ ওঠে।

স্তব্ধতায় ব্রহ্ম, আবার শব্দেও ব্রহ্ম। আমাকে এখন একটু শব্দ করতে দে। আমার আপন লোকরা সব আসবে, তাদের সঙ্গে আমি নৃত্য করব না?

আগেকার লোক বলত, কালাপানিতে জাহাজ গেলে ফেরে না। ওরে, ভয় নেই, আমার রিটার্ন টিকিট কাটা আছে। আমি বারে-বারে ফিরে-ফিরে আসি।

'হা'-র পর একবার ডুব দিয়ে ফের ফিরে আসি 'নি'-তে। জানিস না সেই কিত্তনের কান্ড? কিত্তনে প্রথমে গান ধরে 'নিতাই আমার মাতা হাতি! নিতাই আমার মাতা হাতি!' তারপর ভাব যখন জমে, তখন শুধু বলে, 'হাতি! হাতি!' তার পর কেবল 'হাতি'! শেষকালে 'হা'। বলতে-বলতে সমাধি, একদম চুপচাপ।

কিন্তু আমি 'হা'র পর আবার 'নি'-তে ফিরে আসি। শোনবার জন্যে তোরা যে সব রয়েছিস উৎকর্ণ হয়ে। তোদের তৃষিত কর্ণে আমাকে যে নাম দিতে হবে। আমার কি ফাঁকি দিলে চলবে? শ্যামপুকুরে পৌঁছেছি বলে কি আমি তেলি-পাড়ার খবর রাখব না?

শোন, দুটি ভাব নিয়ে থাকবি। এক দাসভাব, আরেক সন্তানভাব। অহং তো আর যায় না, হাজার বিচার করো, ঘুরে-ফিরে ফের এসে উঁকি মারে। আজ অশ্বত্থ গাছ কেটে দাও, কাল আবার ফেঁকড়ি বেরুবে। উপায় কি? উপায় হচ্ছে, আমি ভক্ত, আমি দাস, আমি বালক এই ভাবটি আরোপ করা। মিষ্টি খেলে অম্বল হয় কিন্তু মিছরির মিষ্টিতে হয় না। অকামো বিষ্ণুকামো বা। বিষ্ণুকামনা কামনা নয়।

আর শেষ ভাব, মুখ্য ভাব—সন্তানভাব। পূজায় আদ্যাশক্তিকে প্রসন্ন করতে না পারলে কিছুই হবে না। সেই ব্রহ্মময়ীর প্রতিমাই তো স্ত্রীজাতি। মাতৃভাবই তাই শুদ্ধ ভাব। সে ভাবেই তাদের প্রাণময় অভিষেক। আর কোনো ভাবে নয়। আমি মাতৃভাবেই ষোড়শী পূজা করেছিলাম। দেখলাম স্তন মাতৃস্তন, যোনি মাতৃযোনি।

শ্রীমাকে জিগগেস করল এক জন ভক্ত : 'মা, আপনি ঠাকুরকে কি ভাবে দেখেন?' শ্রীমা কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থাকলেন। পরে গম্ভীর মুখে বললেন, 'সন্তানের মত দেখি।'

ওরে এইটিই মহাভাব।

সারাৎসার বস্তু হয়েও ঈশ্বর ভাবরূপ ধরে রয়েছেন। আমাকেও থাকতে দে ভাবমুখে।

'এবার ভালো ভাব পেয়েছি।
ভবের কাছে পেয়ে ভাব
ভবীকে ভালো ভুলায়েছি।'
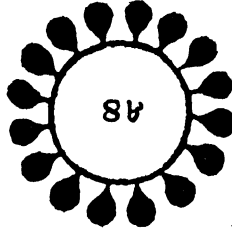
জ্যৈষ্ঠ মাসে ষোড়শী পুজা হল, আশ্বিন কি কার্তিকেই সারদা ফিরে গেল কামারপুকুর। শাশুড়ি বললেন ফিরে যেতে। ভাবের সংসার তো দেখলে এবার একটু অভাবের সংসারটা দেখে এস।

রামেশ্বর বুঝতে পারছে তার দিন আর বেশি নেই। বাড়ির সামনে একটা আমগাছ কাটছে, রামেশ্বর বললে, ভালোই হল আমার কাজে লাগবে।

পাঁচ-সাত দিন পরে, অগ্রহায়ণ মাসে, চোখ বুজল রামেশ্বর।

গাঁয়ের গোপাল কাছাকাছিই থাকে। রাত্রে হঠাৎ তার বাড়ির দরজায় একটা শব্দ হল।

'কে ?'

'আমি রামেশ্বর।'

'এত রাত্রে ?'

'গঙ্গাস্নানে যাচ্ছি। বাড়িতে রঘুবীর রইল, তার সেবায় যাতে গোল না হয় দেখো।'

দরজা খুলতে এগিয়ে গেল গোপাল।

'দোর খুলে কী হবে ? আমার শরীর নেই, আমাকে দেখতে পাবে না।'

খবর এসে পৌঁছুল দক্ষিণেশ্বরে। রামকৃষ্ণের ভাবনা ধরল এ দুঃসংবাদ মাকে কি করে শোনাই ! এ শোক মা সামলাতে পারবেন না।

সর্বপ্রথমে জগদম্বাকে শোনাই।

মন্দিরে গেল রামকৃষ্ণ। বললে, অবস্থা যা করেছিস এবার ব্যবস্থা করে দে। পুত্রশোক দিয়েছিস এবার তা সহ্য করবার মতো শক্তি দে, সান্ত্বনা দে। এক হাতে নিবি আরেক হাতে দিবি নে, তা হতে পারবে না।

নবতে গিয়ে চন্দ্রমণিকে বললে রামকৃষ্ণ।

ভেবেছিল চন্দ্রমণি শোকে বিহ্বল হয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়বে। কিন্তু চন্দ্রমণি বিশেষ বিচলিত হলেন না। চোখের কোণের জলটুকু মুছে নিয়ে বললেন, 'সংসার অনিত্য। মৃত্যু নিশ্চিত। তাই শোক করা অনর্থক।' রামকৃষ্ণের দিকে তাকালেন উৎসুক হয়ে। বললেন, 'সে কি, তুই কাঁদছিস কেন ? এত সব বুঝিয়ে নিজেই শেষে অবুঝ হোস ?'

না, কোথায় চোখের জল ? সর্বত্র আনন্দভাতি।

জগন্মাতাকে উদ্দেশ করে বারে-বারে প্রণাম করতে লাগল রামকৃষ্ণ। যেমন দহনে আছিস তেমনি আছিস সহনে। যেমন আছিস ভাবনে তেমনি আছিস পাবনে।
মথুরবাবু গেছেন, এসেছেন শম্ভু মল্লিক। সিঁদুরেপটির শম্ভু মল্লিক। সদাগরী আপিসে মুচ্ছুদ্দির কাজ করে, অঢেল পয়সা। গোড়ায়-গোড়ায় খুব রাজসিক ভাব, ইস্কুল করব, হাসপাতাল করব, রাস্তা-পুষ্করণী করব। শেষকালে বিগলিত সমর্পণ : 'আশীর্বাদ করো যাতে এই ঐশ্বর্য তাঁর পাদপদ্মে দিয়ে মরতে পারি।'
দক্ষিণেশ্বরের কাছেই বাগানবাড়ি, কি ভাবে এক দিন এসে পড়ল পথ ভুলে। ব্রাহ্মধর্মে মতি, ভাবখানা আধা-সাহেবি, কিন্তু রামকৃষ্ণের কাছটিতে এসে আর যেতে চায় না। যে কালে হাসপাতালে এসে নাম লিখিয়েছ, রোগের যতক্ষণ কসুর থাকবে ছাড়বে না ডাক্তার সাহেব। আর ছাড়ান-ছোড়ান নেই। তুমি নাম লেখালে কেন?
রামকৃষ্ণের দ্বিতীয় রসদদার। বলে, 'আর কিছু বুঝি না, তুমি আমার গুরু। আমার গুরুজী।'
'কে কার গুরু!' রামকৃষ্ণ হাসে। করজোড় করে বলে, 'তুমি আমার গুরু।'
শম্ভুর স্ত্রী আবার আরেক কাঠি উপরে। প্রতি মঙ্গলবার সারদাকে তার বাড়ি নিয়ে আসে। ষোড়শোপচারে পুজো করে তার পা দুখানি। মঙ্গলাচরণে মঙ্গল চরণ।
জ্বলন্ত বিশ্বাস। অন্ধকার জঙ্গলের মধ্য দিয়ে পথ চলে শম্ভু। বলে, তাঁর নাম করে বেরিয়েছি, আমার আবার বিপদ কিসের! ক্রমে-ক্রমে পার্থিব বিষয়ে ঔদাসীন্য। রামকৃষ্ণকে বলে, তুমি ন্যাংটা, তোমারই অখণ্ড আরাম। আমরা এ গ্রন্থি খুলি তো ও গ্রন্থিতে পাক দিই।
'তোমরা যে অনেক গ্রন্থ পড়েছ। গ্রন্থই তো গ্রন্থি। আমি গ্রন্থের গ-ও জানি না। আমি খাই-দাই আর বগল বাজাই। ন্যাংটার নেই বাটপাড়ে ভয়।'
তোমার মত সরলই যে হতে পারি না। সরল ভাবে ডাকলে কি তিনি না শুনে পারেন? শম্ভুর এখন সেই সরল অশ্রু। বলে, সরল হওয়ার সাধনই তো সব চেয়ে কঠিন সাধন। সামান্য গা খালি করতে পারি না তো মন খালি করব। জমিকে নিষ্কণ্টক করি কি করে? জমি পাট করতে পারলেই তো বীজ পড়বে, আঁকুর বেরুবে। এ সব জমি যে কাঁকুরে জমি।
রামকৃষ্ণের মুখে শুধু একটি হাসির সারল্য।
তুমি আমার যেমন দেখতে সরল তেমনি তোমাকে বুঝতে সরল।
রামকৃষ্ণের তখন খুব পেটের অসুখ, শম্ভুবাবু পরামর্শ দিলেন, একটু আফিং খাও। রামকৃষ্ণ গিয়েছে তার বাগানবাড়িতে, বাগানবাড়ির সামনেই শম্ভুবাবুর ডিসপেনসারি। বললেন, রাসমণির বাগানে ফেরবার সময় আমার থেকে নিয়ে যেও আফিংটুকু।
কথায়-কথায় ভুলে গিয়েছে আফিঙের কথা। পথে এসে রামকৃষ্ণের মনে পড়ল, ঐ যাঃ, আফিংটুকুই নিয়ে আসা হয়নি। অমনি ফিরে গেল শম্ভুর বাগানবাড়িতে।

শম্ভু তখন অন্দরে চলে গিয়েছে, যাক, ডাকাডাকি করে আর কাজ নেই। ডিসপেনসারির কম্পাউন্ডারের থেকে চেয়ে নিলেই হবে। কম্পাউন্ডার তক্ষুনি কাগজে মুড়ে দিয়ে দিল এক দলা। ফেরবার পথে রামকৃষ্ণ দেখল তার আর পা চলছে না, কে যেন তার পা টেনে ধরে রয়েছে। রাস্তায় না উঠে পা এগিয়ে যাচ্ছে ড্রেনের দিকে। এ কি, এ কোন পথে চলেছি? পথ কই গৃহে ফেরবার? পথ সব মুছে গেল নাকি? অথচ পিছন ফিরে শম্ভুবাবুর বাড়ির দিকে তাকিয়ে পথ তো দেখতে পারছি দিব্যি। তবে এ কী পথভ্রম!

রামকৃষ্ণ ফের শম্ভুবাবুর বাড়ির ফটকের কাছে ফিরে এল। এইবার ঠিক হদিস হবে পথের। সামনে গিয়ে ডাইনে। পথঘাট তো মুখস্ত। তবে কেন বেচালে পা পড়বে? আফিঙের পুঁটলি ট্যাঁকে গুঁজে রামকৃষ্ণ আবার রওনা হল। আস্তে-আস্তে এক পা দু পা করে, মুখস্তের জের টেনে-টেনে। কিন্তু যথাপূর্বং তথাপরং। আবার দিকভ্রম আবার পথলুপ্তি। আবার কে পা ধরে টানতে লাগল পিছন দিকে। কি, কোথায় কী ভুল হল আমার!

হঠাৎ মনে পড়ে গেল রামকৃষ্ণের। শম্ভু বলেছিল, আমার থেকে নিয়ে যেও, তাকে না বলে আমি তার কম্পাউন্ডারের থেকে চেয়ে নিয়ে গেছি। তাই মা আমাকে যেতে দিচ্ছেন না! ঘুরিয়ে মারছেন। আমার যে সত্যচ্যুতি হয়েছে। এ ভাবে নেওয়া তো চুরি করার সামিল।

অমনি ফিরে গেল রামকৃষ্ণ। ডিসপেনসারিতে গিয়ে দেখে সেই কম্পাউন্ডারও নেই। দরজা বন্ধ নাকি? কে জানে। জানলা একটা খোলা আছে। সেই জানলা দিয়ে আফিঙের পুঁটলিটা ছুঁড়ে ফেলে দিল ভিতরে। বললে, 'ওগো, এই তোমাদের আফিং রইল।'

বলে ফের মন্দিরের দিকে পা বাড়াল রামকৃষ্ণ। সমস্ত পথ এখন সড়গড়। আর কেউ টানছে না পা ধরে, ঠেলছে না এদিক-ওদিক। চোখের দৃষ্টি ফর্সা হয়ে গিয়েছে।

আমার মা আছে আর আমি আছি। আমি তো মা'র হাত ধরিনি, মা-ই আমার হাত ধরেছেন। নিজে না ধরে তাঁকে দিয়েই ধরিয়েছি আমাকে। তাই পা এতটুকু পড়তে দেন না বেচালে।

আমি তোমাকে ছেড়ে থাকি, কিন্তু মা, তুমি আমাকে ছেড়ে থেকো না। 'মুঝে তুম মৎ ছোড়ো।'

ওরে শোন, বাঁদরের বাচ্চা হবি না, বেড়ালের বাচ্চা হবি। বাঁদরের বাচ্চা তার মাকে ধরে, মা যখন এক গাছ থেকে আর এক গাছে লাফায়, কখনো ছিটকে পড়ে যায় বাচ্চা। আর বেড়ালের বাচ্চাকে তার মা ঘাড়ে কামড়ে ধরে, বেড়ালের বাচ্চার আর ভয় নেই। মা-ই তাকে আঁকড়ে ধরে নিয়ে যাবে যেখানে খুশি। কভু আখার ধারে, কভু বা ছাইয়ের গাদায়, কভু বা বাবুদের বিছানায়।

তুমি কোথায়, তোমাকে ধরতে পারছি না। এই হাত বাড়িয়ে দিলাম, তুমি আমাকে ধরো।

মাঠের মাঝে আলপথ, এক গাঁ থেকে আরেক গাঁ। বাপ তার দুই ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছে সেই আলপথ দিয়ে, গ্রামান্তরে। ছোট ছেলেটিকে বাপ কোলে করে নিয়ে যাচ্ছে। বড়টি সেয়ানা, সে নিজেই বাপের হাত ধরে চলেছে। সরু পথ, পড়ে যাবার ভয়, তাই দু ছেলেই বাপের আশ্রয় নিয়েছে। যাচ্ছে-যাচ্ছে, হঠাৎ একটা শঙ্খচিল উড়ে যেতে দেখল, একেবারে ঠিক মাথার উপর দিয়ে। দেখেই দু ছেলের মহা আহ্লাদ। দুজনেই আপনা ভুলে হাততালি দিয়ে উঠল। ছোট ছেলেটা জানে, বাপ আমাকে ধরে আছে, আমার ভয় কি, আমি আনন্দে হাততালি দিই। কিন্তু বড় ছেলেটি যেই বাপের হাত ছেড়ে হাততালি দিতে গেল, অমনি পড়ে গেল নিচে, ঘা খেয়ে কেঁদে উঠল।

মাকে অমনি কোলে নিতে বল। মা'র কোলে বসে হাত ছেড়ে দে।

সারদার বাবা রামচন্দ্র রামনবমী তিথিতে মারা গেলেন। সারদার মন ভেঙে পড়ল। ভাবল আবার দক্ষিণেশ্বরে ফিরে যাই।

বৈশাখ মাস, ১২৮১ সাল, সারদা আবার দক্ষিণেশ্বরে ফিরে এল।

কিন্তু থাকে কোথায়?

আর কোথায়! সেই সংকীর্ণ নবত ঘরে। চন্দ্রমণির সঙ্গে।

একরতি ঘর। একটুখানি দরজা। ঢুকতে-বেরুতে মাথা ঠুকে যায়। একজনে থাকবার মতও তাতে জায়গা হয় না—তা দুজনে, শাশুড়ি-বৌয়ে। ঐটুকু ঘরের মধ্যেই হাঁড়ি-কুঁড়ি, পোঁটলা-পুঁটলি। যত হাবজা-গোবজা। শিকেয় ঝুলছে যত কড়া-ডেকচি। রামকৃষ্ণের জন্যে জিয়ানো মাছ পর্যন্ত। এখানে থাকতে বৌ'র যে বেজায় কষ্ট হবে।

কথাটা শম্ভু মল্লিকের কানে উঠল। মথুর হলে হয়তো অট্টালিকায় রাখতেন, শম্ভু মল্লিক মন্দিরের কাছে সারদার জন্যে একখানা চালাঘর তুলে দিলেন। তার জন্যে জমি নিতে হল মৌরসী স্বত্বে। আড়াই শো টাকা সেলামী দিলেন শম্ভু।

জমি তো হল কিন্তু কাঠ কই?

কাঠ যোগাল কাপ্তেন। বিশ্বনাথ উপাধ্যায়। বিশ্বনাথ নেপালরাজের কর্মচারী। কলকাতায় ও মফস্বলে নেপালের শাল কাঠের সে যোগানদার। বেলুড়ে তার কাঠের গদি। বললে, 'যত লাগে পাঠিয়ে দেব শালের চকোর।'

লড়াইয়ে বামুনের ঘরের ছেলে। বাপ ভারতীয় ফৌজের সুবাদার। এরা লড়াইও করে আবার পুজোও করে। যুদ্ধক্ষেত্রে শিব নিয়ে যায়। এক হাতে শিব অন্য হাতে তরবার।

বেদ-বেদান্ত গীতা-ভাগবত সব কণ্ঠস্থ। তারপর ভক্তি কত! যখন পুজো করে কর্পূরের আরতি করে। পুজো করতে-করতে স্তব করে আসনে বসে। সে আরেক মানুষ। পুজো করার সময় চোখের ভাব ঠিক যেন বোলতা কামড়েছে। কী ভক্তি! নিজের মা'র কাছে নিচে বসে। মা যে আসনে বসে তার চেয়ে নিচু আসন। কিংবা যে আসনে সে বসবে তার চেয়ে উঁচু আসনে মাকে বসাবে।

কী ভক্তি! রামকৃষ্ণ বরানগরের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে, ছুটে এসে মাথার উপরে ছাতা

ধরে। বাড়িতে নিয়ে গিয়ে নানা তরকারি রেঁধে খাওয়ায়। যেখানে খাওয়ায় সেখানেই আঁচাবার ব্যবস্থা করে, উঠতে দেয় না। বাতাস করে, পা টিপে দেয়। ওদের বাড়িতে গিয়ে পাইখানায় বেহুঁস হয়ে পড়েছে রামকৃষ্ণ—এত আচারী, তবু পাইখানায় গিয়ে ঠিকমত বসিয়ে দিয়ে এল। যদি কখনো সমাধি হয় রামকৃষ্ণের, কাপ্তেন মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। সে এককালে হঠযোগ করত। তাই গুণ আছে তার হাতে।

শালের চকোর পাঠিয়ে দিল বিশ্বনাথ। একখানা আবার গঙ্গার জোয়ারে ভেসে গেল একদিন। হৃদয় দুঃখ করে বললে সারদাকে, 'তোমার যেমন অদেষ্ট, একটা শালকাঠও ঠিকমত জোটে না।'

সারদা শুধু একটু হাসল উদাসীনের মত।

গেছে-গেছে ও শালকাঠ। বিশ্বনাথ আবার নতুন পাঠিয়ে দিলে। ঘর উঠল সারদার। চালাঘর।

শালকাঠ নিয়ে বিশ্বনাথেরও বিপদ কম নয়। গঙ্গার জোয়ারে অনেকগুলি কাঠ তার ভেসে গেছে। রাজসরকারের দারুণ ক্ষতি। এখন কী কৈফিয়ৎ দেয়া যাবে এর জন্যে, কে বলবে? কাঠের হিসেব পাঠালে না এবার বিশ্বনাথ। ঠিক করলে পরের বছরের লাভে এ লোকসানের পূরণ করবে। কিন্তু হঠাৎ কাটামুণ্ডু থেকে তার তলব এল। বিকৃত কি রিপোর্ট গেছে রাজধানীতে, বিশ্বনাথের চাকরি নিয়ে টানাটানি। সংসারী লোক, ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। নেপালে যাবার আগে এল সে দক্ষিণেশ্বরে। সেই সরল সত্যশরণের কাছে।

বললে, 'এখন উপায় বলুন।'

'উপায় খুব সোজা।' বললে রামকৃষ্ণ। 'এর চেয়ে সোজা আর হতে পারে না।'

'কি?'

'সত্য কথা বলবে। কাঠ তো আর তুমি নাওনি, গঙ্গায় নিয়েছে। তাই বলবে গিয়ে দরবারে। তোমার কিচ্ছু হবে না। মা তোমাকে, তোমার সত্যকে রক্ষা করবেন। সত্যের মত সহজ আর কিছু নেই।'

বুকের ভার নেমে গেল বিশ্বনাথের। সোজা সত্য কথা বলব এ সব চেয়ে বড় আশ্বাস। অতলস্পর্শ শান্তি।

হলও তাই। সত্য কথা বলায় তার দোষক্ষালন তো হলই, তার প্রমোশন হল। কাপ্তেন ছিল কর্ণেল হল। ফিরে এল কলকাতায় নেপালের রাষ্ট্রদূত হয়ে।

বাঙালীদের নিন্দা করে বিশ্বনাথ। নিন্দা করে ইংরিজি-পড়ুয়াদের। ঠাকুরের পায়ের কাছে বসে বলে, 'এমন মানিককে ওরা চিনল না।'

সংসারে থাকতে গেলে সত্য কথার খুব আঁট চাই। আর এই সত্যেই ভগবান। সত্য কথাই কলির তপস্যা। কায়মনোবাক্যে বারো বছর সত্য পালন করলে মানুষ সত্য-সংকল্প হয়ে যায়।

'আমি মাকে সব দিয়েছিলুম। জ্ঞান-অজ্ঞান, ধর্ম-অধর্ম, পাপ-পুণ্য, ভালো-মন্দ, শুচি-অশুচি, সব। কিন্তু সত্য মাকে দিতে পারলুম না। বলতে পারলুম না,

এই নে তোর সত্য, এই নে তোর অসত্য। ঐ সত্য যদি ত্যাগ করি তবে মাকে যে সর্বস্ব অর্পণ করলুম সেই সত্য রাখি কিসে? সত্য ভগবানকেও দেয়া যায় না। সত্যই তো ভগবান। তা আবার দেব কাকে?'

সেই শালকাঠের ঘরে বাস করতে লাগল সারদা। একটি মেয়ে রইল তার তত্ত্ব করতে। সেই ঘরেই রাঁধে সারদা—রামকৃষ্ণের সেই ছিনাথ হাতুড়ে। থালা-বাটি সাজিয়ে নিয়ে যায় মন্দিরে। কাছে বসিয়ে রামকৃষ্ণকে খাইয়ে আসে। মাথা থেকে ঘোমটাটি সরে না হাওয়ায়।

দিনে-দুপুরে রামকৃষ্ণ মাঝে-মাঝে যায় সেই চালাঘরে। খোঁজ-খবর নিয়ে আসে। ঘোমটার ভিতর থেকে কথা কয় সারদা।

একদিন হল কি, বিকেলের দিকে গিয়েছে রামকৃষ্ণ। আর যেমনি যাওয়া অমনি মুষলধারে বর্ষণ। সে বর্ষণ আর থামে না। মন্দিরে এখন ফিরে যাই কি করে? না, যাব না মন্দিরে। তোমার চালাঘরটিতেই থাকব আজ। কি খাওয়াবে আজ বলো?

ঝোল-ভাত তোমার পথ্য, ঝোল-ভাতই খাবে। সারদা রেঁধে দিল ঝোল-ভাত। খেতে-খেতে রামকৃষ্ণ বললে, 'এ কেমনতরো হল? কালীঘরের বামুনরা যেমন রাত্রে বাড়ি আসে এ যেন আমি তেমনি এসেছি।'

চালাঘরেই রাত কাটাল রামকৃষ্ণ। চালাঘর নয়, কালীঘর।
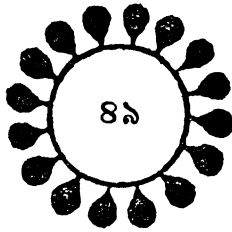
চালাঘরে থেকে সারদার কঠিন আমাশা হল।

শম্ভুবাবু প্রসাদ ডাক্তারকে নিয়ে এলেন। খাওয়ালেন অনেক ওষুধপত্র। কিন্তু রোগের কিছুতেই আরাম হয় না। সবাই বলে, দেশে ফিরে যাক। সেখানকার খোলা হাওয়া আর মিঠে জল ছাড়া সারবে না অসুখ।

জয়রামবাটিতে ফিরে গেল সারদা। আশ্বিন মাস, ১২৮২ সাল। শ্যামাসুন্দরী তাকে টেনে নিলেন বুকের মধ্যে।

অসুখ বেড়েই চলল। কোথায় মুক্ত হাওয়া, কোথায় মিষ্টি জল! সারদা মিশে গেল বিছানার সঙ্গে। শ্যামাসুন্দরী চোখে আঁধার দেখলেন। দেশের হাতুড়ে-রোজাদের ডাকেন এমনও বুঝি তাঁর সংস্থান নেই। আছেন শুধু দয়াময়।

সারদার দেহ বুঝি আর থাকে না। খবর পেঁছুল রামকৃষ্ণের কাছে।

'তাই তো রে হৃদু, সারদা কেবল আসবে আর যাবে।' শান্ত স্বরে বললেন রামকৃষ্ণ, 'মনুষ্যজন্মের কিছুই তার করা হবে না।'

বিছানার থেকে আস্তে-আস্তে উঠে বসল সারদা। কাছেই গ্রাম্যদেবী সিংহবাহিনীর মন্দির। ঠিক করল সিংহবাহিনীর মাড়ে গিয়ে হত্যা দেবে। হয় রোগ নাও, নয় আমাকে নাও।

গ্রাম্যদেবীর কোনো নাম-ডাক নেই। কিন্তু আমার ডাকেই তার নাম হবে।

মা-ভাইয়েরা যেন জানতে না পারে। চুপি-চুপি যেতে হবে মন্দিরে। কিন্তু যেতে পারব তো একা-একা? নিজের পায়ে ভর করে?

কে যেন তাকে হাত ধরে নিয়ে গেল ধীরে-ধীরে। মা-ভাইয়েরা জানতেও পেল না। সিংহবাহিনীর মাড়ে হত্যে দিয়ে পড়ল সারদা।

খানিকক্ষণ পড়ে থাকবার পরেই সিংহবাহিনী নেমে এল সিংহাসন থেকে। বললে, 'তুমি কেন পড়ে আছ গো?' বলে হাত ধরে তাকে তুলে দিল। 'ওলতলার মাটি একটু খাও গে, আধি-ব্যাধি সেরে যাবে।'

মাটি খেয়ে অসুখ সেরে গেল সারদার। জীর্ণ দেহ সবল হয়ে উঠল।

গ্রামে-গ্রামান্তরে ছড়িয়ে পড়ল সিংহবাহিনীর মাহাত্ম্য। দূর-দূরান্তর থেকে আসতে লাগল আর্ত-আতুর। কেউ আমরা আগে জানিনি, আগে বুঝিনি, খোঁজ করিনি আমাদের গ্রাম্যদেবীকে। সাপের বিষ পর্যন্ত নাশ হয় ঐ মাটির ছোঁয়ায়। চল-চল যাই সিংহবাহিনীর দুয়ারে।

লোকমাতা লোকের কল্যাণের জন্যে ঘুমন্ত দেবীকে জাগিয়ে দিলেন। যেমন জগতের প্রভু ভুবনের কল্যাণের জন্যে জাগিয়ে দিয়েছিলেন ভবতারিণীকে।

এ দিকে শম্ভু মল্লিকের অবস্থা সঙিন হয়ে উঠেছে। ঘোর বিকার। সর্বাধিকারী এসে দেখে বললে, 'ওষুধের গরম।'

দেখতে গেল রামকৃষ্ণ। শম্ভুর বিকারাচ্ছন্ন মুখে ভেসে উঠল তৃপ্তির প্রশান্তি।

'শম্ভুর প্রদীপে আর তেল নেই।'

অসুখের গোড়ার দিকে শম্ভু বলেছিল একদিন হৃদয়কে : 'হৃদু, পোঁটলা বেঁধে বসে আছি। কান্ডারী এলে তার হাতে তুলে দেব পোঁটলা। বলব ফেলে দাও ভবনদীতে। ভার হালকা করো।'

ঐশ্বর্য ছিল, আসক্তি ছিল না। সংসারে টাকার দরকার বটে, কিন্তু ওগুলোর জন্যে ভাববে কে বসে-বসে? যখন আসে আসবে যখন যাবার যাবে। যদৃচ্ছা লাভ। ঈশ্বরের যারা ভক্ত, ঈশ্বরের যারা শরণাগত, তারা কিছু ভাবে না, তাদের যদৃচ্ছা লাভ। যত্র আয় তত্র ব্যয়। এক দিক থেকে আসে আরেক দিক দিয়ে বেরিয়ে যায়। বৈরাগ্য মানে তো শুধু সংসারে বিরাগ নয়, বৈরাগ্য মানে ঈশ্বরে অনুরাগ। যার ঈশ্বরে অনুরাগ আছে তার অন্য অঙ্গরাগে দরকার নেই।

জানিস যারা ভক্ত, তারা হচ্ছে ঈশ্বরের আত্মীয়, ঈশ্বরের সঙ্গে তাদের রক্ত-মাংসের সম্বন্ধ। ঈশ্বরই তাদের টেনে নেন। দুর্যোধনেরা যখন গন্ধর্বের কাছে বন্দী হল

যুধিষ্ঠিরই তাদের উদ্ধার করলেন। বললেন, আত্মীয়দের ঐ অবস্থা হলে আমাদেরই কলঙ্ক।
ভক্তের আবার ভয় কি! অভাবের ভয়, না, আঘাতের ভয়? না, মরণের ভয়? ওরে ভক্তের নাশ নেই। 'ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি'।
শম্ভু চলে গেল। এখন কে হবে রসদদার?
ঝি কালীর মা সেবা করে চন্দ্রমণিকে। নব্বুয়ের উপর বয়স হয়েছে চন্দ্রমণির। বুদ্ধির জড়তা এসে গিয়েছে। হৃদয়কে দেখতে পারেন না দু চক্ষে। কি করে তাঁর ধারণা হয়েছে অক্ষয়কে ওই মেরে ফেলেছে। এখন বলছেন রামকৃষ্ণ আর সারদাকে সে মেরে ফেলবে। মাঝে-মাঝে রামকৃষ্ণকে বলেন গলা নামিয়ে, 'হৃদয়ের কথা কখখনো শুনবি না। ও শত্তুর।'
রাসমণির বাগানের কাছেই আলমবাজারের পাটের কল। দুপুরে কলে সিটি বাজে। সেই সিটিকে চন্দ্রমণি বৈকুণ্ঠের শঙ্খধ্বনি বলেন। ঐ সিটি না শোনা পর্যন্ত খেতে বসেন না। কেউ অনুরোধ করলে বলেন, 'এখন কী খাব গো? লক্ষ্মীনারাণের ভোগ হয়নি, বৈকুণ্ঠে শঙ্খ বাজেনি, এখন কি খাওয়া যায়?' যেদিন কলের ছুটি থাকে সেদিন আর বাঁশি বাজে না। সেদিন চন্দ্রমণিকে খাওয়ানো শক্ত হয়ে ওঠে। বৈকুণ্ঠের শঙ্খ নেই আমারও খাওয়া নেই। রামকৃষ্ণ তখন নানারকম কৌশল করে। ছোট মেয়েকে যেমন করে ভোলায় তেমনি করে পাশে বসিয়ে খাওয়ায় মাকে।
রোজ ভোরে উঠে মাকে দর্শন করা চাই রামকৃষ্ণের। কিছুক্ষণের জন্যে তাঁর কাছে থেকে তাঁকে সেবা করা চাই স্বহস্তে। আর কত দিন মা'র পাদপদ্ম স্পর্শ করা যাবে মা-ই জানেন।
হৃদয় দেশে যাবার জন্যে তোড়জোড় করছে। বাঁধছে বোঁচকা-বুঁচকি। হাটের থেকে নানা দ্রব্য কিনে এনেছে। না গেলেই নয়। শুনতে পেয়েছে দেশে কি-এক বেধেছে মোকদ্দমা।
রামকৃষ্ণের কাছে গেল অনুমতি চাইতে।
'মামা, যাব?'
'না।' রামকৃষ্ণ বারণ করল।
'কেন বারণ করছ?'
রামকৃষ্ণ কারণ বললে না। হৃদয় যত জিদ করে, রামকৃষ্ণ তত স্তব্ধ হয়।
শেষকালে হৃদয় গেল খাজাঞ্চির কাছে। মামা না বললে কি হয় খাজাঞ্চি যদি ছুটি দেয়, তবেই হল। খাজাঞ্চি ছুটি মঞ্জুর করল। আর হৃদয়কে পায় কে?
সন্ধের সময় রামকৃষ্ণ নবতে এল। এল মা'র কাছটিতে।
শুরু করল যত সব পুরোনো কথা, গাঁ-ঘরের কথা, পাড়া-পড়শীর কথা। পুরোনো কথার মত এমন আর কী ভালো লাগে মায়েদের। ছেলেদের ছেলেবেলার কথায় এলে মায়েদের আর থামায় কে! রাত বাড়ছে, তবু কথায় মত্ত মায়ে-পোয়ে।
মন্দির থেকে হৃদয় ডাকাডাকি শুরু করল। কি গো মামা, খাবে না? খেতে

এস। মাকে ছেড়ে তবু উঠে যেতে মন ওঠে না রামকৃষ্ণের। মা'র কাছটিই যেন কাশীধাম। হৃদয়ের চীৎকার তীব্রতর হল।
'আমারটা রেখে তোরা দুজনে খা গে।' বললে রামকৃষ্ণ।
তোরা দুজনে মানে হৃদয় আর রামলাল। রামেশ্বরের মৃত্যুর পর রামলাল এসে পুজারী হয়েছে দক্ষিণেশ্বরে।
আমি আরো একটু বসি মা'র কোল ঘেঁষে। আরো একটু কথা শুনি।
রাত প্রায় দুপুর, মাকে ঘুম পাড়িয়ে রামকৃষ্ণ ফিরে এল নিজের ঘরে। খেয়ে-দেয়ে শুলো নিজের বিছানায়।
কিন্তু হৃদয়ের চোখে ঘুম নেই। কেবল এ পাশ ও পাশ করছে। রাত যত বাড়ছে তত বাড়ছে হৃদয়ের ছটফটানি। কে যেন আষ্টেপৃষ্ঠে তাকে বেঁধে ধরেছে বিছানায়, ছাড়া পাবার জন্যে হাত-পা ছুঁড়ছে ক্ষণে-ক্ষণে।
রামকৃষ্ণের পাশের বিছানা হৃদয়ের। রামকৃষ্ণ দেখেও দেখছে না।
এক ঝটকায় উঠে পড়ল হৃদয়। ঘরের কোণে গাঁঠরি বাঁধা, কাল ভোরেই সে রওনা হবে ঠিকঠাক। সহসা সে ক্ষিপ্র হাতে গাঁঠরির বাঁধনগুলি খুলে ফেলতে লাগল। আর বাঁধনও কি একটা দুটো! যেমন যত রাজ্যের জিনিস পেয়েছে পুরেছে তেমনি এঁটেছে দড়িদড়ার ঘোরপ্যাঁচ। টেনে খিঁচে ছিঁড়ে খুলতে লাগল দড়ির জট।
রামকৃষ্ণ জিগগেস করল, 'কি হল?'
'কী হল! বিছানায় শুতে পাচ্ছি না। যতক্ষণ এ বাঁধনগুলো না যাচ্ছে ততক্ষণ আমার শান্তি নেই। গাঁঠরির মতই দড়ি দিয়ে কে আমাকে বেঁধেছে নাগপাশে—'
'বাড়ি যাবি না?'
'আর গেছি! মনে একটা ইচ্ছে হলেই যদি কেউ বাগড়া দেয়, তাহলে বাঁচি কি করে?' বন্ধন মুক্ত হয়ে হৃদয় ফের ফিরে এল বিছানায়। বললে, 'কিন্তু কেন যে বাড়ি যেতে দিলে না বুঝতে পারলুম না।'
'পারবি। ভোর হোক।'
নিজে আগে ভোরে উঠে কালীর মাকে জাগিয়ে দেন চন্দ্রমণি। সেদিন কালীর মা-ই আগে উঠল। বেলা এক-গা হতে চলল তবু চন্দ্রমণির সাড়া নেই। ডাকাডাকি করতে লাগল কালীর মা। তবু দরজা খোলেন না।
দরজায় কান পেতে ঠায় দাঁড়িয়ে রইল কালীর মা। শুনতে পেল গলার একটা ঘড়ঘড় শব্দ। ছুটে গেল হৃদয়কে খবর দিতে।
বার থেকে কী কৌশলে হৃদয় খুলে ফেলল হুড়কো। দেখল চন্দ্রমণির শেষ অবস্থা। ওষুধ আর গঙ্গাজল দিতে লাগল ফোঁটা-ফোঁটা করে।
তিন দিন কাটল এমনি অবস্থায়। হৃদয় অসুরের মত যুঝতে লাগল যমের সঙ্গে।
রামকৃষ্ণ বললে, এবার অন্তর্জলি করা হোক। চন্দ্রমণিকে নিয়ে চলল গঙ্গায়। যাবার আগে ফুল চন্দন আর তুলসী দিয়ে মা'র পায়ে অঞ্জলি দিলে রামকৃষ্ণ। পুত্রকে শিয়রে রেখে মা চোখ বুজলেন।
রামলাল ফুল নিয়ে এল, হৃদয় নিয়ে এল শ্বেত চন্দন। মা'র পা দুখানি গঙ্গা-

জলে ধুয়ে তাতে রামকৃষ্ণ ঘন করে চন্দন মাখিয়ে দিল। এ জল চোখের জল আর এ চন্দন ভক্তির চন্দন, ভালোবাসার চন্দন।

'যে দেহ থেকে আমার দেহের প্রকাশ সেই দেহ আজ মিশে গেল পঞ্চভূতে।'

এঁড়েদার শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হল চন্দ্রমণিকে। রামলাল মুখাগ্নি করলে, সৎকার করলে। রামকৃষ্ণ যে সন্ন্যাসী।

রামলালই শ্রাদ্ধ করল বৃষোৎসর্গ।

রামকৃষ্ণ অশৌচ পর্যন্ত পালন করেনি। প্রেতপিণ্ড দেওয়া তো দূরের কথা। পুত্রোচিত কোনো কার্যই করলাম না মা'র জন্যে। মনের ভিতরটা খচখচ করছে রামকৃষ্ণের। অন্তত একটু তর্পণ করি মাকে।

গঙ্গায় নামল রামকৃষ্ণ। পিছনে অগণন লোক। রামকৃষ্ণের মাতৃতর্পণ দেখবে। জলের অঞ্জলি নেবার জন্যে গঙ্গায় হাত ডোবাল রামকৃষ্ণ। কিন্তু যেই অঞ্জলিবদ্ধ হাত উপরে তুললে অমনি হাতের আঙুলগুলি অসাড়, শিথিল হয়ে গেল। এঁকে বেঁকে ফাঁক হয়ে গেল। সব জল পড়ে গেল ফাঁক দিয়ে। যতক্ষণ জলের মধ্যে থাকে হাত ঠিক বদ্ধাঞ্জলি থাকে, যেই জল নিয়ে উপরে ওঠে আঙুলগুলি অমনি কাঠির মতন শক্ত হয়ে প্রসারিত হয়ে পড়ে। এক বিন্দু জল বন্দী হয় না। বারবার চেষ্টা করেও পারছে না কিছুতেই।

ডুকরে কেঁদে উঠল রামকৃষ্ণ। 'মা গো, তোমার জন্যে কি কিছুই করতে পারব না?'

কোনো দোষ স্পর্শেনি তোমাকে। তুমি গলিত-হস্ত। বললে এসে পণ্ডিতেরা। তুমি অধ্যাত্মসাধনার চূড়ায় এসে উঠেছ।

তুমিই 'শ্রদ্ধয়াগ্নি সমিধ্যতে।' তুমিই 'শ্রদ্ধয়া হূয়তে হবিঃ।'
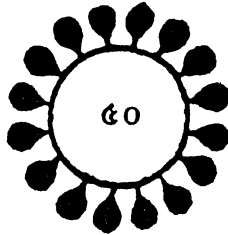
মথুরবাবু তখন বেঁচে, রামকৃষ্ণ তাঁকে এক দিন ধরে বসল : 'দেবেন ঠাকুরের বাড়ি যাব।'

মথুরবাবু অভিমানী লোক, আগু-পিছু করতে লাগলেন। আমরা কেন সেধে তার বাড়ি যাই? সে নিজে আসতে পারে না?

'ওগো, দেবেন্দ্র যে ঈশ্বরের নাম করে।'

নাম তো তুমিও করো। সে আসতে পারে না তোমার এখানে?

আমি নাম করলে কি হয়, আমার নিজের কি কোনো নাম আছে? তাঁর নাম দিয়ে নিজের নামটাকে মুছে ফেলেছি। তাঁর নামেই নিজের নামের নাশ হয়েছে। দেবেন্দ্রের কত বিদ্যে, কত ঐশ্বর্য। সে তো কলির জনক। সে এ দিক-ও দিক দু দিক রেখে দুধের বাটি খায়। সে ভোগেও আছে যোগেও আছে। রাজত্বও করছে দাসত্বও করছে। সে একটা মহাতীর্থ। তাকে এখানে আসতে না দিয়ে আমার ওখানে যাওয়াই তো আমার লাভ। আমি অমন একটা তীর্থ করব না? যেখানে ঈশ্বরের নাম সেখানেই আমি আছি। তাঁকে যে ডাকে সে যে আমাকেও ডাকে!

দেবেন্দ্র আর মথুর একসঙ্গে পড়তেন হিন্দু কলেজে। সেই সুবাদে যাওয়া সহজ হয়ে গেল। সঙ্গে নিয়ে গেলেন রামকৃষ্ণকে।

দেবেন্দ্রনাথের তখন দেশজোড়া নাম। খৃষ্টানি থেকে দেশকে উদ্ধার করার জন্যে তিনি ব্রাহ্মধর্ম আর ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত করলেন। রাজা রামমোহন এসে বোঝালেন বেদান্ত-প্রতিপাদিত ধর্মই সত্যধর্ম আর তাই প্রচার করবার জন্যে স্থাপন করলেন ব্রহ্মসভা। দেবেন্দ্রনাথের সাধনায় সেই ধর্মই হয়ে দাঁড়াল ব্রাহ্মধর্ম, আর সেই সভাই হয়ে দাঁড়াল ব্রাহ্মসমাজ।

বিদেশের গুরুর কাছে গোটা দেশ যখন ধর্মে দীক্ষা নিতে যাচ্ছিল তখন রাজা রামমোহন দেখালেন তাকে তার আপন সত্যসম্পদ। সেই দেখানোর কাজে দেবেন্দ্রনাথ একটি দিব্য শিখা। ব্রহ্মকে তিনি শুধু অনুষ্ঠানে রাখেননি নিয়ে এসেছেন জীবনের অধিষ্ঠানে। তিনি প্রত্যাগাত্মা। তিনি ঈশ্বরদর্শী।

দিব্যি ভুঁড়ি হয়েছে মথুরবাবুর, তবু তাঁকে চিনতে পারলেন দেবেন্দ্রনাথ। বিনয় বচনে জিগগেস করলেন, 'সঙ্গে ইনি কে?'

কথার সুরে একটি প্রসন্ন বিস্ময়। চোখের সম্মুখে হঠাৎ যেন দেখতে পেয়েছেন সুন্দরের মহামহিম প্রকাশ। একটি বিভান্বিত বিভূতি।

'এই এক জন আত্মভোলা মানুষ। ঈশ্বর ঈশ্বর করে পাগল।' মথুরবাবু পরিচয় করিয়ে দিলেন।

যেন শুধু এইটুকুই পরিচয় নয়। পাগল নয়, পারঙ্গম; অনন্তগুণগম্ভীর। মানুষ নয়, লীলামানুষবিগ্রহ। তাকিয়ে রইলেন দেবেন্দ্রনাথ।

'সংসারে থেকে তুমি ঈশ্বরে মন রেখেছ, তাই তোমাকে দেখতে এসেছি।' বললে রামকৃষ্ণ। 'তুমি জনক রাজার মত দুখানা তরোয়াল ঘোরাও, একখানা জ্ঞানের একখানা কর্মের। তুমি পাকা খেলোয়াড়।'

স্মিতশান্ত নেত্রে হাসলেন দেবেন্দ্রনাথ।

'কিন্তু এ দেখায় চলবে না। দেখি তোমার গা দেখি।'

সহজ-সুন্দর মানুষটির এ অনুরোধ যেন গুহাহিত প্রত্যাগাত্মার আদেশ। এ আবরণমুক্ত হওয়া মানেই ভারমুক্ত হওয়া, মালিন্যমুক্ত হওয়া। আবরণ খুলে ফেলতে পারলেই রইল না আর অহঙ্কার, রইল না আর অসন্তোষ।

গায়ের জামা খুলে ফেললেন দেবেন্দ্রনাথ। রামকৃষ্ণ দেখল সেই 'প্রলম্ববাহুঃ

পৃথুতুঙ্গবক্ষঃ'কে। দেখল তাঁর গৌরবর্ণের উপর কে সিঁদুর ছড়িয়ে দিয়েছে। বুঝল ঈশ্বর স্পর্শ করেছে দেবেন্দ্রনাথকে। তাঁর মর্ত তনু ভাগবতী তনু হয়ে উঠেছে।

দেখে খুশি আর ধরে না রামকৃষ্ণের। তুমি তো তবে আমার দেশের লোক, আমার স্বজন-বান্ধব। রামকৃষ্ণ চেপে ধরল দেবেন্দ্রনাথকে। 'তবে আমাকে কিছু ঈশ্বরীয় কথা শোনাও।'

বেদ থেকে কিছু-কিছু শোনালেন দেবেন্দ্রনাথ। এই বিশ্বজগৎ প্রকাণ্ড একটা ঝাড়-লণ্ঠনের মতো। প্রত্যেকটি জীব ঝাড়-লণ্ঠনের বাতি এক-একটি। শুধু নিজেরা জ্বলছে না, সমস্ত কিছুকে উজ্জ্বল করে রেখেছে।

কী আশ্চর্য! আমি যে অমনি দেখেছিলুম এক দিন পঞ্চবটীতে। তোমার সঙ্গে আমার যে তা হলে মিল গো! কিন্তু বিষয়টার ব্যাখ্যা কি?

'ঝাড়-লণ্ঠন না হলে কে জানত কে দেখত এই জগৎসংসারকে?' দেবেন্দ্রনাথ ব্যাখ্যা করতে লাগলেন। 'ঈশ্বর মানুষ সৃষ্টি করেছেন শুধু নিজেদের দেখাতে নয়, ঈশ্বরকে দেখাতে। শুধু নিজেদের গৌরব প্রচার করতে নয়, ঈশ্বরের গৌরব প্রচার করতে। মানুষ ছাড়া ঈশ্বরকে বোঝেই বা কে, বোঝায়ই বা কাকে। ঝাড়ের আলো না থাকলে সব-কিছু অন্ধকার, স্বয়ং ঝাড় পর্যন্ত দেখা যায় না।'

বড় সুন্দর করে বললে তো। একই বহুধা হয়েছেন। গণনাহীন অনৈক্য দিয়ে দেখাচ্ছেন সেই একেকে। সেই সমগ্রকে। সেই অখণ্ডকে। তিনি যে অখণ্ডৈকরস। 'আমি'-র মধ্যে কিছু নেই। আমার মধ্যেই সমস্ত রয়েছে।

আলাপ করে উল্লাস হল দেবেন্দ্রনাথের। বললেন, 'আমাদের উৎসবে কিন্তু আসতে হবে।'

'সে ঈশ্বরের ইচ্ছা।' উদাসীন রামকৃষ্ণ।

'না, আপনি আসবেন।'

'কিন্তু দেখছ তো আমার অবস্থা। আমার কাপড়-চোপড়ের আঁট নেই। কখন কি ভাবে তিনি রাখবেন তিনিই জানেন।'

'না, আসতে হবে!' দেবেন্দ্রনাথ পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। 'শুধু একটা ধুতি আর উড়ুনি পরে আসবেন। আপনাকে এলোমেলো দেখে কেউ যদি কিছু বলে আমার কষ্ট হবে।'

'না বাপু, আমি তা পারব না। বাবু হতে পারব না আমি।'

দেবেন্দ্রনাথ শুধু অর্ধবস্ত্র উন্মোচন করেছিলেন, কিন্তু রামকৃষ্ণ মুক্তসমস্তসঙ্গ। রামকৃষ্ণ সর্ববিকারবর্জিত। নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব। তার কাপড় থাকলেই বা কি, না-থাকলেই বা কি। নগ্ন বলেই তো সে পূর্ণ। চরম বলেই তো সে পরম।

কিন্তু শালীনতায় বাধল দেবেন্দ্রনাথের। পর দিন মথুরবাবুকে চিঠি লিখে পাঠালেন। একেবারে খালিগায়ে এলে ভালো দেখাবে না। গায়ে অন্তত একখানা উড়ুনি—

ওরে, ওরা এখনো বস্তুকে দেখে, সত্যকে দেখে না। আমাকে দেখে না, আমার কাপড় দেখে। ওরে, এ যে হরির শরীর। হরির শরীরের জন্যে ক হাত কাপড় কিনবি, কোন বাজারে? হরিই জগৎ, জগৎই হরি—এর বাইরে আর শরীর কই? হরিরেব জগৎ, জগদেব হরিঃ, হরিতো জগতো ন হি ভিন্ন তনুঃ।
'দেবেন্দ্র এখনো ভোগে আছে। তাই সে ভাগেও আছে।'
আমার ভোগও নেই, তাই ভাগও নেই। আমার ইয়ত্তাও নেই, পরিচ্ছেদও নেই। আমি সর্বোপাধিশূন্য।
'কিন্তু গৃহস্থেরা কি একেবারে ডুবে যেতে পারে না?' জিগগেস করল কেশব সেন।
'তোমরা ডুবে যাবে কি গো? তোমরা একবার ডুব দেবে আবার উঠবে।' হাসল রামকৃষ্ণ।
তোমরা ঈশ্বরকোটি নও, তোমরা পানকৌটি।
'কিন্তু, কেন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর?'
মহর্ষি বলতে পারো, কিন্তু আসলে রাজর্ষি। রাজর্ষি জনক। সংসারে থেকেও থাকতেন অরণ্যে। অরণ্যের নির্জনতায়।
'দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর? দেবেন্দ্র? দেবেন্দ্র?' দেবেন্দ্রনাথের উদ্দেশে প্রণাম করল রামকৃষ্ণ। বললে, 'তবে কি জানো, পর্যাপ্তকাম হতে হয়। এক জনের বাড়িতে দুর্গাপূজোর সময় উদয়াস্ত পাঁঠাবলি হত। এখন আর বলির সে ধূমধাম নেই। এক জন জিগগেস করলে, মশাই আপনার বাড়িতে আর বলির সে ধূমধাম কই? বাবু বললে, আরে, এখন যে দাঁত পড়ে গিয়েছে।' থেমে আবার বললে রামকৃষ্ণ, 'দেবেন্দ্রনাথ খুব মানুষ। হাতে তেল মেখে নিয়ে কাঁঠাল ভাঙছে। হাতে তেল মেখে নিয়ে কাঁঠাল ভাঙলে হাতে আর আঠা লাগে না।'
ওরে একবার পরশমানিককে ছুঁয়ে সোনা হ। তার পর হাজার বছর ধরে মাটিতে পোঁতা থাক, যে-সোনা সে-সোনাই থেকে যাবি।
মথুরবাবুকে আবার ডাকল রামকৃষ্ণ। বললে, চলো এবার আরেক তীর্থে।
সে আবার কোথায়?
দীননাথ মুখুজ্জের বাড়ি। বাগবাজারের পোলের কাছে থাকে। লোকটি বড় ভালো।
ভালো লোক হলেই তার বাড়িতে যেতে হবে? মথুরবাবু ঝাড়া দিয়ে উঠলেন।
শুধু ভালো নয়, ভক্ত। সব সময়ে তাঁতে আছে, মন-প্রাণ সব তাঁতে গত হয়েছে। এমন লোককে আমি দেখতে যাব না? ভক্তকে দেখা তো তাঁকেই দেখা।
দুনিয়ার অলিতে-গলিতে কত এমন ভক্ত আছে। তাই বলে সবাইকার বাড়ি-বাড়ি ধাওয়া করতে হবে না কি?
আমাকে সে সব অলি-গলির ঠিকানা এনে দাও। আমি জনে-জনে গিয়ে প্রণাম করে আসব। ভক্ত হচ্ছে ভগবানের বৈঠকখানা। সেখানেই তিনি বিশেষরূপে প্রকাশিত। বিশেষরূপে তরঙ্গায়িত, তরলীকৃত। বৈঠকখানাতেই তো বাবু

আছেন খুশমেজাজে, দিলদরিয়া হয়ে। মজা ওড়াবার মজলিশ চালাচ্ছেন চব্বিশ ঘণ্টা। আমাকে সেই আখড়ার আড্ডাধারী করে দাও।

ভক্ত ছাড়া তীর্থ নেই মহীতলে। ষোলো টাকার পয়সা এক কাঁড়ি, কিন্তু ষোলোটি টাকা যখন একত্র করো তখন আর কাঁড়ি দেখায় না। ষোলো টাকার বদলে যদি একটি মোহর করো তখন আরো কত ছোট হয়ে গেল। আবার সেটির বদলে যদি এক কণা হীরে করো, তা হলে লোকে টেরই পায় না।

ভক্ত ছোট্টটি হয়ে আছে। শুধু ঈশ্বরের নামটি ধরে বসে আছে। তীর্থভ্রমণ, গলার মালা ভেকআচার কিছু নেয় না, শুধু ভক্তি নিয়ে পড়ে থাকে। ভার নেয় না সার নেয়। জীবনে শুধু একখানি দলিল লিখে চুকিয়ে দেয় লেখা-পড়া। সে দলিল উইল বা দানপত্র নয়, নয় কোনো বন্ধক-তমশুক, শুধু একখানি আমমোক্তারি! ভক্ত ঈশ্বরকে আমমোক্তারি দিয়ে নির্ঝঞ্ঝাট হয়ে বসে থাকে। সে আমমোক্তারি বিশ্বাসের খাতায় রেজেস্টারি করা। রদ-রহিত নেই কোনো কালে।

তাঁর নাম আর তিনি তো অভেদ। যা রাম তাই নাম। তেমনি যা ভগবান তাই ভক্ত।

মথুরবাবু গাড়ি নিয়ে এলেন। তীর্থদর্শনে বেরুল রামকৃষ্ণ।

সেদিন দীননাথের বাড়িতে দীননাথের এক ছেলের পৈতে হচ্ছে। বাড়িটি ছোট, কিন্তু হৈ-চৈ প্রচণ্ড। তার উপর কে এক জন বড়লোক এসেছে ল্যাণ্ডো করে, তাকে নিয়ে দীননাথের ঘরগুষ্টি ভীষণ ব্যস্ত। এমন সময় এদের দেখে ওদের অপ্রস্তুত অবস্থা। কোথায় বসায় এই অনাহূতকে? নিমন্ত্রণ না করলেও যে চলে আসে পথ চিনে, প্রার্থনার অপেক্ষা না করে? কোথায় বসাই? ঘরে যে অনেক জিনিস, অনেক আসবাব, সেখানে জায়গা কোথায়?

পাশের ঘরে ঢুকতে যাচ্ছিলেন মথুরবাবু, ওপাশ থেকে কে ঝাঁজিয়ে উঠল : 'ও-ঘরে হবে না, ও-ঘরে সব মেয়েরা আছেন।'

মহা অপ্রস্তুত। জায়গা হল না রামকৃষ্ণের। তাকে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন মথুরবাবু।

'কেমন? দেখলে?' চটে গিয়েছেন মথুরবাবু।

রামকৃষ্ণ হাসতে লাগল। বললে, 'কেন, দীননাথকেই দেখলাম। তিনি দীননাথ, তিনি কি আমাকে ফাঁকি দিতে পারেন!'

'আর বোলো না। বসতে জায়গা দিল ঘরে?'

'ঘরে জায়গা না দিক, হৃদয়ে দিয়েছে।'

'তোমার কথা আর শুনব না। তোমার সঙ্গে যাব না আর কোথাও।' তবু রাগ যায় না মথুরবাবুর। 'তোমাকে যারা স্থান না দেয়—'

'আমাকে স্থান না দিলে স্থান কোথায় আর সংসারে?' দীননাথের মতই হাসতে লাগল রামকৃষ্ণ।

তুমি, মথুরবাবু, তুমি আর নেই। তবে আমাকে এখন বেলঘরের বাগানে কেশব সেনের কাছে কে নিয়ে যাবে?

আমি আছি—এগিয়ে এল কাপ্তেন। সঙ্গে সর্বাগ্রগ হৃদয়।

কিন্তু গাড়ি?

গাড়ি আমি দেব। কাপ্তেন বললে।

কাপ্তেনের সঙ্গে তার গাড়িতে চড়ে চলল রামকৃষ্ণ। চলল মাইল দুই দূরে বেলঘরে জয়গোপাল সেনের বাগানবাড়িতে। সেখানেই কেশব এসেছে। ভক্তদল নিয়ে মেতেছে সাধন-ভজনে। চলো হরিকথা শুনে আসি। মা হাতছানি দিয়ে ডাকছেন সেখানে।

রামকৃষ্ণের পরনে শুধু লালপেড়ে একটি ধুতি। কোঁচার খুঁটটি বাঁ-কাঁধের উপর ফেলা। কালো বার্নিস-করা চটি পায়ে।

চলেছে জ্ঞানীগুণীদের মজলিশে। যেখানে হরিগুণগান, সেখানে গুণই বা কি, আর জ্ঞানই বা কি।
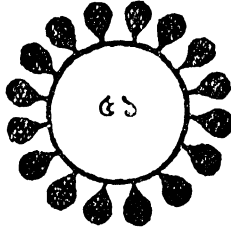
দেবেন্দ্রনাথের ডান হাত কেশব সেন।

চমৎকার চেহারা। সৌম্য, প্রশান্ত, ওজঃপূর্ণ। মুখশ্রীতে ঈশ্বরবিশ্বাসের লাবণ্য মাখানো। কণ্ঠস্বরে যেমন ভক্তির মধুরতা তেমনি প্রতিজ্ঞার তেজ। দার্ঢ্য আর দীপ্তির সমাহার। বাগ্‌বজ্রে বংশীধ্বনি।

চমৎকার বক্তৃতা দেয় কেশব। যেমন ইংরিজি তেমনি বাংলা। প্রথম-প্রথম ইংরিজি, শেষ দিকে কেবল বাংলা। সে বক্তৃতার কী বর্ণচ্ছটা। কী বিন্যাসচাতুর্য। যে শোনে সেই তন্ময় হয়। সত্য পথের ধ্রুব জ্যোতিটি চোখের সামনে জ্বলতে দেখে।

দেশ তখন ভেসে যাচ্ছে। ভেসে যাচ্ছে মদে, খৃষ্টানিতে, ইংরিজিয়ানায়। উচ্ছন্নে যাবার জন্যে পাগল হয়ে ছুটোছুটি করছে চার দিকে। ছুটতে বা পারছে কই, নর্দমায় টলে পড়ছে।

কাঁচা নর্দমার পাঁকের মধ্যে সার-সার শুয়ে আছে মাতালেরা। ধাঙড়দের ঝোড়া-গুলোকে মাথার বালিশ করেছে। যেন একেক জন কত বড় বাহাদুর। পাহারা-ওয়ালা এলে বলছে, 'এ বাবা, নর্দমায়, মিউনিসিপ্যালিটিতে আছি, পুলিশ জুরিসডিকশানের বাইরে। টিকিটিও ধরতে পাবে না।'

"সধবার একাদশী"র নিমচাঁদ বলে, সেকালে ভূতে পেত, একালে আমাদের মদে পেয়েছে। ব্রাণ্ডির নাম বোতলচারুহাসিনী। আমি তাকে ছাড়তে পারি কিন্তু সে আমাকে ছাড়ে কই? যদি 'রাইম' করতে চাও তো মদ খাও।
সে যুগে মদ না খাওয়া মানে শিক্ষিত বলে কল্‌কে না পাওয়া। যে-কলেজ থেকে বেরিয়েছে পাশ করে তার নাম ডোবানো। স্বনামধন্য রামগোপাল ঘোষের ভাগ্নে গ্রাজুয়েট হয়েছে কিন্তু মদ খায় না। ঘোষ মশায় দুঃখ করে তাকে বলছেন, 'তুই মদ খেতে শিখলি না, তোকে আমি সমাজে বার করি কি করে?'
প্যারীচরণ সরকার "সুরাপাননিবারণী সভা" স্থাপন করলেন। মদিরার স্রোত তবু বন্ধ হয় না। নিমে দত্ত বলছে, ও সভা যদি ত্বরায় না নিপাত হয় আমি নিপাত হব। বড়মানুষের ছেলে-ব্যাটারা এক-একটি করে সভ্য হবে আর আমি ধেনো খেয়ে মরব এ হতে দেব না। এক ব্যাটা বড়মানুষের ছেলে মদ ধরলে দ্বাদশটি মাতাল প্রতিপালন হয়—
গিরিশ ঘোষ মদ খায়। তা নইলে না কি তার নেশা হয় না।
ঠাকুর বলেন, 'খা না—কত খাবি? কত দিন খাবি? শেষে যখন তোকে সে-নেশা ভগবৎ-নেশায় পেয়ে বসবে তখন মদ কোথায় পড়ে থাকবে টেরও পাবি না।'
সে-নেশা মদের চেয়েও দুর্মদ। সে-নেশাই সর্বনাশের নেশা।
তা ছাড়া, আরেক লক্ষণ, শিক্ষিত সমাজ সদলবলে সাহেবিয়ানার মোসাহেবি শুরু করে দিয়েছে। গায়ে বিলিতি খেলাত, মুখে বিলিতি বুকনি। যা কিছু ইংরেজি, যেমন কিছু সাহেবি তাই ওঠ-বোস মক্স করো। ইংরেজের পায়ে দেশ বিকিয়ে দিয়েছ, ভাব-ভাষাও বিলিয়ে দাও।
নিমে দত্ত বলছে, আই রীড ইংলিশ, রাইট ইংলিশ, টক ইংলিশ, স্পীচফাই ইন ইংলিশ, থিঙ্ক্ ইন ইংলিশ, ড্রীম ইন ইংলিশ।
সেইখানে ঠাকুর এলেন খাঁটি দিশি বাংলার জয়ধ্বজা উড়িয়ে। বললেন, 'চার দিকে বড় গোলমাল। কিন্তু গোলমালেও মাল আছে। গোল ছেড়ে মালটি নেবে।'
ঠাকুর যেমন আপনি অকপট তেমনি ভাষাও অকপট।
বললেন, 'তিনটে "স" হয়েছে কেন বলতে পারিস? শ, ষ, স—এই তিন "স" কেন? এই তিন "স"-র মানে হচ্ছে, স, স, স। মানে সহ্য কর্, সহ্য কর্, সহ্য কর্। যে কোনো কাজে হাত দিস, বসিস যে কোনো সাধনায়, সহ্য করতে হবে। সহ্য না করলে সিদ্ধি নেই। এই সওয়ার বা সহ্য করার উপরে জোর দেবার জন্যেই তিনটে "স" হয়েছে।' বলেই একটি ছন্দ গাঁথলেন : 'যে সয় সে রয়, যে না সয় সে নাশ হয়।'
আগে লোকে বলত, উপমা কালিদাসস্য, এখন দেখছে, উপমা রামকৃষ্ণস্য!
তার পর পোশাকটি দেখ।
এক দিকে চাঁদনির সাহেব আরেক দিকে বাগবাজারের বাবু।
বাবুর বর্ণনা দিচ্ছে নিমচাঁদ। ভোলাচাঁদকে দেখে বলছে, 'তুমি যে বাবু সেজে বাহার দিয়ে এসেছ। মাথার মাঝখানে সিঁতে, গায় নিনুর হাফচাপকান, গলায়

বিলাতী ঢাকাই চাদর, বিদ্যাসাগরপেড়ে ধুতি পরা, গরমি কালে হোল্ মোজা পায়, তাতে আবার ফুল-কাটা গার্টার, জুতোয় ফিতের বদলে রুপোর বগলস, হাতে হাড়ের হ্যাণ্ডেল বেতের ছড়ি, আঙুলে দুটি আংটি—'

ভোলাচাঁদ ইংরেজিতে বলছে, 'ফাদার ইনলা গিভ সার—ইউ মাই ফাদার ইনলা সার—'

আর রামকৃষ্ণের পরনে লালপেড়ে ধুতি, গায়ে বড় জোর একটি মার্কিনের জামা, পায়ে কালোবার্নিশ-করা চটি, বড় জোর কখনো ক্বচিৎ হাফ-মোজা।

মাস্টারকে বললেন, 'গোটা দু-এক মার্কিনের জামা দিও। সকলের জামা তো পরি না! কাপ্তেনকে বলব মনে করেছিলাম, তা তুমিই দিও।'

মাস্টার বসে ছিল, উঠে দাঁড়াল। কৃতার্থের মত বললে, 'যে আজ্ঞে।'

কিন্তু ঠাকুর যখন ভদ্রলোক ছেড়ে ভাবলোকে আসেন তখন তিনি একেবারে দিগ্বল্কল! তখন তিনি মঙ্গলায়তন হরি। তখন তিনি সকলেশ্বর। তাঁর ললাটফলকে কস্তুরীতিলক, বক্ষস্থলে কৌস্তভ, নাসাগ্রে নবমৌক্তিক, করতলে বেণু, সর্বাঙ্গে হরিচন্দন। তিনি অহেতুক-দয়ানিধি।

তখনকার দিনের লোকেরা প্রণাম করে না। প্রণাম করাকে কুসংস্কার বলে। প্রণাম না করে বলে, গুড মর্নিং। বলবার সময় তর্জনীটা একবার একটু কপালে ঠেকায়। ঘাড়টা মোটা করে রাখে, কারু কাছে মাথা নোয়ায় না। মাথা নোয়ালেই যেন মানটি খোয়া যাবে।

ওরে, মাথা নত কর। যেখানে যেটুকু গুণ দেখছিস সেখানেই তো ঈশ্বরকে দেখছিস। ঈশ্বর যে গুণগুরু। গুণাতীত হয়েও তিনি যে গুণবর্ধক। সে গুণের কাছে মাথা নোয়া। ঈশ্বরকে স্বীকার করলেই তো নিজেকে মান দিলি। যার এই মান সম্বন্ধে হুঁস আছে সেই তো মানুষ। যে বোঝে সে অনৃতের সন্তান নয়, অমৃতের সন্তান, সেই তো যথার্থ মানী।

দক্ষিণেশ্বরের মন্দির মানে প্রণাম শেখার পাঠশালা।

বাগবাজারে বোসপাড়া গলির মোড়ে বসে আছে গিরিশ ঘোষ, ঠাকুর গাড়ি করে যাচ্ছেন সেখান দিয়ে। গিরিশকে দেখেই ঠাকুর প্রথমে প্রণাম করলেন। প্রণাম ফিরিয়ে দিল গিরিশ। ঠাকুর আবার প্রণাম করলেন তক্ষুনি। যতবার গিরিশ প্রণাম ফেরায় ততবার ঠাকুর আগ বাড়িয়ে নতুন আরেকটা প্রণাম করে বসেন। কাঁহাতক চালানো যায় এই প্রণামের প্রতিযোগিতা? ক্ষান্ত হল গিরিশ ঘোষ। কিন্তু প্রণামে ঠাকুরের নিবৃত্তি নেই। গিরিশের থামবার পরেও আরেক বার প্রণাম করলেন ঠাকুর।

গিরিশ ঘোষ বললে, 'দক্ষিণেশ্বরের পাগলা বামুনটার সঙ্গে প্রণামে আর টক্কর দেওয়া চলে না। ওর ঘাড় ব্যথা হয় না কিছুতে।'

ঠাকুর জগন্মাতাকে প্রণাম করছেন আর বলছেন, 'ভাগবতভক্ত, ভগবান, জ্ঞানীর চরণে প্রণাম, ভক্তের চরণে প্রণাম, সাকারবাদীর চরণে প্রণাম, নিরাকারবাদীর চরণে প্রণাম। সর্বতীর্থময় হরি। সর্বভূতে, সর্বজীবে প্রণাম।'

গিরিশ ঘোষ বলে, 'রাম অবতারে ধনুর্বাণ নিয়ে জগৎজয় হয়েছিল, কৃষ্ণ অবতারে জগৎজয় হয়েছিল বংশীধ্বনিতে, আর রামকৃষ্ণ অবতারে জগৎজয় হবে প্রণাম-মন্ত্রে।'

নাম করো আর প্রণাম করো। প্রকৃষ্টরূপে নামই তো প্রণাম।

আরেক হাওয়া চলছিল সে যুগে—খৃষ্টানির হাওয়া। যেহেতু ইংরেজের ধর্ম, সেহেতু আর কথা নেই, মেতে যাও। হিন্দুধর্ম মানে পুতুল পুজো, স্রেফ ছেলেখেলা। শিক্ষার আলোতে এসে ও সব কুসংস্কার মানতে কেউ রাজী নয়। গীতা-উপনিষদের কেউ নাম শোনেনি। চণ্ডী? সে আবার কি মাথামুণ্ডু? চৈতন্যদেবের বাড়ি কোথায় তা কে জানে? ভাগবত? ও তো 'কথকের কথা'। সে যুগে কথকের কথা মানে আষাঢ়ে গল্প। যদি কেউ কিছু আজগুবি কথা বলে, ভদ্রলোকেরা অমনি বলে বসে—এ কথকের কথা। ভদ্রলোকেরা শোনে না কথকতা। তার চেয়ে গাঁজায় দম দেওয়া ভালো।

তবে তোমরা পড় কি?

পাদরিরা বাড়ি-বাড়ি বাইবেল দিয়ে গেছে, তাই পড়ি এক-আধটু। ইংরেজিতে লেখা, বেশ বোঝা যায় সহজে।

দেশের কতগুলো মাথাল লোক খৃষ্টান হয়ে গেল। দেখাদেখি আরো অনেকে। যেন একটা হুজুগ পড়ে গেল। গা ভাসিয়ে দিল গড্ডলিকায়।

বাঙালী পাদরির দল বেরুল গলির মোড়ে, হেদোর ধারে, কেষ্ট বন্দ্যোর গির্জের কোণে। কালাপাহাড় মুসলমান হয়েছিল, এরা হল শাদাপাহাড়। এদের ধর্মের মধ্যে কর্ম শুধু হিন্দু দেবদেবীকে গাল পাড়া। সব চেয়ে ঝাল বেশি কালী আর কৃষ্ণের উপর। কালী ন্যাংটা আর কৃষ্ণ ননীচোর।

শ্রোতার দল মেতে ওঠে। এক কথায় বাপ-পিতেমোর ধর্মকে নাকচ করে দেয়। হিন্দুধর্ম একটা কুসংস্কার। ছত্রিশ রকম জাত মানে। স্ত্রীলোকে আর বাসন-কোসনে তফাৎ রাখে না। পালকিতে বসিয়ে পালকি-শুদ্ধ জলে ডুবিয়ে গঙ্গাস্নান করায় মেয়েদের। যিনি অনন্ত তাকে কি না নিয়ে এসেছে ঘটে-পটে, মাটির ডেলায়। আর দেবতাও একটি-দুটি নয়, তেত্রিশ কোটি।

অত হিসেব সামলাতে পারব না। পাদরির কথাই ঠিক। ঈশ্বর এক আর নিরাকার। আর ঈশ্বরের অবতার যীশুখৃষ্টই একমাত্র সমুদ্ধর্তা।

গির্জের খাতায় নাম লেখাতে লাগল দলে-দলে। যেহেতু খৃষ্টান হলাম সেহেতু সাহেব হয়ে গেলাম। তাই নিয়ে এসো মদ, নিয়ে এসো নিষিদ্ধ মাংস।

একেই বলেছে, 'জাত মাল্লে পাদরি এসে, প্যাট মাল্লে নীল বাঁদরে।'

এখন এর উপায় কি? সব যে যায়!

রামমোহন নিয়ে এলেন বেদান্তের বাণী, দেবেন ঠাকুর তাকে সংহত করলেন ব্রাহ্ম-ধর্মে। আর কেশব লেগে গেল প্রচারণায়। বক্তৃতা দিয়ে ফিরতে লাগল। শুধু বক্তৃতা নয়, বার করল একাধিক পত্রিকা।

উন্মার্গগামীরা একটু থমকে দাঁড়াল।

খৃষ্টধর্ম আর হিন্দুধর্মের মধ্যে একটা আপোষ ঘটালো কেশব সেন। মূর্তি দূর করে দাও, নিয়ে থাকো ভক্তির ভাবটি। যীশুবিহীন যীশুর ধর্ম গ্রহণ করো। তুলে দাও জাতিভেদ আর যদি দেশের মুক্তি আত্মার মুক্তি চাও, মুক্তি দাও স্ত্রীজাতিকে।

বেশ ভাব। ইংরেজের ধর্ম খৃষ্টানিও আছে, বাপ-পিতেমোর ধর্ম হিঁদুয়ানিও আছে। চলো ব্রাহ্মসমাজে গিয়েই নাম লেখাই।

কেনারাম ডেপুটিকে জিগগেস করছে নিমচাঁদ : 'তুমি তো ব্রাহ্ম হয়েছ, হিন্দু-শাস্ত্রের তেত্রিশ কোটি দেবতার সব ত্যাগ করেছ, না, দুটি-একটি রেখেছ, সাত দোহাই তোমার, যথার্থ করে বলো—'

কেনারাম বললে, 'আমি কেতাব না দেখে উত্তর দিতে পারি না। আপনি ভারি শক্ত প্রশ্ন করেছেন—'

'দূর ব্যাটা ঘটিরাম,' নিমচাঁদ ঝাঁজিয়ে উঠল : 'তুমি ব্রাহ্মধর্ম যত বুঝেছ তা এক আঁচড়ে জানা গিয়েছে। যখন ব্রাহ্মধর্মের সর্ত হচ্ছে একমেবাদ্বিতীয়ম্, তখন তেত্রিশ কোটি দেবতার সব ত্যাগ করিচিস কি না, বলতে কতক্ষণ লাগে?'

কেনারাম চিন্তিত মুখে বললে, 'একটি-আধটি ঠাকুর হলে খপ করে বলা যায়, তেত্রিশ কোটির কথা ঝাঁ করে বলা যায় না—জানি কি, যদি দুটো-একটা রাখবার মত হয়!'

ব্রাহ্মধর্ম বুঝুক আর না বুঝুক, লোক তো আগে ফিরুক পাদরিদের খপ্পর থেকে। হুজুগটা তো বন্ধ হোক।

কেশবের বাগ্মিতায় আর ধর্মসাধনায় বিশ্বাস ফিরে এল উদ্‌ভ্রান্তদের। ঝাড়াই-বাছাই করে যদি দেশের মাঠেই পাই তবে কেন আর যাই বিদেশের মাটিতে। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজে নাম লিখলেই তো শুধু চলবে না, নিতে হবে নীতি আর পবিত্রতার পাঠ, সত্যনিষ্ঠা আর পরোপকারের ব্রত। 'ব্যান্ড অফ হোপ' নামে এক দল খুলল কেশব। মদ-তামাক খাব না। ছোঁব না নিষিদ্ধ মাংস।

নিমচাঁদকে শাসালো রামধন : 'তুমি বসো, আমি তোমার শ্রাদ্ধের আয়োজন করে আসছি!'

নিমে বললে, 'ব্রাহ্মমতে কোরো বাবা। অনেক বৃষ পার করেছি, এখন আর বৃষ উৎসর্গ ভালো লাগবে না।'

এর পর আবার আরেক দল উঠল যারা ঠাকুর-দেবতাও মানে না নিরাকার ব্রহ্মও বোঝে না। তারা নাস্তিক, সংশয়ে ছিন্নবিচ্ছিন্ন। কোনটা যে ধরবে ঠিক করতে পারছে না। হাল-ছাড়া নৌকোর মতো দিশেহারা হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আরেক দল উঠল, যারা প্রত্যক্ষবাদী। ধর্ম-টর্ম ধার ধারে না, ইন্দ্রিয়ের বাইরে জানে না আর কোনো অনুভূতির অস্তিত্ব।

চার দিকে বিশৃংখলা, অশান্তি, একটা ঝোড়ো হাওয়ার এলোমেলো ধুলো।

এমন সময় ঠাকুর এলেন। সনাতন ধর্মের শাশ্বত জ্যোতির স্নিগ্ধতা নিয়ে, বিশ্ববিস্তীর্ণ উদার উন্মুক্তি নিয়ে। হিন্দুধর্মের উজ্জ্বলন্ত প্রতীক হয়ে,

নির্গলিত ভাষ্য হয়ে। নিয়ে এলেন শান্তি, সাম্য, সামঞ্জস্য। নিয়ে এলেন সঙ্গতি, সংহতি, সমন্বয়। খণ্ডের ঘরে ক্ষুদ্রের ঘরে রইলেন না, এলেন একেবারে ভুবনজোড়া আসন মেলে।

নিয়ে এলেন সত্য, শৌচ, দয়া, শান্তি, ত্যাগ, সন্তোষ আর আর্জব। শম দম তপ সাম্য তিতিক্ষা শ্রুত আর উপরতি। নিয়ে এলেন প্রেম। প্রেমের অমোঘ মহিমা।

ভগবান ভূতভাবন হিন্দুধর্মের মন্ত্রাঙ্কিত পতাকা নিয়ে অবতীর্ণ হলেন দক্ষিণেশ্বরে। যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত—হতপ্রভ সূর্য উদ্দীপিত হল। ঠাকুর মৃতদেহে নিশ্বাস সঞ্চার করলেন। ক্রমে-ক্রমে সঞ্চার করলেন আশ্বাস। তার পর সকলে বিশ্বাসের বটপত্রে ভেসে-ভেসে চলল। ভেসে চলল সেই অমৃতের সমুদ্রে।

দক্ষিণেশ্বরের দুর্গম অরণ্যে সরল একটি ফুল ফুটেছে। কিন্তু লোকে তার গন্ধটির খবর পায় কি করে? ফুল তো ফুটলেই চলে না, চাই গন্ধবহ সমীরণ। যে বলবে, দেখ, কেমন ফুল ফুটেছে; আর, শোনো, আমার সঙ্গ ধরো, দেখবে চলো, কোথায় ফুটেছে এ ফুল! আমি নিয়ে এসেছি সেই কাননের ঠিকানা। কেশব সেনই সেই গন্ধবহ সমীরণ।
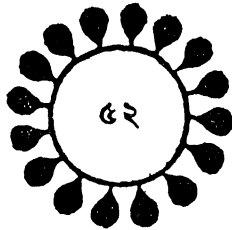
কেশব সেনকে রামকৃষ্ণ প্রথম দেখে আদি সমাজে, সে অনেক আগে। মসজিদ ঘুরে, গির্জে ঘুরে গিয়েছিল এক দিন ব্রাহ্মসভায়। গিয়ে দেখে বেদীর উপর চার পাশে অনেক লোক, মাঝখানে কেশব। ধ্যান করছে চোখ বুজে।

'জোড়াসাঁকোর দেবেন্দ্রর সমাজে গিয়ে দেখলাম, তাকের উপর ক'জন বসেছে, কেশব মাঝখানে। দেখলাম যেন কাষ্ঠবৎ। সেজবাবুকে বললাম, যত জন ধ্যান করছে তার মধ্যে ঐ কেশব ছোকরারই ফাতনা ডুবেছে। ও কি যে-সে ছেলে? লেখাপড়া নেই, বাপের ধার মেনে নিলে এক কথায়। অন্য ছেলে হলে মানত?'

কিন্তু চোখ বুজেই বা ধ্যান করতে হবে কেন? চোখ চেয়েও ধ্যান হয়। কথা কইছে তবু ধ্যান। যেমন ধরো দাঁতের ব্যথা। সব কাজ করছে কিন্তু মন রয়েছে দরদের দিকে। চোখ চেয়ে আছে, কথা কইছে, কাজ করছে, কিন্তু মন রয়েছে

ভগবানে বিদ্ধ হয়ে। তিনিও আমাকে চান, আমিও তাঁকে চাই, তবু ধরতে পারছি না, মিলতে পারছি না—এ কি কম যন্ত্রণা?

এবার শুধু দূর থেকে দেখা নয়, কাছে এসে বসা, আলাপ করা, অন্তরের অঙ্গ হয়ে যাওয়া। তার আগে কেশবকে এক দিন স্বপ্নে দেখেছিল রামকৃষ্ণ। মা-ই দেখিয়েছিলেন। কেশব যেন পেখম-মেলা ময়ূর, ময়ূরের মাথায় মুক্তো। মা-ই বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। পেখম হচ্ছে কেশবের শিষ্যমণ্ডল আর মুক্তোটি হচ্ছে তার রাজসিকতার দীপ্তি।

সকাল বেলার দিকে কেশব তার শিষ্যবৃন্দ নিয়ে পুকুরের বাঁধাঘাটে বসে আছে, হৃদয় আস্তে-আস্তে কাছে এল। বললে, 'আমার মামা আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।'

কে আপনার মামা?

ঐ দক্ষিণেশ্বরে থাকেন। হরিকথা শুনতে বড় ভালোবাসেন। সারা দিনরাত ডুবে আছেন এই হরিকথায়। যেখানে হরিনাম পান হরিভক্ত পান সেখানেই গিয়ে উপস্থিত হন। হরিগুণগান শুনে তাঁর ভাবসমাধি হয়। আপনি এখানে হরিনাম করতে এসেছেন জেনে আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।

'কোথায় তিনি?'

'গাড়িতে বসে আছেন।'

'নিয়ে আসুন নামিয়ে।' কেশব ব্যস্ত হয়ে উঠল।

হৃদয় গিয়ে নামিয়ে নিয়ে এল রামকৃষ্ণকে। সবাই রামকৃষ্ণকে দেখবার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে রয়েছে। দেখে হতাশ হবার ভাব করল। ও! এই? এ তো এক জন সাধারণ লোক। আজেবাজে পাঁচ জনেরই এক জন।

রামকৃষ্ণ বুঝতে পেরেছে কোন জন কেশব। বুকের ভিতরে তারে-তারে সুর বেজে উঠল। কেশবের কাছে আসবার আগে নারায়ণ শাস্ত্রীকে পাঠিয়েছিল একবার রামকৃষ্ণ। বলেছিল, তুমি একবার যাও, গিয়ে দেখে এস তো কেমন লোক। নারায়ণ দেখে এসে বলেছিল লোকটা জপে সিদ্ধ।

রামকৃষ্ণ কেশবের কাছটিতে চলে এল। বললে, 'বাবু, তোমাদের কাছে ঈশ্বরের কথা শুনতে এসেছি। তোমরা না কি দেখেছ ঈশ্বরকে? সে কেমনতরো দর্শন আমাকে একটু বলবে?'

কেশব তন্ময়ের মত তাকিয়ে রইল রামকৃষ্ণের দিকে। এ সে কী দেখছে? কাকে দেখছে? বললে, 'আপনি বলুন—'

আমি বলব? গলা ছেড়ে গান ধরল রামকৃষ্ণ।

'কে জানে কালী কেমন,
ষড়দর্শনে না পায় দরশন,
মূলাধারে সহস্রারে
সদাযোগী করে মনন।

ঘটে ঘটে বিরাজ করেন
ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা যেমন॥
মায়ের উদরে ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ড
প্রকাণ্ড তা জানো কেমন,
মহাকাল জেনেছেন কালীর মর্ম,
অন্য কেবা জানে তেমন।
প্রসাদ ভাষে লোকে হাসে
সন্তরণে সিন্ধু তরণ॥'

গাইতে-গাইতে রামকৃষ্ণের সমাধি হয়ে গেল। উপস্থিত সকলে ভাবলে এ বুঝি একটা ঢং, মস্তিষ্কের বিকার। কিংবা হয়তো লোকটার মৃগি আছে।
রামকৃষ্ণের কানে হৃদয় প্রণব-মন্ত্র উচ্চারণ করতে লাগল। হরি ওঁ। হরি ওঁ!
ধীরে ধীরে রামকৃষ্ণের মুখ প্রসন্ন পবিত্র হাস্যে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। যে আস্বাদন করে এসেছে, অবগাহন করে এসেছে এ তার মুখ। এ মুখ উপলব্ধির, সমাপত্তির। জ্ঞানানন্দ, বোধানন্দ আর মিলনানন্দের সংমিশ্রণ।
এ মুখের বিভা দেখে অভিভূত হয়ে গেল সকলে।
অন্ধেরা হাতি দেখে এল ছুঁয়ে-ছুঁয়ে। এক জনের হাত পড়েছিল পায়ে, সে বললে, হাতি ঠিক থামের মতো। আরেক জনের হাত পড়েছিল পেটে, সে বললে, জলের জালার মতো। দূর, কুলোর মতো—কানে হাত রেখেছিল যে তৃতীয় জন, সে বললে।

'ভাবলে ভাবের উদয় হয়।
যেমনি ভাব তেমনি লাভ মূল সে প্রত্যয়।'

গাছে এক গিরগিটি থাকে। এক জন তাকে দেখে এসে বললে, একটা সুন্দর লাল রঙের জানোয়ার দেখলাম। আরেক জন বললে, ভুল দেখেছিস, লাল নয় নীল। তোরা তো খুব জানিস! আমি স্বচক্ষে দেখে এসেছি আজ সকালে, বিলকুল হলদে। বললে তৃতীয় জন। কাকে যে তোরা কী রঙ বলিস কিছু ঠিক নেই। বিদ্রূপ করে হেসে উঠল চতুর্থ জন। স্রেফ সবুজ, একেবারে কচু পাতার রঙ। মহাবিরোধ উপস্থিত। সবাই মিলে চলল সেই গাছের নিচে। গিয়ে দেখে এক জন লোক বসে আছে সেখানে। তাকে সবাই ধরল। আপনি তো এখানকার বাসিন্দা, বলুন জানোয়ারটার কী রঙ? যে যেমন দেখ তেমনি। তোমাদের সকলের কথাই ঠিক, ও কখনো লাল কখনো নীল কখনো হলদে কখনো সবুজ। ওটা বহুরূপী। আবার কখনো-কখনো দেখা যাবে ওটার একদম রঙ নেই। ওটা বর্ণহীন, নির্গুণ।
সবাই তন্ময় হয়ে শুনতে লাগল রামকৃষ্ণকে।

ভক্ত যে রূপটি ভালোবাসে ভগবান সেই রূপটি ধরে দেখা দেন। এক জনের এক গামলা রঙ ছিল। অনেকে আসত তার কাছে কাপড় রঙ করবার জন্যে। যে যে-রঙ চায় তার কাপড় সেই রঙে ছুপিয়ে দিত। এক জন দেখছিল এই আশ্চর্য ব্যাপার। তাকে রঙওয়ালা জিগগেস করলে, তোমার কী রঙ চাই? সে বললে, 'ভাই যে রঙে রঙেছ আমায় সেই রঙ দাও।'

কী গভীর কথা কেমন সরস করে বলছে রামকৃষ্ণ। স্নানাহারের বেলা হয়ে গেল তবু কারু ওঠবার নাম নেই।

নিরাকার জ্ঞানের সাধন, সাকার ভক্তির। ভক্তির কাছে নিরাকার এনো না, কিছু দেখতে না পেলে ধরতে না পেলে তার ভক্তির হানি হবে। সাকার থেকে চলে আসবে সে নিরাকারে। আগে হয়তো দশভুজা নিলে—সে মূর্তিতে বেশি ঐশ্বর্য। তার পর চতুর্ভুজ। তার পর দ্বিভুজ। তার পর গোপাল—বালগোপাল। ঐশ্বর্যের বালাই নেই, কেবল একটি কচি ছেলের মূর্তি। তার পরে আরো ছোট হয়ে গেল—একটি শিবলিঙ্গ বা শালগ্রাম। তার পর? আর দরকার নেই রূপে। প্রতীক তখন প্রত্যক্ষের বাইরে। তখন মহাব্যোমে একটি অখণ্ড জ্যোতি। সেই জ্যোতি দর্শন করেই লয়।

কিন্তু, তার পর? ধ্যান যখন ভাঙবে? জ্ঞানের পর কোথায় এসে দাঁড়াবে? দাঁড়াবে এসে প্রেমে। তখন আবার সাকারে চলে আসবে। তখন দেখবে সমস্ত জীব ঈশ্বরের প্রতিভাস। জীবের আকারে ব্রহ্ম বিচরণ করছেন। তখন ব্রহ্মোপাসনা মানে জীবোপাসনা। আর জীবে যা প্রেম ঈশ্বরে তাই ভক্তি। আর, ভক্তির প্রগাঢ় পরিপক্ক অবস্থাই প্রেম।

উপাসনার ঘণ্টা বাজল। এখন উঠতে হয় এই আড্ডা ছেড়ে।

কে ওঠে! কোথায় আবার উপাসনা! ভগবানের কাছটিতে বসাই তো উপাসনা। এ কি আমরা ভগবানের কাছটিতে বসে নেই?

বেদান্তের বিচারে ব্রহ্ম নির্গুণ। তাঁর কী স্বরূপ কেউ বলতে পারে না। কিন্তু যতক্ষণ তুমি সত্য ততক্ষণ জগৎও সত্য। ঈশ্বরের নানা রূপও সত্য। ঈশ্বরকে ব্যক্তিবোধও সত্য।

দুই-ই সত্য। নিরাকারও সত্য, সাকারও সত্য। কবীর বলত, নিরাকার আমার বাপ, সাকার আমার মা। তুমি কাকে ছেড়ে কাকে রাখবে?

নানা রকম পূজো তিনিই আয়োজন করেছেন, অধিকারী ভেদে। যার যেমন পেটে সয় তেমনিই তো পরিবেশন করবেন। বাড়িতে যদি বড় মাছ আসে, মা নানা রকম মাছের তরকারি রাঁধেন—যার যেটি মুখে রোচে। কারু জন্যে মাছের টক, কারু জন্যে মাছের চচ্চড়ি, কারু জন্যে মাছ ভাজা। যেটি যার ভালো লাগে, যেটি যার পেটে সয়। সর্বত্রই সেই মৎস্যস্বাদ।

আমাদের হলধারী দিনে সাকারে আর রাতে নিরাকারে থাকত। তা যে ভাবেই থাকো, ঠিক-ঠিক বিশ্বাস হলেই হল। বিশ্বাস, বিশ্বাস, বিশ্বাস। গুরু বলে দিয়েছে, রামই সব হয়েছেন—'ওহি রাম ঘট ঘটমে লেটা।' কুকুর এসে রুটি খেয়ে

যাচ্ছে। ভক্ত বলছে, 'রাম! দাঁড়াও, দাঁড়াও, রুটিতে ঘি মেখে দিই।' গুরুবাক্যে এমনি বিশ্বাস!

কিন্তু যাই বলো, সাকারই বলো নিরাকারই বলো, তিনি রয়েছেন এই খোলের মধ্যেই। হরিণের নাভিতে কস্তুরী হয়, তখন তার গন্ধে হরিণগুলো দিকে-দিকে ছুটে বেড়ায়, জানে না কোত্থেকে গন্ধ আসছে। তেমনি ভগবান এই মানুষের দেহের মধ্যেই রয়েছেন, মানুষ তাকে জানতে না পেরে ঘুরে-ঘুরে মরছে।

এ কি, আজ কি আর কোনো কাজ হবে না না কি? সবাই এমনি বসে থাকবে সারাক্ষণ? মন্ত্রমুগ্ধের মত বসে আছে। মন্ত্রমুগ্ধের মত চেয়ে আছে। চার দিকে শুধু আনন্দের ঢেউ।

'এ যেন গরুর পালে গরু এসেছে। ঝাঁকের কই মিশেছে ঝাঁকে এসে। তাই এত লহর পড়েছে চার দিকে।'

কেশব ভক্তিতে অভিভূত হয়ে পড়েছে। এমনটি তো সে কই ভাবেনি। এ যে একেবারে 'আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।' ভূমার অখণ্ড অভ্যুদয়। প্রণামের রসে আপ্লুত হল কেশব। নিজেকে বালকের মতন মনে হল। চিনির পাহাড়ের কাছে ক্ষুদ্র এক পিপীলিকা।

নিশ্চয়ই ঈশ্বর দেখেছে, পেয়েছে, হয়েছে। নইলে এমন সব কথা কয়! কথায়-কথায় এমন একটি ভাব আনে! এমন সব সহজ করে দেয় সহজে।

তর্কের জায়গা নেই, প্রশ্ন সব ঘুমিয়ে পড়েছে। সন্দেহ মাথা তুলতে পারছে না। চোখের সামনে বসে আছে যেন প্রত্যক্ষ প্রমাণ। সর্বশেষ উপলব্ধি।

উঠল রামকৃষ্ণ। যাবার আগে কেশবকে বললে, 'তোমার ল্যাজ খসেছে।'

কেশব তো অবাক।

ব্যাঙাচির যদ্দিন ল্যাজ থাকে তদ্দিন জলেই থাকে, ডাঙায় উঠতে পারে না। কিন্তু ল্যাজ যখন খসে পড়ে তখন জলেও থাকতে পারে, ডাঙায়ও উঠতে পারে। তেমনি মানুষের যদ্দিন অবিদ্যার ল্যাজ থাকে তদ্দিন সে সংসার-জলেই থাকতে পারে, ব্রহ্মস্থলে উঠতে পারে না। ল্যাজ খসে পড়লেই সংসার ও সারাৎসার দুই জায়গায়ই সে থাকতে পারে। তুমি তেমনি সংসারেও আছ সচ্চিদানন্দেও আছ।

সংসারে থেকে যে তাঁকে ডাকে সে বীরভক্ত। যে সংসার ছেড়ে এসেছে সে তো ডাকবেই—ডাকবার জন্যেই এসেছে, তাতে তার বাহাদুরি কি। সংসারে থেকে যে ডাকে, সে বিশ মণ পাথর ঠেলে দেখতে চায়, সেই ধন্য, সেই বাহাদুর, সেই বীর-পুরুষ।

রামকৃষ্ণ চলে গেলে এ ওর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। এই সহজ সুন্দরটি কে? কে এই সদয়হৃদয়? কে এই মায়ামানুষবেশী?

চলো যাই সভা করে সবাইকে বলি গে। অখিল মধুরের যিনি অধিপতি তিনি এসেছেন দক্ষিণেশ্বরে।

তুমি কি তাঁকে চোখে দেখেছ? সবাই ঘিরে ধরে কেশবকে।

চোখে দেখেছি। দুই চোখে তাঁকে কুলোয় না। চল তোরাও দেখবি চল।
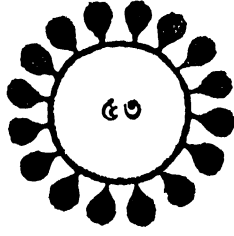
দক্ষিণেশ্বরে চর পাঠিয়ে দিল কেশব। লক্ষ্য করবে রামকৃষ্ণকে। চোখে-চোখে রাখবে। রাত-দিন পাহারা দেবে। ঠিক-ঠিক খাঁটি কিনা, না, আছে কিছু বুজরুকি।

হ্যাঁ, ভালো কথা, বাজিয়ে নাও, যাচাই করে নাও। পরের মুখের ঝাল খাবে কেন? কেন মেনে নেবে শোনা কথা? নিজে এসো, বসো, দেখ পরখ করে। তন্ন-তন্ন করে দেখ।

কিন্তু পরীক্ষার পর প্রমাণে যদি পরিতৃপ্ত হও, তখন কী হবে? কোন দিকে যাত্রা করবে?

তিন জন ব্রাহ্ম-ভক্ত এল দক্ষিণেশ্বরে। তাদের মধ্যে এক জন প্রসন্ন। পালা করে রাত-দিন দেখবে রামকৃষ্ণকে আর কেশব সেনকে রিপোর্ট দেবে। পোশাকী আর আটপৌরে এমন কিছু ভেদ আছে নাকি রামকৃষ্ণের। সে মনে-মুখে এক কি না। সে কি সত্যিই জিতাসন, জিতশ্বাস, জিতেন্দ্রিয়? সে কি সত্যিই পরিমুক্তসঙ্গ?

রামকৃষ্ণের ঘরের মধ্যে চলে এল সটান। বললে, 'রাত্রে আমরা ও-ঘরে শোব।'

বেশ তো, শোও না! ঢালাও নিমন্ত্রণ রামকৃষ্ণের।

কিন্তু শুবি তো চুপ করে শুয়ে থাক। তা না, কেবল 'দয়াময়', 'দয়াময়' করতে লাগল। নিরাকার কিনা, তাই ঈশ্বরের দয়া ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ে না। তাঁর ঐশ্বর্যই তো দয়া। সূর্যের ঐশ্বর্যই যেমন আলো। সূর্যকে যদি 'আলোময়' 'আলোময়' বলা যায়, কিছুই বলা হয় না। নতুন কিছু বল। ডাকার মতন করে ডাক। যে-ডাকে শুধু দয়া দেখাতে আসবে না, ভালোবাসায় গলে জল হয়ে যাবে।

ব্রাহ্ম-ভক্তরা কেশবের স্তুতি আরম্ভ করল। বলল, 'কেশববাবুকে ধরো, তা হলেই তোমার ভালো হবে।'

'কিন্তু আমি যে সাকার মানি।'

আমি যে মা বলে ডাকি। মাকে যদি নিরাকার করি তবে অমন কোলটুকু পাব কি করে? কি করে দেখব তবে সেই সুখপ্রসন্ন বদনের স্নেহময় সুষমা?

মা কি আমার সামান্য? মা আমার অনন্তরূপিণী। মা আমার কালাভ্রশ্যামলাঙ্গী, বিগলিতচিকুরা, খড়্গমুণ্ডাভিরামা। মহামেঘপ্রভা, শ্মশানালয়বাসিনী। বলতে

চাও, এমন রূপটি আমি দেখব না নয়ন ভরে? দেখব না তো, আমার নয়ন হল কেন?
শোনো, কমলাকান্ত কি বলছে। দেখো, শুনতে-শুনতে দেখো কিনা চোখের সামনে।

সমর আলো করে কার কামিনী!
সজল জলদ জিনিয়া কায়
দশনে প্রকাশে দামিনী॥
এলায়ে চাঁচর চিকুর পাশ
সুরাসুর মাঝে না করে ত্রাস,
অট্টহাসে দানব নাশে
রণপ্রকাশে রঙ্গিণী॥
কিবা শোভা করে শ্রমজ বিন্দু
ঘন তনু ঘেরি কুমুদবন্ধু
অমিয় সিন্ধু হেরিয়ে ইন্দু
মলিন, এ কোন মোহিনী॥
এ কি অসম্ভব ভব-পরাভব
পদতলে শব সদৃশ নীরব
কমলাকান্ত কর অনুভব
কে বটে ও গজগামিনী॥

এই রণরামা নীরদবরণীকে দেখব না আমি? আহা, দেখ, দেখ, শোণিত-সায়রে যেন নীল নলিনী ভাসছে!
তবুও ব্রাহ্ম-ভক্তরা কেবল 'দয়াময়' 'দয়াময়' করে। ঘুমুতে দেবে না রামকৃষ্ণকে। তখন রামকৃষ্ণের ভাবাবস্থা হল। সেই অবস্থায় আরূঢ় থেকে বললে সেই ভক্তদের : 'এ ঘর থেকে চলে যাও বলছি।'
যেন বজ্রঘোষের আদেশ। ভক্তরা তখন পালিয়ে যেতে পথ পায় না। ঘর ছেড়ে তখন বারান্দায় গিয়ে শুলো।
কাপ্তেনও এমনি পরীক্ষা করে নিয়েছিল। যেদিন দিনের বেলায় প্রথম দেখলে রামকৃষ্ণকে, ঠিক করলে রাতের বেলাও দেখে যেতে হবে। দেখে যেতে হবে রাতেও এ সূর্য সমপ্রভই থাকে কিনা। কোণটিতে চুপি-চুপি রইল চোখ মেলে। দেখল এ সূর্যের উদয়াচলই আছে, অস্তাচল নেই।
আমাকে শক্ত হাতে বাজিয়ে নিবি, যেমন করে শানের উপরে মহাজনে টাকা বাজায়। বেপারী যেমন তীক্ষ্ম চোখে দেখে নেয় মালের টুটা-ফুটা। ভক্ত হয়েছিস বলে বোকা হবি কেন? বুঝে-সুঝে দেখে-শুনে নিবি। সন্দেহই যদি রাখবি তবে সন্ধান জানবি কি করে?

নরেন্দ্র দক্ষিণেশ্বরে এসেছে। ঠাকুরের ঘরটিতে গিয়ে দেখে, ঠাকুর নেই। কোথায় তিনি? কলকাতায় গিয়েছেন। ফিরবেন কখন? এই এলেন বলে।
তা হোক, এই সোনার সময়। দেখা যাক কেমন তাঁর সোনার উপর বিতৃষ্ণা!
ঘর ফাঁকা হতেই পকেট থেকে একটা টাকা বের করলে নরেন। ঠাকুরের বিছানার নিচে আলগোছে লুকিয়ে রাখলে। সে-তল্লাটেই আর রইল না তার পর। সিধে চলে গেল পঞ্চবটী। কেউ যেন ঘুণাক্ষরে না টের পায়!
কতক্ষণ পরেই ফিরে এলেন ঠাকুর। দেখতে পেয়েই নরেন এগিয়ে এল তাড়াতাড়ি। এবার বোঝা যাবে কাঞ্চনত্যাগের মহিমা। ঘরের মধ্যে আগে-ভাগে ঢুকে ঠিক কোণটি বেছে দাঁড়িয়ে রইল চুপচাপ।
যেমন নিত্য বসেন তেমনি বিছানায় এসে বসলেন ঠাকুর। কিন্তু গা ঠেকিয়েছেন কি না ঠেকিয়েছেন চীৎকার করে উঠলেন। যেন জ্বলন্ত অঙ্গারের উপর বসেছেন এমনি দগ্ধকর যন্ত্রণা। কী হল? ত্রস্তব্যস্ত হয়ে চারদিকে তাকাতে লাগল সকলে। বিষাক্ত কিছু দংশন করল নাকি? কই, বিছানায় কিছু দেখা যাচ্ছে না তো!
ঠাকুর সরে দাঁড়ালেন খাটের থেকে। কাছাকাছি যারা ছিল সবল হাতে ঝাড়তে লাগল বিছানা। টং-টং করে হঠাৎ একটা আওয়াজ হল মেঝের উপর। ওটা কি? ওটা একটা টাকা দেখছি না? বিছানায় এল কি করে?
নরেন তাড়াতাড়ি চলে গেল ঘর ছেড়ে।
বুঝেছি, বুঝেছি। আনন্দে ঠাকুর বিহ্বল হয়ে উঠলেন। তুই আমাকে পরীক্ষা করছিস।
বেশ তো, নিবিই তো পরীক্ষা করে। কত পরীক্ষা করেছেন মথুরবাবু। ফাঁকা ঘরে মেয়েমানুষ ঢুকিয়ে দিয়েছেন, বলেছেন জমিদারির খানিকটা তোমাকে লিখে দি। তোদের যার যেমন মন চায় যাচাই করে নে। যা চাই তা পাব কিনা—এ জিজ্ঞাসায় যখন এসেছিস তখন যাচাই করা ছাড়বি কেন?
তোদের সকলের সন্দেহ নিরসন করে নে। চলে আয় সত্যের স্থিরতায়। সিদ্ধান্তের শান্তিতে।
দক্ষিণেশ্বরের জমিদার নবীন রায়চৌধুরীর ছেলে যোগীন। বিয়ে করেছে, তবু রোজ রাতে বাড়ি যায় না, প্রায়ই ঠাকুরের কাছটিতে পড়ে থাকে। যখন আর-আর ভক্তরা কাছে-ভিতে কেউ নেই, তখন ফাঁকতালে ঠাকুরের কোনো কাজে লেগে যেতে পারে কিনা, তারই আশায় জেগে থাকে।
সেদিন সন্ধ্যে হতে-না-হতেই ভক্তেরা বিদায় নিয়েছে। যোগীন বসে আছে একলাটি।
'কি রে, বাড়ি যাবি না?'
'কেউ আজ নেই আপনার কাছে। ভাবছি, আমিই তবে থেকে যাই রাতখানা।'
ঠাকুর খুশি হলেন। রাত দশটা পর্যন্ত আলাপ করলেন একটানা। আলাপের বিষয়ও সেই একটানের বিষয়। অটনে-অনটনে সেই এই ঈশ্বরের টান।

রাত দশটায় জলযোগ করলেন ঠাকুর। যোগীনও খেয়ে নিল কালীঘরে। ঠাকুর শুয়ে পড়লেন তাঁর বড় খাটটিতে। সেই ঘরেই মেঝেতে বিছানা পাতল যোগীন। মাঝ রাত। ঠাকুরের একটিবার বাইরে যাবার দরকার হল। তিনি তাকালেন যোগীনের দিকে। অঘোরে ঘুমুচ্ছে ছেলেটা। কেমন মায়া হল ঠাকুরের, ডেকে ঘুম ভাঙালেন না। নিজেই দোর খুলে বেরিয়ে গেলেন। একা-একা চলে গেলেন ঝাউতলা।

খানিক পরেই ঘুম ভেঙে গেল যোগীনের। এ কি, ঘরের দরজা খোলা কেন? ঠাকুর কোথায়? বিছানা শূন্য। এত রাত্রে কোথায় গেলেন তিনি একা-একা? গাড়ু-গামছা তো সব ঠিক-ঠিক জায়গায়ই আছে। আর, তাই যদি যাবেন, তবে তাকে দাঁড়িয়ে দিতে নিয়ে গেলেন না কেন সঙ্গে করে? তবে বোধ হয় চাঁদের আলোয় একটু বেড়িয়ে বেড়াচ্ছেন। গঙ্গায় ঝিরঝিরে হাওয়া দিয়েছে।

কই, গঙ্গার কাছাকাছি কোথাও তিনি নেই তো! যোগীন বাইরে এসে উৎসুক চোখে দেখতে লাগল চার দিক। কোথাও সাড়াও নেই শব্দও নেই। হঠাৎ বুকের মধ্যে ধাক্কা খেল যোগীন। ঠাকুর লুকিয়ে তাঁর স্ত্রীর কাছে নহবৎখানায় যাননি তো? ভয় করতে লাগল যোগীনের। দিনের বেলা তিনি যা বলেন রাতের বেলা তিনি তা পালন করেন না? ডুবে-ডুবে জল খান?

না, এর একটা হেস্ত-নেস্ত দেখে যেতে হবে। নহবৎখানার কাছাকাছি এগিয়ে গেল যোগীন। নিষ্পলক চোখে চেয়ে রইল দরজার দিকে। ব্যাপারটা অন্যায় হচ্ছে তবু নিশ্চিন্ত না হওয়া পর্যন্ত মুক্তি নেই।

দরজা খুলে ঠাকুর বেরিয়ে এলেই দক্ষিণেশ্বর ছেড়ে সোজা বাড়ি চলে যাবে যোগীন। পথ ভুলেও আসবে না এ তল্লাটে।

সমস্ত আকাশ-বাতাস যেন নিশ্বাস রুদ্ধ করে আছে। একটি গাছের পাতাও নড়ছে না। উৎসুক একটা প্রতীক্ষা মুহূর্তের মালায় স্তব্ধতার মন্ত্র জপ করে চলেছে। যিনি অচ্যুত তিনি যেন এখুনি বিচ্যুত হয়ে পড়বেন!

চট-চট—চটি জুতোর আওয়াজ শোনা গেল। কে যেন আসছে পঞ্চবটীর ওদিক থেকে। কান খাড়া করল যোগীন। এ তো সেই পরিচিত পদশব্দ। সর্বাঙ্গে শিউরে উঠে তাকাল চন্দ্রালোকে। সত্যিই তো, ঠাকুরই তো আসছেন।

কে কাকে ধরে ফেলে! যোগীনের ইচ্ছে হল মাটির সঙ্গে মিশে যাই। যে মাটিতে তিনি পা রেখেছেন সেই পদস্পর্শনের মাটিতে।

'কি রে এখানে দাঁড়িয়ে আছিস যে?' কাছে এসে প্রশান্ত বয়ানে জিগগেস করলেন ঠাকুর।

অধোমুখে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল যোগীন।

অন্তরদর্শী বুঝেছেন এক পলকে। তবু অপরাধ নেবার নাম নেই। তবু আশ্বাসের স্নেহছত্র মেলে ধরলেন স্বচ্ছন্দে। বললেন, 'বেশ, বেশ, এই তো চাই। সাধুকে সহজে বিশ্বাস করবি নে। সাধুকে দিনে দেখবি, রাতে দেখবি, তবে বিশ্বাস করবি। নে, চল, ঠিক করেছিস, এখন ঘরে আয়।'

ঠাকুরের পিছু-পিছু ঘরে ঢুকল যোগীন।
সারা রাত আর ঘুম এলো না যোগীনের। মনে-মনে বারংবার ক্ষমা চাইতে লাগলো সেই ক্ষমাময়ের কাছে।
ভগবানকে ছোট করেছেন বলে ব্যাসদেব যেমন ক্ষমা চেয়েছিলেন। বলেছিলেন, হে জগদীশ্বর, তুমি রূপবর্জিত, অথচ আমি ধ্যানে তোমার রূপকল্পনা করেছি। তুমি অখিলগুরু, বাক্যের অতীত, অথচ আমি স্তবস্তুতি করে তোমার অনির্বচনীয়তা নষ্ট করেছি। তুমি সর্বব্যাপী, অথচ আমি তীর্থভ্রমণ করে তোমার সেই সর্বব্যাপিত্ব খণ্ডন করেছি। আমি ঘোরতর অপরাধী। আমার এই বিকল্পতা-দোষত্রয় মার্জনা করো।
তেমনি করেই আকুল অনিদ্রায় ক্ষমা চাইতে লাগলো যোগীন। তুমি সংশয়-পরিলেশশূন্য। অথচ আমি আমার আবিল মনের কুটিল সন্দেহের ছায়া ফেললাম তোমার উপর। প্রভু, আমাকে ক্ষমা করো। তোমার পরিচ্ছন্ন দৃষ্টিতে আমাদের ঘনচ্ছন্ন দৃষ্টি সংশোধন করে দাও।
'কাকে সাধু বলে মশাই?' এক প্রতিবেশী এসে জিগগেস করলে রামকৃষ্ণকে।
'যার মন-প্রাণ-অন্তরাত্মা ঈশ্বরে নত হয়েছে তিনিই সাধু। যিনি কামকাঞ্চন-ত্যাগী। যিনি স্ত্রীলোককে মাতৃবৎ দেখেন, পুজো করেন। সর্বদা ঈশ্বর চিন্তা করেন, ঈশ্বরীয় কথা বই কথা কন না। আর সর্বভূতে ঈশ্বর আছে জেনে আপামর সকলের সেবা করেন।'
সাধুর আশা নেই, আসক্তি নেই। সে সতত সন্তুষ্ট। সে বহির্নিশ্চেষ্ট। তার আরম্ভ-উদ্যোগ নেই। তার সর্বত্র সমবুদ্ধি। তার ফলেও যা অফলেও তাই। তার কাছে নিন্দা-নান্দী এক কথা। শত্রু-মিত্র এক জন। তার গতি চঞ্চল কিন্তু মতিটি স্থির। তার দ্বেষ-লেশ নেই। সে প্রহ্লাদ মূর্তি। হেতু নেই অথচ ভক্তি। অকারণে অবারণ ভক্তি। প্রহ্লাদকে যখন কৃষ্ণ বর দিতে চাইলেন, প্রহ্লাদ কী বললে? বললে, 'যদি বর দেবেনই তবে এই বর দিন, আমায় যারা কষ্ট দিয়েছে, তাদের যেন অপরাধ না হয়। তারা যেন কষ্ট না পায়।' যে সাধু সে প্রহ্লাদের মতই সর্বভূতে হিতকামী।
তেমনি এক জন সাধু এসেছে দক্ষিণেশ্বরে। অক্ষতপুণ্যলেশ। অপঙ্কতোয় অচ্ছোদ সরোবর। তাঁর নাম রামকৃষ্ণ পরমহংস। অভয়প্রদ আশ্রয়কেতন। তাঁকে দেখবে চলো দলে-দলে।
ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা দিতে লাগল কেশব সেন। সাধারণ বক্তৃতামঞ্চ থেকে, এমন কি ব্রাহ্মসমাজের বেদীতে বসে। স্বশান্তরূপ স্বরূপানন্দ রামকৃষ্ণ। একেবারে বালকস্বভাব। ঘরের কাছে এই অনন্ত ধনের খবর না নিয়ে যাবে তোমরা বিদেশের বিপণিতে?
শুধু রসনা নয়, তেজস্বিনী লেখনী চালালে কেশব। সুলভ সমাচার, সানডে মিরর আর থিইস্টিক কোয়ার্টালি রিভিয়ুতে লিখতে লাগল।
ওরে আর কেউ নয়, কেশব সেন বলছে, কেশব সেন লিখছে। যেমন তপ্ত ভাষা

তেমনি দীপ্ত লেখা। এ কি ফেলা চলে? দেখছিস, বলতে-বলতে কেশবের গৌর আনন কেমন আরক্ত হয়ে উঠছে। একেই বুঝি বলে প্রত্যয়প্রতিভা। কি রে, কি বলছিস, যাবি একবার দক্ষিণেশ্বর? স্বচক্ষে দেখে আসবি?

আর, ওদিকে রামকৃষ্ণ ডাকছে আকুল কণ্ঠে : ওরে, তোরা কোথায়? তোদের ছাড়া আমি যে থাকতে পারছি না। আকাঠের মাঝে কোথায় তোরা সব চন্দন তরু? ধীরত্বার মাঝে বেগ, জড়তার মাঝে বল, ভীরুতার মাঝে বীর্য—কোথায় তোরা সব সৈনিক সন্ন্যাসী। চলে আয়। বন-জঙ্গল ভেদ করে নদীনালা সাঁতরে তীরবেগে বায়ুবেগে মনোবেগে চলে আয়। আমি তোদের জন্যে কত কথা কত ভাব কত ভালোবাসা নিয়ে বসে আছি। কত গান কত সুর কত নৃত্য। কত স্বাদ কত রুচি। চলে আয়, চলে আয়।
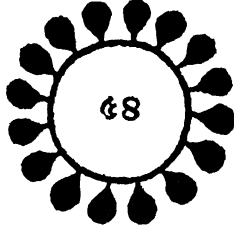
কয়াপাটের হাটতলা। সারদাকে নিয়ে এসেছেন শ্যামাসুন্দরী। এসেছেন পিলে দাগাতে।

শিবমন্দিরের অঙ্গনে বহু লোকের ভিড়। জ্বরে-জ্বরে সবাই সারা হয়ে গেল। পিলে দাগানো লোকটিকে ঘিরে সবাইর কাতর ঔৎসুক্য। কার কখন ডাক পড়ে। সবাই পিলে দাগাবে।

খানিকটা আগুন, লোহার শিক আর একটা কি পাতা। এই শুধু সরঞ্জাম। এতেই পিলে পালাবে দেশ ছেড়ে। আর মাথা তুলতে পাবে না।

বেলা বেড়ে যাচ্ছে। আবার ফিরতে হবে বাড়ি। কত রাজ্যের পথ! শ্যামাসুন্দরী অসহিষ্ণু হয়ে উঠল।

'মেয়েকে নিয়ে অনেকক্ষণ বসে আছি বাবা। যদি একটু এদিক পানে হাত দাও। মেয়ে আমার জ্বরে-জ্বরে ঝুরু-ঝুরু হল।'

'এই যে যাচ্ছি, মা। দেখছ তো গাহেকের ভিড়—'

'তোমার জন্যে একখানা নতুন কাপড় এনেছি। চান করে পরো। একটু জল খাও, তা-ও এনেছি তোমার জন্যে—'

লোকটি বুঝি এতক্ষণে সজাগ হল।

'কিন্তু নতুন পাতায় নতুন আগুন নাও। মেয়ে আমার গঙ্গাজলের মতন শুচি।'

তাই হল। পিলে দেগে দিল সারদার।
পিলে আরাম হল বটে, কিন্তু সংসারের দারিদ্র্য আর যায় না। শ্যামাসুন্দরী বাঁড়ুয্যেদের ধান ভানে। ষোলো কুড়িতে এক আড়া। এক আড়া ধান ভেনে চার কুড়ি ধান পায়। মায়ের সঙ্গে সারদাও হাত লাগায়।
গাঁয়ে কালীপুজো হবে। বাড়ি-বাড়ি ঘুরে পুজোর চাল যোগাড় হচ্ছে। তাদের বাড়ির বরাদ্দ চাল যোগাড় করে রেখেছেন শ্যামাসুন্দরী। কিন্তু গাঁয়ের মোড়ল নব মুখুজ্জে নিলে না সে চাল। কি নিয়ে আড়াআড়ি হয়েছে কে জানে, শ্যামাসুন্দরীর পুজোর চাল ফিরিয়ে দিলে। শ্যামাসুন্দরী সমস্ত রাত কাঁদলেন। বললেন, 'কালীর জন্যে চাল করেছি, নিলে না, ফিরিয়ে দিলে? এখন এ চাল আমার কে খায়? কাকে দিই?'
কাঁদতে-কাঁদতে ক্লান্ত হয়ে মাটির উপর শুয়ে পড়েছেন। রাত হয়েছে। হঠাৎ চোখ চেয়ে দেখেন দোরগোড়ায় কে এক জন সুন্দরী স্ত্রী বসে আছে চুপচাপ। বসে আছে পায়ের উপর পা দিয়ে। মুখ-হাত-পা সব লাল। প্রথম সূর্য উঠলে যেমন হয়, তেমনি অরুণ বর্ণের ঝলস দিয়েছে চার দিকে।
স্ত্রীলোকটি কাছে এসে গা চাপড়ে-চাপড়ে ওঠালেন শ্যামাসুন্দরীকে।
'তুমি কাঁদছ কেন? তোমার কালীর চাল আমি খাব।'
শ্যামাসুন্দরী তো অবাক। মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে শুধোলেন : 'তুমি কে?'
'ঐ যে গো—এর পরেই যার পুজো হয়। সেই আমি।'
পরদিন সারদাকে জিগগেস করলেন শ্যামাসুন্দরী : 'গায়ের রঙ লাল, পায়ের উপর পা দিয়ে বসে—ও কোন ঠাকুর রে সারদা?'
'জগদ্ধাত্রী।'
'আমি জগদ্ধাত্রীর পুজো করব।'
কিন্তু ওটুকু চালে হবে না। আরো চাল লাগবে। বিশ্বাসদের থেকে দু আড়া ধান আনালেন শ্যামাসুন্দরী। ধান আনালেন তো বৃষ্টিও নামল অঝোরে। এক দিনও ফাঁক নেই, সূর্জ্যি গিয়েছে বনবাসে। চাটাই বিছিয়ে ধান মেলে বসে আছি কবে থেকে। শ্যামাসুন্দরী হতাশার সুর ধরলেন : 'কি করে তবে আর তোমার পুজো হবে মা? ধানই শুকুতে পাল্লুম নি, তবে চাল করব কি করে?'
চার দিকে বৃষ্টি, শ্যামাসুন্দরীর ধানের চাটাইয়ে রোদ। জগদ্ধাত্রীর আশীর্বাদ!
কাঠের আগুনে সেঁকে মূর্তি শুকিয়ে রঙ দেওয়া হল। পুজোর পর প্রতিমা বিসর্জনের সময় শ্যামাসুন্দরী মূর্তির কানে বলে দিলেন, 'মা জগাই, আবার আর বছর এসো। আমি বছর ভোর তোমার সব যোগাড় করে রাখব।'
জগদ্ধাত্রীর পুজো করেই শ্রী ফিরল সংসারের।
মেয়েকে শ্যামাসুন্দরী বললেন, 'তুমি কিছু দিও, আমার জগাইয়ের পুজো হবে।'
সারদা থমকে গেল। বললে, 'আমি আবার কি দেব! ও সব ল্যাঠা আমি পারব নি। একবার পুজো তো হল, আবার কেন?'

রাত্রে স্বপ্ন দেখল সারদা। তিন জন কে-কে দাঁড়িয়েছে তার সামনে। বলছে, 'আমরা কি তবে যাব?'
'কে তোমরা?'
'আমি জগদ্ধাত্রী—আর এরা জয়া-বিজয়া।'
'না মা, তোমাদের যেতে বলিনি, কোথা যাবে তোমরা? তোমরা থাকো, যেও না।'
গলায় আঁচল দিয়ে জগদ্ধাত্রীর পায়ে গড় করল সারদা।
সারদা আর কি দেবে! শ্রম দেবে, সেবা দেবে। অন্তরের নিষ্ঠা দেবে।
জগদ্ধাত্রীর পুজোর সময় সারদা গিয়ে তাই বাসন মেজে দেয়।
'সেই থেকে বরাবর জগদ্ধাত্রীর পুজোতে জয়রামবাটি যাই—বাসন মাজতে হয় কিনা।' বললেন শ্রীমা, 'শেষকালে যোগীন সব কাঠের বাসন করে দিলে। বললে, মা, তোমাকে আর যেতে হবে না বাসন মাজতে।'
প্রতিমা বিসর্জনের সময় জগদ্ধাত্রীর কানের গয়না একটি খুলে রাখলে।
'সেইটিই মনে করে মা আবার আসবেন পরের বছর।' বললেন শ্রীমা।
মা আমাদের রাজরাজেশ্বরী।
তাঁর ফিরে আসতে আভরণের আকর্ষণ লাগে না। তিনি যে দীন-দরিদ্রের মা। শুধু একটি কাতর 'মা' ডাক শুনলেই তিনি চলে আসেন। ডাকও লাগে না, অন্তরে আকুলতা থাকলেই হল। প্রার্থনার চেয়েও বড় হচ্ছে আকুলতা। মুখরের চেয়েও মৌন। মুখে বললেই শুনবেন, আর মনে বললে শুনবেন না, মা কি আমাদের বধির?
মা আমাদের অমৃতভাষিণী অন্নপূর্ণা। 'অচক্ষু সর্বত্র চান অকর্ণ শুনিতে পান!' কোনো ভয় নেই। মা সর্বতন্ত্রেশ্বরী শ্রীশ্রীভুবনেশ্বরী।
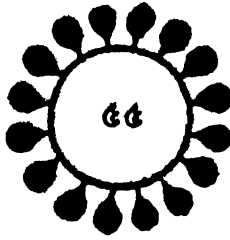
তৃতীয়বার দক্ষিণেশ্বর যাচ্ছে সারদা। যাচ্ছে পদব্রজে।
সঙ্গে ভূষণ মণ্ডলের মা ও আরো ক'জন বর্ষীয়সী মহিলা। আর যাচ্ছে লক্ষ্মী, আর তার ভাই শিবরাম।
কামারপুকুর থেকে আরামবাগ—আট মাইলের ধাক্কা। আরামবাগ পেরিয়েই তেলোভেলোর মাঠ। সে মাঠ পেরিয়ে তারকেশ্বর। তার পরে আবার আরেক

মাঠ—কৈকলার মাঠ। কৈকলার মাঠ পেরিয়ে বৈদ্যবাটি। বৈদ্যবাটি থেকে গঙ্গা পেরিয়ে দক্ষিণেশ্বর।

তেলোভেলো আর কৈকলা এই দুই মাঠে ডাকাতের আস্তানা। আর ঐ মাঠ ছাড়াও পথ নেই। পথচারীদের উপর কখন যে হামলা হবে তা ডাকাতে-কালীই বলতে পারেন। তেলো আর ভেলো, পাশাপাশি দুই গ্রাম, মাঝখানের মাঠে এক ভীমদর্শনা করালবদনা কালীমূর্তি। ঐ ডাকাতে-কালী। দস্যুদের আরাধনীয়া। ধান্যদা ধনদায়িনী। ডাক-নাম তেলোভেলোর ডাকাতে-কালী। ভূতপ্রমথসেবিকা ঘোরচণ্ডী। রণরামা।

শুধু লুণ্ঠন নয়, চক্ষের পলকে খুন করে ফেলা, লাশ লোপাট করে দেওয়া। যাকে বলে গায়েবী খুন। ডাকাতের সে লাঠি বজ্রের চেয়েও নৃশংস। টাকা কড়ি যা আছে খুলে দিচ্ছি ঝুলি ঝেড়ে—এটুকু প্রস্তুত হবারও সময় দেয় না। আগে লাঠি, শেষে লুট। কাড়ো আর মারো নয়, মারো আর কাড়ো। এর থেকে একমাত্র উপায় হচ্ছে দল পাকিয়ে পথ হাঁটা। দল দেখে ডাকাতেরা যদি ভয় পায়। দল থাকলে পথচারীদের অন্তত সাহস বাড়ে।

সন্ধের বেশ আগেই পেঁচেছে আরামবাগ। চলতে-চলতে সারদার পা দুখানি ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। রাতটা আরামবাগে কোথাও বিশ্রাম করলে হয়! কিন্তু সঙ্গীরা নারাজ। তারা বলে, আঁধার লাগবার আগেই বেলাবেলি তেলোভেলোর মাঠ পেরিয়ে যাওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ। এখনো দিব্যি দিন আছে, সহজেই বেরিয়ে যেতে পারব। মিছিমিছি এক রাত নষ্ট করি কেন?

পথক্লান্তির কথা কাউকেও বললে না সারদা। তোমরা যখন চলেছ, আমিও চলি তোমাদের পিছে-পিছে।

কেবলই পিছিয়ে পড়ছে থেকে-থেকে। পা টেনে-টেনে তবু চলে এসেছে চার মাইল। কিন্তু তার সঙ্গীরা কোথায়?

সঙ্গীরা থেমে পড়ছে বারে-বারে। থেমে পড়ছে যাতে পা চালিয়ে এসে সারদা তাদের সঙ্গ ধরতে পারে। কিছুতেই তাড়াতাড়ি চলতে পারছে না মেয়েটা।

'কাঁহাতক তোমার জন্যে এমনি করে দাঁড়াই বলো তো!' বিরক্তি জানায় সঙ্গীরা : 'বেলা ঢলে পড়ল, এখন একটু তাড়াতাড়ি পা চালাও।'

সাধ্যমত পদক্ষেপ দ্রুত করে সারদা। কিন্তু তার সাধ্য কি, সঙ্গীদের সঙ্গে তাল রাখে। আবার সে পিছিয়ে পড়েছে। বিশ-পঁচিশ হাত নয়, প্রায় সিকি মাইল।

'এমনি করে চললে কি করে চলবে?' আবার ধমকে ওঠে সঙ্গীরা : 'তোমার জন্যে কি সবাই শেষকালে ডাকাতের হাতে মারা পড়ব? পশ্চিমের আকাশখানা একবার দেখছ?'

সন্ধ্যার শেষ লালিমাটুকুও মিলিয়ে যায় বুঝি।

সত্যিই তো! তার একলার অক্ষমতার জন্যে সবাই কেন বিপন্ন হবে? ওদের কি দোষ! ওদের দেহে যখন শক্তি আছে তখন ওরা যাবেই তো আগ বাড়িয়ে। নিজের সুবিধের জন্যে ওদের সে অসুবিধে ঘটাবে কেন?

'তোমরা আমার জন্যে আর দাঁড়িয়ো না—চলে যাও সোজাসুজি।' সঙ্গশূন্যতার ভয়ে এতটুকু কাতর নয় সারদা। নেই এতটুকু অসহায়তার সুর। বললে, 'একেবারে তারকেশ্বরের চটিতে গিয়ে উঠো। আমি সেখানে গিয়েই ধরব তোমাদের। আমার শরীর আর বইছে না—আমি যাচ্ছি আস্তে-আস্তে।'

'যত শিগগির পারিস বেরিয়ে আয় তাড়াতাড়ি। চার দিক আঁধার হয়ে এল। মাঠের বড় দুর্নাম—'

পিছনে ফিরে তাকিয়েও দেখল না। সারদাকে ফেলেই দ্রুতবেগে এগিয়ে গেল সঙ্গীরা। মিলিয়ে গেল চোখের বাইরে। জনমনুষ্যহীন বিস্তীর্ণ প্রান্তরে সারদা একা।

শরীরে আর দিচ্ছে না, তবু কষ্টে পা টেনে-টেনে চলেছে। অন্ধকারে পথ-ঘাটের ইশারা পাচ্ছে না। কোথায় যেতে কোথায় চলে আসছে কে জানে।

'কে যায়!' কে-একজন বাঘের গলায় হুমকে উঠল।

প্রকাণ্ড একটা কালো লোক চোখের সামনে দাঁড়িয়ে পড়েছে। দৈত্যের মতন চেহারা। মাথায় ঝাঁকড়া চুল, হাতে রুপোর বালা, কাঁধে মস্ত লাঠি।

'কে যায়!'

'তোমার মেয়ে গো—সারদা।'

নির্জন মাঠের মধ্যে, সন্ধ্যার অন্ধকারে, আমার মেয়ে! লোকটার কানে কেমন যেন অদ্ভুত শোনাল। এত বছর ধরে ডাকাতি করছি, কই, এমন কথা তো কখনো শুনিনি! সারদার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল ডাকাত। স্থির প্রতিমার মতই দাঁড়িয়ে রইল সারদা। প্রতিমার মতই স্থির নেত্রে।

'কে তুমি? এখানে দাঁড়িয়ে আছ কেন?'

'বাবা, দক্ষিণেশ্বরে যাচ্ছিলাম। চলতে পাচ্ছিলাম না, তাই আমার সঙ্গীরা আমাকে ফেলে গিয়েছে। অন্ধকারে পথ হারিয়ে ফেলেছি।'

'দক্ষিণেশ্বরে যাচ্ছ কেন?'

'দক্ষিণেশ্বরে যে তোমার জামাই থাকে। রানি রাসমণির কালীবাড়ি আছে না? সেই কালীবাড়িতে তিনি থাকেন। তাঁর কাছেই আমি যাচ্ছি।'

কেমন যেন মধুময় লাগল কণ্ঠস্বর। বাগদি ডাকাতের বুকের ভিতরটা আনচান করে উঠল। শুধু ডাকাতের নয়, সেই কণ্ঠস্বরের আমেজ এসে লাগল যেন আরো এক জনের কানে। কাছেই কোথায় ছিল, ছুটে এল সে ব্যাকুল পায়ে। সারদা তো অবাক, এ যে দেখি স্ত্রীলোক। দেখেই বুঝল, বাগদি-ডাকাতের স্ত্রী।

তার হাত দুখানা চেপে ধরল সারদা। যেন অকূলে কূল পেল।

'তুমি কে গা?' ডাকাত-পত্নীর চোখে স্নেহকরুণ জিজ্ঞাসা।

'তোমার মেয়ে সারদা। চিনতে পাচ্ছ না? যাচ্ছিলুম দক্ষিণেশ্বরে, তোমার জামাইয়ের কাছে। সঙ্গীরা পিছে ফেলে আগে-আগে পালিয়ে গিয়েছে। ফাঁকা নির্জন মাঠে অন্ধকারের মধ্যে কী বিপদেই পড়েছিলুম, মা! তোমাদের পেয়ে ধড়ে প্রাণ এল। তোমাদের না পেলে কী সর্বনাশ যে হত কে জানে।'

প্রাণ জুড়িয়ে গেল। কঠিন পাথর ফেটে বেরুল সুধা-ধারা। দয়াহীন মরুভূমির আকাশে নম্র মেঘের মাধুর্য।

'মেয়ে আমার নেতিয়ে পড়েছে যে গো। কিছু ওকে খেতে দাও আগে।' ডাকাত-বউ বললে ডাকাতকে।

'না, আমি এগোই। তারকেশ্বরে গিয়ে ধরব আমার সঙ্গীদের।'

অসম্ভব, পথের মাঝেই পড়বে টাল খেয়ে। বাপ হয়ে মেয়েকে কেউ পাঠাতে পারে না এ বিপদের মুখে। এ ঘোর অন্ধকারে, জনশূন্য মাঠের মধ্য দিয়ে। তার শরীরের এই অবসন্ন অবস্থায়। তার চেয়ে চলো, কাছে-পিঠে যে দোকান আছে, সেখানে তোমার থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করি। রাত ফুরুলে খোঁজা যাবে ফের পথের নিশানা। তোমার সঙ্গীদের উদ্দেশ।

তেলোভেলোর ছোট একটি মুদি-দোকান। সেখানেই নিয়ে গেল সারদাকে। নিজের হাতে শয্যা রচনা করল ডাকাত-বউ। ডাকাত নিজে গিয়ে মুড়ি-মুড়কি কিনে আনল। বাপের দেওয়া খাবার তৃপ্তি করে খেল সারদা। মায়ের করা বিছানায় শুলো আরাম করে। ছোট মেয়েকে মা যেমন করে ঘুম পাড়ায় তেমনি করে ডাকাত-বউ ঘুম পাড়াল সারদাকে। আর সারা রাত লাঠি-হাতে দুয়ার আগলে দাঁড়িয়ে রইল ডাকাত-বাবা।

কোথায় সব কিছু লুটপাট করে, চাই কি গুম খুন করে ফেলবে—তা নয়, নিদ্রাহীন দীর্ঘ রাত্রি দুয়ারে দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে!

উপায় কি! এ যে তার মেয়ে। যে মেয়ে সেই আবার মা!

ভোরে ঘুম ভাঙতেই মেয়েকে নিয়ে এগোলো তারকেশ্বরের পথে। ক্ষেতে কড়াই-শুঁটি ফলেছে। তাই ছিঁড়ে-ছিঁড়ে ডাকাত-বউ দিতে লাগল সারদাকে। বললে, 'তোর খিদে পেয়েছে, খা।' মুখ ধোয়া হয়নি, তবু ছোট মেয়ের মত তাই খেতে লাগল সারদা। স্বাদে অপূর্ব মাতৃস্নেহ।

চার দণ্ড বেলা হয়েছে, পৌঁছুল তারকেশ্বর।

'আমার মেয়ে কাল সারা রাত কিছু খায়নি। যাও, শিগগির-শিগগির বাবাকে পুজো দিয়ে বাজার করে নিয়ে এসো। মাছ-তরকারি দিয়ে মেয়েকে ভালো করে খাওয়াতে হবে।' ডাকাত-বউ তাগিদ দিল স্বামীকে।

বাগদি-ডাকাত বাজার করতে ছুটল। তার মেয়ে শ্বশুর-ঘরে যাচ্ছে। যাবার আগে বাপের বাড়িতে আজ তার শেষ খাওয়া।

সঙ্গীদের সন্ধান পেল সারদা। 'ওমা, তুই বেঁচে আছিস? আসতে পেরেছিস পথ চিনে? কোথায় ছিলি তুই সারা রাত?'

বাবা-মা'র কাছে ছিলাম। ছিলাম নির্ভয়ের আশ্রমে, নিশ্চিন্তের ক্রোড়নীড়ে। বাৎসল্য-রসের সরসীতে।

খাওয়া-দাওয়ার পর বিদায়ের পালা এল। যাত্রীদল এবার বৈদ্যবাটির পথ ধরবে।

বাগদি বাপ-মা কাঁদতে লাগল অঝোরে। মেয়ে সারদাও নিজেকে সামলাতে পারল

না। সেও কান্নায় ভেঙে পড়ল। এক রাতের পরিচয়ে এক জন্মের সম্পর্ক। কণ্ঠের একটি মাতৃ-সম্বোধনেই অনন্ত জীবনের বন্ধন।
এমন মেয়ের বিচ্ছেদ সয়ে কি করে বাঁচবে তারা? কাঁদতে-কাঁদতে অনেক দূর পর্যন্ত এগোল বাগদি-বাগদিনী। বাগদিনী কড়াইশুঁটি ছিঁড়ে মেয়ের আঁচলে বেঁধে দিল যত্ন করে। বললে, 'মা সারু, রাতে যখন মুড়ি খাবি, তখন এগুলো দিয়ে খাস।' বলতে-বলতে নিজের আঁচলে চোখ চেপে ধরল।
বাগদি বললে, 'যদি পায়ের বোঝা স্ত্রী না সঙ্গে থাকত, সোজা তোমাকে পেঁাছে দিয়ে আসতাম। দেখে আসতাম জামাইকে।'
'কিন্তু বলো দক্ষিণেশ্বরে তুমি যাবে।' সারদা পীড়াপীড়ি করতে লাগল। রাজী করাল ডাকাত-বাবাকে। মাঝে-মাঝে গিয়ে মেয়েকে না দেখে এসে কি সে থাকতে পারবে? মা কি মেয়েকে পাঠিয়ে দেবে না তার নিজের হাতে গড়া মোয়া-নাড়ু?
পথ ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। ডান দিকের রাস্তায় বাবা আর মা চলে গেল, সারদা আর তার সঙ্গীরা চলল বাঁ দিকে। যত দূর দেখা যায় বাবা আর মা ফিরে-ফিরে তাকায় আর কাঁদে। সারদাও থেকে-থেকে তাকায় পিছন ফিরে আর আঁচলে চোখ মোছে।
ডাকাতের ছদ্মবেশে কে এরা বাগদি-বাগদিনী?
জানিস আমরা কী দেখলুম? গাঁয়ে ফিরে এসে বলতে লাগল বাগদি-দম্পতি। দেখলুম, স্বয়ং কালী এসে দাঁড়িয়েছেন। যে কালীর পুজো করি সেই কালী।
'বলো কি গো? দেখলে? ঠিক তাই দেখলে!'
সত্যি-সত্যিই দেখলুম। কিন্তু বেশিক্ষণ দেখি এমন সাধ্য কি। আমরা যে পাপী। আমরা পাপী বলে যে রূপ গোপন করে ফেললে। সারাক্ষণ দেখতে দিলে না। চকিতে যখন একবার দেখেছ তখন পলকেই পাপ চলে গিয়েছে। চকিতের দেখাই অনন্ত কালের দেখা। যা চকিত তাই চিরকালিক।
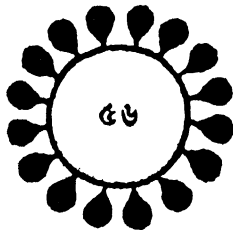
কেশবের ডাকে ইয়ং-বেঙ্গলে সাড়া পড়ে গেল। পল্লব-প্রফুল্ল বসন্তের শিহরণ জাগল অরণ্যে। কিন্তু যার ডাকে এই অবস্থা, তার নিজের অবস্থা কি!
জয়গোপাল সেনের বাগানে রামকৃষ্ণ লালপেড়ে কাপড় পরে গিয়েছিল।

কেশব বললে, 'আজ বড় যে রঙ। লালপাড়ের বাহার!'
রামকৃষ্ণ বললে, 'কেশবের মন ভোলাতে হবে, তাই বাহার দিয়ে এসেছি।'
রঙ লাগল কেশবের মনে। রসে ডুবে ভাসতে লাগল ভাবের জোয়ারে। হয়ে দাঁড়াল সে রামকৃষ্ণের মনের মানুষ।

'মনের মানুষ হয় যে জনা
ও তার নয়নেতে যায় গো চেনা।
সে দু-এক জনা।
ভাবে ভাসে রসে ডোবে
ও তার উজান পথে আনাগোনা।'

কিন্তু গোড়ার দিকে রাজসিকতার ভাবটা একটু সজাগ ছিল কেশবের। কেশবের কলুটোলার বাড়িতে গিয়েছে রামকৃষ্ণ, সঙ্গে হৃদয়। টেবিলের কাছে চেয়ারে বসে কি-সব লিখছে কেশব। যে ঘরে বসে লিখছে সেই ঘরে এনেই বসাল রামকৃষ্ণকে। কিন্তু কেশবের চেয়ার ছেড়ে ওঠবার নাম নেই। একমনে লিখেই চলেছে। অনেক পরে লেখা শেষ করে চেয়ার ছেড়ে নেমে বসল। নেমে বসল বটে, কিন্তু রামকৃষ্ণকে একটা নমস্কার পর্যন্ত করলে না।
নমস্কার না করাটাই বুঝি সে যুগের জ্ঞানী-গুণীদের শালীনতা।
কিন্তু কেশব যখন এসেছে দক্ষিণেশ্বরে, রামকৃষ্ণ তাকে আনত হয়ে প্রণাম করলে। একবার নয়, যতবার এসেছে ততবার। যখন যে দলবল নিয়ে এসেছে, সবাইকে। তখন তারা আর করে কি। ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করতে শিখলে।
কঠিনকে নম্র করে দিলে রামকৃষ্ণ। অভিজাতকে নিরভিমান। রামকৃষ্ণের সমস্ত সাধনাই এই সহজের সাধনা। নিকটের সাধনা। নিকটে পাবার সহজ সাধনা।
বললে, 'যাঁকে তোমরা ব্রহ্ম বলো তাঁকেই আমি মা বলি। মা বড় মধুর নাম।'
আমি ঈশ্বর বুঝি না। আমি আমার মাকে বুঝি, মাকে ডাকি। আর কে আছে না আছে কে জানে, আমি আছি আর আমার মা আছে। ঈশ্বরের ঐশ্বর্যের আমি তত্ত্ব করি আমার সাধ্য কি, আমার মা আছে এই আমার পরম ঐশ্বর্য।
বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ব্রাহ্মসমাজের পদ্ধতি অনুসারে বেদীতে বসে উপাসনা করছে। কিন্তু ঈশ্বরকে ডাকছে 'মা' 'মা' বলে।
'তুমি তাঁকে "মা" "মা" বলে প্রার্থনা করছিলে। এ খুব ভালো। এ খুব ভালো।' বিজয়কৃষ্ণকে বললে রামকৃষ্ণ। 'কথায় বলে বাপের চেয়ে মায়ের টান বেশি। মায়ের উপর জোর চলে, বাপের উপর চলে না। ত্রৈলোক্যের মায়ের জমিদারি থেকে গাড়ি-গাড়ি ধন আসছিল, সঙ্গে কত লাল-পাগড়িওয়ালা লাঠি-হাতে দারোয়ান। ত্রৈলোক্য রাস্তায় লোকজন নিয়ে দাঁড়িয়েছিল, জোর করে সব ধন কেড়ে নিলে। মায়ের ধনের উপর খুব জোর চলে। বলে নাকি ছেলের নামে মা'র তেমন নালিশ চলে না।'

'জানাইব কেমন ছেলে
মোকদ্দমায় দাঁড়াইলে,
যখন গুরুদত্ত দস্তাবেজ
গুজরাইব মিছিলকালে।
মায়ে পোয়ে মোকদ্দমা,
ধুম হবে রামপ্রসাদ বলে।
আমি ক্ষান্ত হব যখন আমায়
শান্ত করে লবে কোলে॥'

মা কতক্ষণ মামলা চালাবে? কতক্ষণ মুখ ভার করে থাকবে? কখন নিজেই এক সময় বাহু মেলে টেনে নেবে কোলের মধ্যে।

আমাদের শাস্ত্রে ঈশ্বরকে আমরা পিতা বলে কল্পনা করেছি। পিতা হচ্ছে সৃষ্টিকর্তা, লালনকর্তা, রক্ষণকর্তা। পিতার মধ্যে যে ভাবটি প্রকাশিত তা প্রতাপের ভাব, প্রভুত্বের ভাব। তিনি শুধু আমাদের পালন করেন না, চালনা করেন, পোষণ করেন না শাসন করেন। তিনি জগৎসংসারের সর্বময় বিধাতা। একচ্ছত্র একাধিপতি।

বেদে বলেছে, পিতা নোঽসি। তুমি আমাদের পিতা হয়ে আছ। বলেছে, পিতা নো বোধি। তুমি যে আমাদের পিতা এই বোধের আলোকে আমাদের দু-চোখ উদ্ভাসিত হোক। এই জানা আর অনুভব করার মধ্যে পিতার সর্বসাম্রাজ্যময় বিরাটত্বকেই কল্পনা করা হয়েছে। যখনই বলেছে, শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ, তখন আমরা যাঁর পুত্র সেই আদিত্যবর্ণ পুরুষকে দিব্যধামবাসী একনায়ক সম্রাট বলেই মেনে নিয়েছি। সমস্ত অন্ধকারের পরপারে সেই পিতা ভাস্বর ভাস্কর।

এ ভাবটির মধ্যে যতই মহিমা থাক, কিছুটা যেন ভয় আছে। সম্ভ্রম তো আছেই, হয়তো বা রয়েছে একটু নিষ্ঠুরতা। পিতা আমাদের যতই প্রিয় হোন, তাঁর সঙ্গে কোথায় যেন রয়েছে একটু ব্যবধান। কোথায় যেন একটু আড়াল বাঁচিয়ে চলছি। যেন তাঁর চোখে চোখ রেখে মুখোমুখি দাঁড়াতে পারি না, একটু পাশ কাটিয়ে পালিয়ে বেড়াই। যদি বা কখনো কাছে আসি সম্ভ্রমসূচক দূরত্ব বজায় রাখি। কখনো যদি অপরাধ করি, তবে তো আর কথাই নেই; ভয় পাই, শাসনে যেন উদ্যতবজ্র হয়ে আছেন।

কিন্তু মা—মা আমাদের কাঙালিনী। আমরা কাঙাল বলে মা-ও কাঙালিনী সেজেছেন। মা'র সঙ্গে আমাদের তন্তুমাত্র ব্যবধান নেই, নেই লেশমাত্র অন্তরাল। আমরা মা'র অঙ্গের অঙ্গ বলে তাঁর সঙ্গে আমাদের অন্তহীন অন্তরঙ্গতা। যতই অকিঞ্চন হই, আমরা মা'র অঞ্চলের নিধি। যতই ধুলো-মাটি মাখি, মা'র অঞ্চলে আমাদের জন্যে অবারিত মার্জনা। যদি অপরাধ করি, মা-ও নিজেকে অপরাধী মনে করেন। সন্তানের দুঃখে তাঁর দুঃখ।

কোনো কুণ্ঠা নেই, লজ্জা নেই, শুধু ক্ষমা শুধু স্নেহ। শুধু পুষ্টি দেন না তুষ্টি দেন, শুধু পিপাসা মেটান না, নিয়ে আসেন পরিতৃপ্তির আস্বাদ। মা আমাদের মূর্তিমতী সরলতা, মা আমাদের অভয়ময়ী। পুত্র যত বৃদ্ধই হোক, মা'র কাছে সে শিশু, অর্বাচীন অপোগণ্ড শিশু। আর মা যত বৃদ্ধই হোক, ছেলের কাছে সে সনাতনী মা। পিতার জন্যে আমাদের শ্রদ্ধা, সম্ভ্রম, আনুগত্য, কিন্তু মা'র জন্যে আমাদের ভালোবাসা, অবিরল অফুরন্ত ভালোবাসা। পিতার থেকে আমরা দূরে-দূরে থাকি, কিন্তু মা আমাদের একেবারে কোলের মধ্যে টেনে নেন। আর্ত হই বঞ্চিত হই পীড়িত হই পাপলিপ্ত হই, অকূলে মা'র কোল আছেই। পিতা আমাদের রাজচক্রবর্তী, মা আমাদের বিশ্বকল্যাণী।

দুর্গাচরণ নাগ ঠাকুরের নিদারুণ ভক্ত। অসুখের সময় আমলকী খাবার ইচ্ছে হয়েছিল ঠাকুরের। এমন সময় আমলকী কি কোথাও পাওয়া যায়? জিগগেস করলেন ঠাকুর। তখন শ্রাবণ মাস, আমলকীর পক্ষে অকাল। কিন্তু ঠাকুরের যখন ইচ্ছে হয়েছে, নিশ্চয়ই কোথাও পাওয়া যাবে আমলকী। দুর্গাচরণ বেরিয়ে পড়ল আমলকী খুঁজতে। বনে-বাগানে ঘুরে-ঘুরে তিন দিন পরে ঠিক আমলকী নিয়ে এল। সেই দুর্গাচরণকে শ্রীশ্রীমা একখানি কাপড় দিয়েছেন। সেই কাপড় না পরে মাথায় বেঁধে রাখে দুর্গাচরণ। আর আনন্দে ধ্বনি করে : 'বাপের চেয়ে মা দয়াল! বাপের চেয়ে মা দয়াল!'

শ্রীশ্রীমার তখন অসুখ। খুব যন্ত্রণা পাচ্ছেন। এক ভক্ত বললে, 'মা, আপনি এত কষ্ট পাচ্ছেন, কষ্টটা আমায় দিন না!'

মা চমকে উঠলেন। 'বল কি! ছেলে! মা কখনো ছেলেকে দিতে পারে? ছেলের কষ্ট হলে যে মা'র আরো বেশি কষ্ট।'

বিভূতি বলে একটি ছেলে আসত শ্রীমা'র কাছে। এলেই পেট ভরে খেয়ে যেত। এক দিন তার খাওয়া দেখে তার মা বললে, 'বিভূতি তো এখানে বেশ খায়। বাড়িতে মাত্র এত ক'টি খায়!'

অমনি শ্রীমা বললেন, 'আমার ছেলেকে তুমি খুঁড়ো না। আমি ভিখারীর রমণী, আমার ছেলেদিকে আমি যা খেতে দি, ছেলেরা আমার তাই আদর করে খায়।'

চন্দ্র দত্ত উদ্বোধন-আফিসের কর্মচারী। এক দিন শ্রীমাকে বললে, 'মা, আপনাকে কত দূর দেশ থেকে কত লোক দর্শন করতে আসে। আপনি তো ঘরের ঠাকুরমার মত পান সাজেন, শুপুরি কাটেন, কখনো বা ঘর ঝাঁট দেন। আপনাকে দেখে আমি তো কিছুই বুঝতে পারি না।'

মা বললেন, 'চন্দ্র, তুমি বেশ আছ। আমাকে তোমার বোঝবার দরকার নেই।'

স্বভাবে সহজ, করুণায় কোমল, স্নেহে সীমাহীন—এই আমাদের মাতৃপ্রতিমা। মাকে আমাদের বোঝবার দরকার নেই, ডাকবার দরকার। ডাক শুনে মা যখন ছুটে এসে কোলে তুলে নেবেন তখন সেই স্পর্শেই বুঝতে পারব, মা এসেছে রে, মা এসেছে।

যিনি অবাঙমানসগোচর, অগম্য অপার, সমস্ত রুদ্ধ অন্ধকারের ওপারে যাঁর

বাসা, তাঁকে নিকটতম, নিবিড়তম করে পাবার সাধনায় রামকৃষ্ণ নতুন মন্ত্র আবিষ্কার করলেন। ওঁ-এর মত এ মন্ত্রও একাক্ষর মন্ত্র। এ মন্ত্রের কথা হচ্ছে—'মা'। এ মন্ত্রের আকর্ষণে যা অত্যন্ত দূর তা নিমেষে কাছে চলে এল, যা অত্যন্ত দুরূহ তা হয়ে দাঁড়াল জলের মত সোজা। যা ছিল পর্বতশৃঙ্গে তাই বিগলিতধারে নেমে এল নির্ঝরিণী হয়ে। যা ঐশ্বর্যশালিনী শক্তি, তাই দেখা দিল দয়ারূপে, ক্ষমারূপে, অমিয়ময়ী প্রশান্তিরূপে।

একেই বলে এক চালে মাৎ। এক বাণে জগজ্জয়। এক অক্ষরে পরা সিদ্ধি।

রামকৃষ্ণের সবই সহজ। তত্ত্ব সহজ, পদ্ধতিও সহজ। মানুষটি যেমন সহজ, মন্ত্রটিও তেমনি। একেই বলে তরঙ্গহীন স্বতঃসিদ্ধ স্বরূপসমুদ্র। কিংবা, সহজ করে বললে, সহজানন্দ।

বিজয়কৃষ্ণকে বলে রামকৃষ্ণ, 'কারণের বোতল এক জন এনেছিল, আমি ছুঁতে গিয়ে আর পারলুম না।'

বিজয় বললে, 'আহা!'

'সহজানন্দ হলে অমনি নেশা হয়ে যায়। মদ খেতে হয় না। মা'র চরণামৃত দেখেই আমার নেশা হয়ে যায়। ঠিক যেমন পাঁচ বোতল মদ খেলে হয়।'

কেশবকেও তেমনি সহজ করে দিল রামকৃষ্ণ। কেশব 'মা' ধরল। ঈশ্বরকে ডাকতে লাগল 'মা' বলে। ঈশ্বরকে 'মা' বলে ডাকে আর কেশবের দুই নয়নে ধারা নামে।
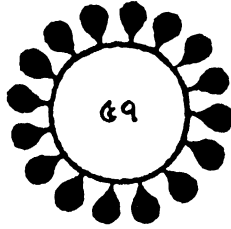
এ মাতৃসাধনার গোড়াপত্তন কমলাকান্তে। তার পর তাতে সৌধ তুলল রামপ্রসাদ।

গরানহাটায় দুর্গাচরণ মিত্তিরের বাড়িতে রামপ্রসাদ মুহুরির কাজ করে আর হিসেবের খাতায় দুর্গানাম কালীনাম লেখে। সমস্ত হিসেব বেহিসেব হয়ে যায়। পদে-পদে ত্রুটির কাঁটা খোঁচা মারে।

নালিশ গেল মনিবের কাছে। মনিব খাতা তলব করলেন। দেখলেন আষ্টেপৃষ্ঠে অঙ্কের আঁচড় নেই, কেবল দুর্গানাম কালীনাম। কেবল মাতৃসঙ্গীত।

কি না-জানি আছে এই গানে! মনিব পড়তে লাগলেন। লোকটার আস্পর্ধা বটে। সামান্য মুহুরি হয়ে তবিলদারি চাইছে!

'আমায় দাও মা তবিলদারি,
আমি নিমকহারাম নই শঙ্করী।
আমি বিনা মাহিনার চাকর,
কেবল চরণ-ধূলার অধিকারী॥'

মনিব ছুটি দিয়ে দিলেন রামপ্রসাদকে, বললেন, 'তুমি বাড়ি যাও। এখানে যেমনি ত্রিশ টাকা মাইনে পেতে তেমনি পাবে তুমি বাড়ি বসে। তুমি মা'র নামের গান গাও।'

ছাড়া পেয়ে গেল রামপ্রসাদ। কিন্তু মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ডেকে পাঠালেন, রাজসভায় চাকরি দেবেন। আবার চাকরি! চরণ-ধূলার জন্যে এই তো দিব্যি চাকর আছি বিনি-মাইনেয়। হলই বা না রাজসভা, মা'র শোভার কাছে আবার রাজসভা কি! মহারাজের অযাচিত দান প্রত্যাখ্যান করলে। এবার না কোপে পড়ে মহারাজার। মহারাজার কি মতি হল, রামপ্রসাদের বৈরাগ্য দেখে একশো বিঘে নিষ্কর জমি দান করে বসলেন।

'মন তুই কাঙালী কিসে।' রামপ্রসাদ গান ধরল : 'অনিত্য ধনের আশে, ভ্রমিতেছ দেশে-দেশে। ও তোর ঘরে চিন্তামণি নিধি, দেখিস রে তুই বসে-বসে।'

মাকে নিয়ে সাধনায় বসল রামপ্রসাদ। কারু সাধনা জ্ঞানে, রামপ্রসাদের গানে। আর-সব সাধকেরা জ্ঞানানন্দ, রামপ্রসাদ গানানন্দ।

মাকে নিয়ে তার নানান খেলা, নানান লুকোচুরি। কত নালিশ-আপত্তি, কত অভিমান-অভিযোগ! কখনো ঝগড়া, কখনো মামলা-মোকদ্দমা, কখনো বা রফা-নিষ্পত্তি। কখনো রাগ, কখনো কান্না, কখনো অহঙ্কার, কখনো স্রেফ গায়ের জোর। সাধ্য নেই মা আর বসে থাকেন লুকিয়ে। কালী বটে, কিন্তু কালা তো নন। ডাকের মত ডাক হলে শুনতে পান ঠিকঠাক। কান্না শুনে না আসেন, আসবেন ধমক খেয়ে। ভালো-মানুষের মত না আসেন, আসবেন ভয়ে-ভয়ে।

'এবার কালী তোমায় খাব।
গণ্ড যোগে জনমিলে,
    সে হয় যে মা-খেকো ছেলে,
এবার তুমি খাও কি আমি খাই
    দুটার একটা করে যাব।
হাতে কালী মুখে কালী
    সর্বাঙ্গে কালী মাখিব,
যখন আসবে শমন বাঁধবে কষে
    সেই কালী তার মুখে দিব॥'

মাকে লজ্জা দিতেও ছাড়ছে না রামপ্রসাদ। বিদ্রূপ করছে। অনুযোগ করছে।

'কে বলে তোরে দয়াময়ী।
কারো দুগ্ধেতে বাতাসা
আর আমার এমনি দশা
শাকে অন্ন মেলে কই॥
কারো দিলে ধন-জন মা,
হস্তী অশ্ব রথচয়।
ওগো তারা কি তোর বাপের ঠাকুর
আমি কি তোর কেহ নই॥'

কিংবা—

'বড়াই করো কিসে গো মা
বড়াই করো কিসে।
আপনি ক্ষ্যাপা পতি ক্ষ্যাপা
থাকো ক্ষ্যাপা সহবাসে।
তোমার আদি মূল সকলি জানি
দাতা তুমি কোন পুরুষে॥
মাগী-মিন্সে ঝগড়া করে
রইতে নার আপন বাসে।
মা গো তোমার ভাতার ভিক্ষা করে
ফেরে কেন দেশে দেশে॥'

আবার বলছে—

'মা হওয়া কি মুখের কথা।
কেবল প্রসব করে হয় না মাতা।
যদি না বুঝে সন্তানের ব্যথা॥
দশ মাস দশ দিন যাতনা পেয়েছেন মাতা
এখন ক্ষুধার বেলায় শুধালে না
এল পুত্র গেল কোথা॥'

শেষকালে অভিমানে ভেঙে পড়ছে রামপ্রসাদ—

'ছিলেম গৃহবাসী, বানালে সন্ন্যাসী,
আর কি ক্ষমতা রাখো এলোকেশী।
দ্বারে দ্বারে যাব ভিক্ষা মাগি খাব
মা মলে কি তার সন্তান বাঁচে না।'

বাস্তুর পাশে ডোবা, ডোবার পাশে বাগান। সেই বাগানে রামপ্রসাদকে দেখা দিলেন অন্নদা। দেখা না দিয়ে আর উপায় কি। এত ভাবে ডাকলে কি করে

আর সরে থাকা যায়? শেষকালে কন্যা হয়ে ঘরের বেড়া বাঁধতে বসলেন। এই মাতৃসাধনা চরম হল রামকৃষ্ণে।
'মা, তুই কমলাকান্তকে দেখা দিয়েছিস, রামপ্রসাদকে দেখা দিয়েছিস, আমায় কেন দেখা দিবি নে?'
এ আকুলতা শুধু মাকে লক্ষ্য করেই জানানো যায়। এ দাবি এ আবদার মা ছাড়া আর কে পূরণ করবে?
দেখা দিবি নে? এই গলায় তবে ছুরি দেব।
কোন মা ঘুমিয়ে থাকবে?
আবার বলছে, 'মা, আমি নরেন্দ্র ভবনাথ রাখাল কিছুই চাই না। কেবল তোমায় চাই। আমি মানুষ নিয়ে কি করব?'
'মা, পূজা উঠিয়েছ, সব বাসনা যেন যায় না। মা, পরমহংস তো বালক—বালকের মা চাই না? তাই তো তুমি মা, আর আমি তোমার ছেলে। মা'র ছেলে মাকে ছেড়ে কেমন করে থাকে?'
সাধ্য কি, এমন ছেলেকে মা কোলে না নেয়!
রাত্রে একলা রাস্তায় কেঁদে-কেঁদে বেড়ায় রামকৃষ্ণ। আর বলে, 'মা, বিচার-বুদ্ধিতে বজ্রাঘাত দাও।'
বিচার-বিতর্ক ভেসে গেল। রইল শুধু ভক্তি আর ভালোবাসা। মাকে ভালোবাসতে পারলে আর ভাবনা নেই। আর, ভালোই যদি বাসবি, মা'র মতন আর কে আছে ভালোবাসবার?
কার্তিক-গণেশকে বললেন ভগবতী, যে আগে ব্রহ্মাণ্ড প্রদক্ষিণ করে আসতে পারবে তাকে গলার এই রত্নহার দেব। কার্তিক তখুনি ময়ূরে চড়ে বেরিয়ে পড়ল। গণেশ শুধু মাকে একবার প্রদক্ষিণ করে প্রণাম করলে। মা'র মধ্যেই তো ব্রহ্মাণ্ড। প্রসন্ন হয়ে গণেশকেই হার দিলেন ভগবতী। অনেক পরে ঘুরে এসে কার্তিকের তো চক্ষুস্থির। দাদা দিব্যি হার পরে বসে আছেন।
'মা, আমি বলবো তবে তুমি করবে—এ কথাই নয়। আচ্ছা মা, যদি না-বলতাম, আমি খাবো, তা হলে কি যেমন খিদে তেমন খিদে থাকত না? তোমাকে বললেই তুমি শুনবে, আর ভিতরটা শুধু ব্যাকুল হলে তুমি শুনবে না—এ কখনো হতে পারে? তুমি যা আছ তাই আছ—তবে বলি কেন, প্রার্থনা করি কেন? ও! যেমন করাও তেমনি করি।'
এই সরলতা এই ব্যাকুলতা এই আন্তরিকতার কাছে মা কি ধরা না দিয়ে পারেন?
মা-তে ওতপ্রোত হয়ে আছে রামকৃষ্ণ। মা ছাড়া আর কিছু নেই জীবজগতে। মা-ই আমাদের একমাত্র মাধুরী। যিনি মানসী তিনিই আবার মানুষী।
তাই যতক্ষণ গর্ভধারিণী মা আছেন ততদিন তাঁতেই জগজ্জননী আরোপ করতে হবে।
'আমি মাকে ফুলচন্দন দিয়ে পূজা করতাম।' বললে রামকৃষ্ণ, 'সেই জগতের মা-ই মা হয়ে এসেছেন!'

কিন্তু যখন মা থাকবে না, কিংবা পূজা থাকবে না, তখন? তখন অন্য কথা। তখন মা'র মনোমূর্তি। তখন বিশ্বব্যাপিনী জগন্মাতা।

'মা, পূজা গেল, জপ গেল, দেখো মা যেন জড় কোরো না। সেব্য-সেবকভাবে রেখো। মা, যেন কথা কইতে পারি, যেন তোমার নাম করতে পারি—আর তোমার নামগুণ কীর্তন করব, গান করব মা। আর শরীরে একটু বল দাও, যেন আপনি একটু চলতে পারি। যেখানে তোমার কথা হচ্ছে, যেখানে তোমার ভক্তরা আছে, সেই সব জায়গায় যেতে পারি।'

শুধু গান নয়, নৃত্য করছে রামকৃষ্ণ। আমাদের নিত্যানন্দ ঠাকুর এখন নৃত্যানন্দ।

মাকে কখনো আদর করছে, শাসন করছে কখনো। কখনো বিলাপ করছে, কখনো বা মুখ ভার করে থাকছে। কখনো মিনতি করছে, কখনো বা জোর ফলাচ্ছে। কখনো বা রঙ্গরসের তরঙ্গ তুলছে।

'কে মা এলি গো গিরে দাদার বেটি।
দোনো ছোকরা বি সাৎ
দোনো ছুকরি বি সাৎ
আর এক বেটা জুলপি-কাটা
বাঘটা কামড়ে নেছে টুঁটি॥
একবার নেমে দাঁড়া শ্যামা
ভাঙল বুড়োর পাঁজর-কটি।
শিব মলে অনাথ হবে
কার্তিক গণেশ ছেলে দুটি॥'

গালে হাত দিয়ে অবাকের ভাব করে নাচছে রামকৃষ্ণ।

'আই মা কি লাজের কথা
মিনসের উপরে মাগী।
বেটির পদতলে পড়ে ভোলা
অপরূপ এক যোগী॥
নয়নে না দেখ চেয়ে
শিব আছেন শব হয়ে
আবার কে দেখেছে এমন মেয়ে
কুল-লজ্জা-ভয়-ত্যাগী॥'

আবার অন্য রকম তাল ধরছে :

'কোন হিসেবে হরহৃদে
দাঁড়িয়েছ মা পদ দিয়ে।

সাধ করে জিব বাড়ায়েছ
যেন কত ন্যাকা মেয়ে॥
বল মা তোরে শুধাই তারা
এমনি কি তোর কাজের ধারা
তোর মা কি তোর বাপের বুকে
দাঁড়িয়েছিল অমনি করে?'

'রসো বৈ সঃ যে তিনি। নানা ভাবে তাঁর রস আস্বাদ করতে হবে, তবে তো হবে।' বললেন রামকৃষ্ণ। 'নইলে কেশবদের মত খালি দয়াময়, প্রভু বললে কি রস হয়?'

রামকৃষ্ণে যেমন সর্বধর্মসমন্বয় তেমনি সর্বরসসমাশ্রয়।

মা-ও রামকৃষ্ণকে দেখা দিলেন নানান ভাবে। নানান রস-বেশে।

এক দিন মুসলমানের মেয়ে হয়ে চলে এলেন। ছ-সাত বছরের মেয়ে। মাথায় তিলক কিন্তু দিগম্বরী। রামকৃষ্ণের সঙ্গে বেড়াতে লাগল আর ফিচকেমি করতে লাগল। একবার চোখ নাচাল, অমনি নীল আকাশে গ্রহ-তারা সব দুলে উঠল একসঙ্গে।

কালো পেড়ে কাপড় পরনে শ্রীগৌরাঙ্গ হয়ে এক দিন দেখা দিলেন হৃদয়ের বাড়িতে।

তার পর, হলধারী যখন যন্ত্রণা দিচ্ছে আর বলছে রূপ-টুপ কিছু নেই, তখন এক দিন মা'র কাছে গিয়ে নালিশ করলে রামকৃষ্ণ। মা রতির মা'র বেশে দেখা দিলেন। বললেন, তুই ভাবেই থাক।

'এক-একবার ও-কথা ভুলে যাই বলে কষ্ট হয়। ভাবে না থেকে দাঁত ভেঙে গেল। তাই দৈববাণী যতক্ষণ না শুনছি বা প্রত্যক্ষ যতক্ষণ না হচ্ছে ভাবেই ডুবে থাকব, থাকব ভক্তি নিয়ে।'

সেই সহজ কথাই কেশবকে শেখাতে বসল।

'দুধ কেমন? না, ধোবো-ধোবো। দুধকে ছেড়ে দুধের ধবলত্ব ভাবা যায় না। আবার দুধের ধবলত্ব ছেড়ে দুধকে ভাবা যায় না। তাই ব্রহ্মকে ছেড়ে শক্তিকে, শক্তিকে ছেড়ে ব্রহ্মকে ভাবা যায় না। যিনি নিত্য তিনিই ব্রহ্ম, যিনি লীলা তিনিই কালী। কালীই ব্রহ্ম, ব্রহ্মই কালী।'

কালীতত্ত্ব জানবার জন্যে ধরে বসল কেশব। কালী অত কালো কেন?

'কালী কি কালো? দূরে, তাই কালো, জানতে পারলে কালো নয়।' বললে রামকৃষ্ণ। 'আকাশ দূর থেকে নীলবর্ণ। কাছে গিয়ে দেখ, কোনো রঙ নেই। সমুদ্রের জল দূর থেকে নীল, কাছে গিয়ে হাতে তুলে দেখ, কোনো রঙ নেই।'

ভাবে বিহ্বল হয়ে গান ধরল রামকৃষ্ণ।

'মা কি আমার কালো রে? কালরূপ দিগম্বরী, হৃৎপদ্ম করে আলো রে।'

মা'র একান্ত কাছটিতে সরে এসেছে রামকৃষ্ণ। কাছে এসে আলোয় আলোময়

দেখছে। সরে আসতে-আসতে নিজেই মা-তে মিশে মা হয়ে গিয়েছে। 'শ্যামা পুরুষ না প্রকৃতি? এক জন ভক্ত পুজো করছিল। এক জন দর্শন করতে এসে দেখে মূর্তির গলায় পৈতে। তুমি মা'র গলায় পৈতে পরিয়েছ? দর্শক আপত্তি করলে। ভক্ত বললে, ভাই, তুমিই চিনেছ। আমি এখনো চিনতে পারিনি, তিনি পুরুষ কি প্রকৃতি। তাই পৈতে পরিয়েছি।'

তাকেই তো বলে যোগমায়া, অর্থাৎ পুরুষপ্রকৃতির যোগ। পুরুষ নিষ্ক্রিয় তাই শিব শব হয়ে আছেন। আর, পুরুষের যোগে প্রকৃতি সমস্ত কাজ করছে, হনন-পালন করছে। এক ছাড়া আর নেই। যা পুরুষ তাই প্রকৃতি। যা বিদ্যুৎ তাই বৈদ্যুত শক্তি। রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তিরও মানে ঐ। ঐ যোগের জন্যেই তো বঙ্কিম ভাব।

মনোমোহন মিত্তিরের বোনকে বিয়ে করেছে রাখাল। রাখালের বয়েস তখন আঠারো। বিয়ের পর ভগ্নীপতিকে নিয়ে দক্ষিণেশ্বরে এসেছে মনোমোহন।

এ কে? রাখালকে দেখে রামকৃষ্ণ তো অবাক।

ভাবমুখে থেকে মাকে এক দিন বলেছিল রামকৃষ্ণ, 'মা গো, বিষয়ী-সংসারী লোকের সঙ্গে কথা বলতে-বলতে জিভ জ্বলে গেল।'

মা বললেন, 'ভয় নেই। শুদ্ধসত্ত্ব ত্যাগী ভক্তেরা আসছে একে-একে।'

'এক জনকে সঙ্গী করে দাও আমার মত। আমার তো সন্তান হবে না, কিন্তু মা, ইচ্ছা করে, একটি শুদ্ধভক্ত ছেলে আমার সঙ্গে থাকে। সেইরূপ একটি ছেলে আমায় দাও।'

এর কিছু দিন পরে ভাবচক্ষে রামকৃষ্ণ দেখতে পেল, বটতলায় একটি ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। কেন, ও ওখানে কেন? এ কি কাণ্ড?

হৃদয়কে বললে সেই দর্শনের কথা। হৃদয় আনন্দ করে উঠল। বললে, 'মামা, নিশ্চয়ই তোমার ছেলে হবে। তাই দেখেছ।'

'সে কি রে?' চমকে উঠল রামকৃষ্ণ। 'সে কি রে? আমার যে মাতৃযোনি। আমার ছেলে হবে কেমন করে?'

রামকৃষ্ণ এক দিন বসে আছে নিরালায়, হঠাৎ মা এসে তার কোলের মধ্যে একটি ছেলে ফেলে দিয়ে গেলেন। বললেন, 'ছেলে চেয়েছিলে না? এই তোমার ছেলে।'

সে কি? আমার আবার ছেলে কি?

মা বুঝিয়ে দিলেন, শরীরের পুত্র নয়, মানস পুত্র।

রাখালের দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইল রামকৃষ্ণ। এ যে সেই ছেলে!

'তোমার নামটি কি?' তৃষিত কর্ণে জিগগেস করলে রামকৃষ্ণ।

'শ্রীরাখালচন্দ্র ঘোষ।'

সমস্ত হৃদয় দুলে উঠল। সমস্ত সৃষ্টি ভরে গেল বাঁশির সুরে। নীল যমুনার জলে। 'সেই নাম! রাখাল, ব্রজের রাখাল!' ভাবে ডুবে গেল রামকৃষ্ণ। আর কোনো কথা নেই। আর শুধু একটি মাত্র স্নেহস্বর: 'এখানে আবার এক দিন এস। আবার এক দিন।'

আর রাখাল কী দেখল? এ কে? দিব্যদীপ্ত অঙ্গে নিয়ে এ কে বসে আছে তার চোখের সামনে? রাখাল দেখল মা বসে আছে। মা, তার মা। জীবজগতের মা। তার পর আরো ক'দিন পর কলেজের ছুটির শেষে এক দিন একা-একা চলে এসেছে রাখাল।

'তোর এখানে আসতে এত দেরি হল কেন?' আকুল হয়ে ডাকলে রামকৃষ্ণ : 'আয় আয়, তুই আমার রাখাল, তুই আমার গোপাল, তুই আমার কৃষ্ণ।'

রাখালের মনে হল সে যেন তিন-চার বছরের ছেলে। আর তার সামনে বিশ্রামশান্ত কোল পেতে তার মা বসে আছেন। মা কালী, মহাকালী। শ্যামশ্রীতে স্নেহশ্রী। রামকৃষ্ণের কোলের মধ্যে গিয়ে বসে পড়ল রাখাল। রামকৃষ্ণ সস্নেহে হাত বুলুতে লাগল সর্বাঙ্গে। আর রাখাল নিঃসঙ্কোচে রামকৃষ্ণের স্তনপান করতে লাগল। রামকৃষ্ণই মা। রামকৃষ্ণই মাতৃসাধনার চরম।

তাই তো মা বলে ডাকি। মা বলে যখন ডাকি তখন তোমাকেই ডাকি। আমরা কি কালী চিনি না দুর্গা চিনি? আমরা শুধু তোমাকে চিনি। আমরা মা বলে ডাকলে আর কেউ সাড়া না দিক, তুমি দেবে। তোমার ডাক, তুমিই তো ভালো চেন। তুমিই তো সংসারের কানে দিয়ে গেছ এই ডাক। এই সংক্ষিপ্ত একাক্ষর মন্ত্র। তাই তোমার সাধ্য কি, তুমি থাকো নিশ্চল হয়ে।

তার পর এক দিন নিজের ডাকে যদি নিজে সাড়া দাও, প্রভু, তবে আর আমাদের কালীই বা কি, ব্রহ্মই বা কি।
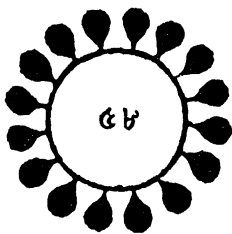
বিজয়কৃষ্ণকে লিখে পাঠাল কেশব সেন : বন্ধু, একবার রামকৃষ্ণ পরমহংসকে দেখবে এস।

বন্ধু? তা ছাড়া আবার কি। হোক দলাদলি, হোক রেষারেষি, হোক বাদ-বিতণ্ডা, তারা সতীর্থ। তারা এক তীর্থের যাত্রী। যারা সমানতীর্থসেবী তারাই সতীর্থ। তারা এক গুরুর ছাত্র। এক পাঠশালার পড়ুয়া। তাদের দুজনের একই ঈশ্বর-সন্ধান।

তখন তাদের ঝগড়া চরমে উঠেছে। তবু লিখে পাঠাল কেশব : বন্ধু, এমনটি তুমি আর দেখনি।

শান্তিপুরে প্রভু অদ্বৈতাচার্যের বংশে বিজয়কৃষ্ণের জন্ম। বাপের নাম আনন্দকিশোর গোস্বামী। নিত্যপূজার শালগ্রাম শিলা গলায় বেঁধে এক দিন হঠাৎ পুরীর দিকে যাত্রা করলেন আনন্দকিশোর। বাসনা জগন্নাথ দর্শন। যাত্রা করলেন পায়ে হেঁটে নয়, বুকে হেঁটে। গণ্ডি কেটে-কেটে। পুরী পৌঁছুতে এক বছর লাগল। মাটির ঘষায় বুকে-পায়ে ঘা হয়ে গেছে তবু হটছেন না আনন্দকিশোর। ঘায়ের উপর ন্যাকড়া জড়িয়ে নিয়েছেন।

ভক্তের যদি ন্যাকড়াও না জোটে, তবু ভক্ত ন্যাকড়ার আগুন।

জগন্নাথ স্বপ্ন দিলেন। 'তুই বাড়ি যা, আমি পুত্র হয়ে তোর ঘরে আসব।'

পুত্র? দু-দুবার বিয়ে করেছিলেন আনন্দকিশোর, দুই স্ত্রীই গত হয়েছেন নিঃসন্তান অবস্থায়। প্রায় পঞ্চাশ বছর বয়স হল, এখন আর তবে পুত্র কি! কিন্তু স্বপ্নবাক্য কি নিষ্ফল হবে?

তৃতীয় বার বিয়ে করলেন আনন্দকিশোর। বিয়ে করলেন নদীয়া জেলার গৌরী জোদ্দারের মেয়ে স্বর্ণময়ীকে।

সেদিন ঝুলন-পূর্ণিমার রাত। পূর্ণিমার চন্দ্র, কিন্তু সবাই বলে কৃষ্ণচন্দ্র।

কিন্তু গৌরীপ্রসাদের ঘরে সেদিন বিপদ উপস্থিত। পরের দুঃখে মন কাঁদে, কোন এক দেনদারের জামিন হয়েছিলেন গৌরীপ্রসাদ। সেই দেনদার হঠাৎ ফেরার হয়েছে। তাই জামিনদারের বিরুদ্ধে ক্রোকী পরোয়ানা বেরিয়েছে আদালত থেকে। অস্থাবর ধরবার পরোয়ানা, আদালতের পেয়াদা চড়াও হয়েছে বাড়িতে।

সে সব দিনে আদালতের পেয়াদা মানে কৃতান্তের অনুচর। বাড়ির মেয়েরা পেয়াদা দেখে যে যেদিকে পারল ছুটে পালাল। স্বর্ণময়ী পালাল বাড়ির পিছনে পিটুলি গাছের নিচে ঘন কচুবনের মধ্যে।

স্বর্ণময়ী আসন্নপ্রসবা।

ক্রোকের হাঙ্গামা চুকে গেল, বাড়ির মেয়েরা সব একে-একে ফিরল বাড়িতে। কিন্তু স্বর্ণময়ী কোথায়? স্বর্ণময়ী কোথায় গেল?

খুঁজতে-খুঁজতে পেল তাকে কচুবনে। এ কি! তার কোলে প্রসন্নহাস হিরণ্ময়বপু শিশু।

বিপদ কোথায়! বিপদের দিনে বিপদভঞ্জন। বিপন্নপালক।

এই শিশুই বিজয়কৃষ্ণ।

নিম গাছের নিচে জন্মেছিলেন শ্রীচৈতন্য। পিটুলি গাছের নিচে জন্মালেন বিজয়কৃষ্ণ।

আর আমাদের প্রভু রামকৃষ্ণ জন্মালেন ঢেঁকিশালে। জন্মেই উনুনের ছাই মেখে বিভূতিভূষণ হলেন।

রামকৃষ্ণের রঘুবীর, বিজয়কৃষ্ণের শ্যামসুন্দর।

ভোর বেলা, মন্দিরের দরজা বন্ধ। পূজারী এসে দরজা খুলবে।

শিশু বিজয়কৃষ্ণ সেই দরজা ঠেলছে প্রাণপণে। কাঠের রঙিন বল্ নিয়ে সে খেলছিল, সে-বল্ সে খুঁজে পাচ্ছে না। খুঁজে পাচ্ছিস্ না তো এখানে কি!

'এই শ্যামসুন্দরই আমার বল্ নিয়ে পালিয়ে এসেছে। ও-ও যে খেলছিল আমার সঙ্গে।'

কে শোনে কার কথা! দরজা যখন খুলতে পারছে না গায়ের জোরে, তখন কাকুতি-মিনতি করছে। দাও না আমার বল্। কেন বসে আছ দোর এঁটে? বাইরে বেরিয়ে এস না।

দাঁড়াও। কতক্ষণ বন্ধ হয়ে থাকবে? শিশু বিজয়কৃষ্ণ এক লাঠি নিয়ে এসেছে। পুজুরী এসে দরজা খুললেই দেখে নেব তোমাকে। কে তখন তোমাকে বাঁচায় দেখব।

দরজা খোলা হলেও মন্দিরে তাকে ঢুকতে দেওয়া হল না। তার যে এখনো পৈতে হয়নি।

সারা দিন উপোস করে রইল বিজয়। মা এসে কত সাধ্যসাধনা করলেন, নরম হল না এতটুকু। শ্যামসুন্দরের উপর প্রতিশোধ না নিয়ে অন্নজল গ্রহণ করবে না সে।

মা ঘরে ভাত রেখে শুয়ে পড়লেন। খিদের কাছেও যে হার মানে না সে কেমনতরো ছেলে!

মাঝ রাতে ঘুম ভেঙে গেল স্বর্ণময়ীর। বিজয় যেন কথা কইছে কার সঙ্গে।

'যাক, ঘাট মানলে। তাই ছেড়ে দিলাম। নইলে দেখাতাম একবার মজা।'

গলার সুর বদলাল বিজয়।

'আমি না হয় তোমার উপর রাগ করে খাইনি। কিন্তু তাই বলে তুমি কেন খেলে না?'

স্বর্ণময়ী তো বাক্যহীন।

'বেশ, বেশ, দুজনে একসঙ্গে খাই এস।'

ঢাকা তুলে ভাত খেতে লাগল বিজয়। তার সঙ্গে আরো এক জন কে খাচ্ছে।

শিকারপুরের পাঠশালায় ভর্তি হয়েছে বিজয়। ভীষণ কলেরা লেগেছে শান্তিপুরে। চক্ষের পলকে বহু লোক নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। তার মধ্যে অনেকগুলো বিজয়ের সমপাঠী।

বিজয়ের বেদনার চেয়ে বিস্ময় বেশি। যে মাদুরে তারা বসত সে মাদুর আছে, যে বই তারা পড়ত সেই বই আছে, যে জিনিস নিয়ে খেলাধুলো করত সেই জিনিসগুলো আছে। অথচ তারা নেই। এ কখনো হতে পারে? ঐটুকু শিশু মহা সমস্যায় পড়ে গেল। যা একবার থাকে তা কি আবার না-থাকে? যা একবার হয় তা কি আবার না-হয়?

চিন্তায় হাবুডুবু খাচ্ছে শিশু। কে তাকে মীমাংসা করে দেবে? কে তার সেই গুরুমশাই?

এক দিন ভারি মন নিয়ে চলেছে পাঠশালায়। হঠাৎ তার সেই মৃত সমপাঠীরা দর্শন দিলে তাকে, দিনের আলোয়, পথের মধ্যে। বলে উঠল সমস্বরে: 'বিজয়, আমরা আছি। আমরা আছি।'

আমরা আছি? আমরা যদি আছি, তবে নিশ্চয়ই তিনিও আছেন।
পাঠশালায় চলে এল একছুটে। পাঠশালার গুরু ভগবান সরকার, তাঁকে বললে সব বিজয়। ভূতের গল্প বলে হেসে উড়িয়ে দিলেন গুরুমশাই। বিজয় জেদ ধরল, আপনি একবার চলুন আমার সঙ্গে। সেই ঝোপের পাশে, পথের উপর। নেইআঁকড়ার পাল্লায় পড়েছেন গুরুমশাই। শেষে তিনি শক্ত হয়ে বললেন, 'ঠিক বলছিস? তাদের কথা তুই শোনাতে পারবি?'
'নিশ্চয়ই পারব।'
সেই চেনা জায়গায় নিয়ে এল গুরুমশাইকে। কিন্তু কোথায় সেই ছেলের দল? কোথায় তাদের সেই কচি গলার কলস্বর?
ওরে তোরা কোথায়? তোরা কথা ক। আমরা শুধু আমাদের কথা কইছি। তোরা তোদের কথা ক। তোদের কথাই তাঁর কথা।
চার দিকে শুধু মৌনময় মুখরতা। এ কি গুরুমশাইদের কানে ঢোকে? তারা ইন্দ্রিয়ের প্রমাণ চায়। বলে, দেখাতে পারো? শোনাতে পারো?
'যত সব ফাজলামো—' ভগবান সরকার মারতে উঠলেন বিজয়কে।
হঠাৎ একসঙ্গে কতগুলি ছেলে কলধ্বনি করে উঠল: 'গুরুমশাই, মারবেন না বিজয়কে।'
উদ্যত হাত অসাড় হয়ে গেল। ব্যাকুল চোখে চার দিকে তাকাতে লাগলেন ভগবান সরকার।
'এই যে আমরা। এইখানে, এইখানে। সবখানে—'
বিজয়কে বুকে জড়িয়ে ধরলেন ভগবান সরকার। কে কার গুরু? যে দেখায় আর শোনায় সেই তো আচার্য।
সেই তো দ্রষ্টা, স্রষ্টা, শ্রোতা, ঘ্রাতা, রসয়িতা।
পুরন্দর পুজারী মরে ব্রহ্মদৈত্য হয়েছে। থাকে গাছের উপর। আগে শ্যামসুন্দরের পুজারী ছিল। পুজো করত আর জিনিস সরাত। ভোগ-নৈবেদ্য শুধু নয়, আরো কিছু মোটা জিনিস। তারই পাপে এই গতি।
কিন্তু বিজয়ের উপর ভারি টান। তার সর্বত্র অপদে গতায়াত, তাই আপদে-বিপদে সব সময়ে সে বিজয়কে রক্ষা করে। থাকে তার সঙ্গে-সঙ্গে। কখনো দেখা দেয় কখনো বা দেয় না।
যাত্রা শুনতে-শুনতে ঘুমিয়ে পড়েছে বিজয়। আসর ভেঙে গিয়েছে। যে যার মনে কখন ফিরে গিয়েছে বাড়ি-ঘর। ফরাসের একধারে বিজয় শুধু একা ঘুমিয়ে। ঘুম ভেঙে চোখ চেয়ে তো তার চক্ষুস্থির। রাত ঝাঁ-ঝাঁ করছে, সঙ্গী-সাথী নেই কেউ ধারে-কাছে, এখন সে বাড়ি ফেরে কি করে?
খড়মের শব্দ শোনা গেল চটপট। হাতে লণ্ঠন আর লাঠি, কে এক জন কাছে এসে দাঁড়াল। বললে, 'চল্, পেঁছে দিয়ে আসি।'
এমনি আরো কয়েক বার সে পেঁছে দিয়ে এসেছে। বিপদে বা বিপথে পড়লেই লাঠি হাতে পুরন্দর এসে দেখা দেয়।

'ঐ লোকটা কে রে?' এক দিন জিগগেস করলেন স্বর্ণময়ী।
'কোন লোক?'
'যে তোকে বাড়ি পেঁছে দিয়ে যায়?'
'বা, আমি তো জানি তুমিই পাঠিয়ে দাও ওকে। আমাকে ডেকে নিয়ে আসবার জন্যে বুঝি লোক রেখেছ। তবে—'
'শোন, ওর সঙ্গ করবি নে। ও ব্রহ্মদত্যি।'
হোক ব্রহ্মদৈত্য। দৈত্য থেকেই ক্রমে এক দিন ব্রহ্মে নিয়ে পেঁছুব।
বিজয় না চাইলে কি হবে, পুরন্দর তাকে ছাড়ে না। বলে, আমি যতদিন আছি, ততদিন তোকে আগলে যাব।
'কিন্তু মা বলেছে, গয়ায় যদি তোমার পিণ্ড দিই?'
ব্যস্, তা হলেই বন্ধন মুক্তি। তাহলেই ঊর্ধ্বযাত্রা। ক্রমোন্নয়ন।
'কিন্তু, দেখো, তোমরা যেন গয়ায় মরে ভূত হয়ো না।' হেসে উঠল পুরন্দর।
সেদিন গান শুনে বাড়ি ফিরতে বেজায় দেরি হয়ে গিয়েছে।
পুরন্দর বললে, 'এই পোড়ো বাড়ির আঙিনার ভেতর দিয়ে গেলে তাড়াতাড়ি যাওয়া যাবে। গাছে বাঁদর আছে, ডালপালায় ঝুপঝাপ করলে ভয় পেয়ো না।'
অমনি গাছের উপর থেকে কে একজন বলে উঠল ব্যঙ্গ করে: 'বেশ বলেছ যা হোক। গাছে যখন আছি তখন বাঁদর ছাড়া আর কি। কিন্তু ছেলেটার কাছে আসল কথাটা ফাঁস করে দেব না কি?'
তার মানে ছেলেটাকে ভয় দেখাবে। পুরন্দর তেড়ে এল। বললে, 'ঐ যে বলেছে মরলেও স্বভাব যায় না তোদের হয়েছে তাই—'
ঝগড়া বাধে দেখে বৃক্ষস্থ আরেক জন মধ্যস্থতা করতে এল। গম্ভীর গলায় বললে, 'পরলোক দেখ! পরলোক দেখ!'
শুধু পরলোক নয়, পরম লোককে দেখব। যা প্রেত ও প্রস্থিত তাই এক দিন মহা-স্থিতের কাছে পেঁছে দেবে। সেই তো আদি বাড়ি। সেখানেই তো আসল উপনয়ন।
ন বছর বয়সে উপনয়ন হল বিজয়ের। টোলে গিয়ে ঢুকল। এক বছরে মুগ্ধবোধ মুখস্ত করে ফেললে। তার পর নিয়ে পড়ল সাংখ্য আর বেদান্তদর্শন।
কিন্তু যতই পড়ো আর লড়ো, তার মুখে শুধু এক বুলি। সে বুলির নাম 'হরিবোল'। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী হরি-ভোলা সংসারে বাস করে না, বাস করে হরি-বোলা সংসারে।
দক্ষিণেশ্বরে যখন আসে তখনই মুখে ধ্বনি করে: 'হে শ্রীহরি—'
এই শ্রীহরি ডাকটিই পর-পর তিন বার তিন রকম সুরে সে উচ্চারণ করে। এমন করুণ এমন আর্দ্র সেই স্বর যে তপ্ত চিত্ত শীতল হয়, তৃষিত চিত্ত তৃপ্তিতে ভরে ওঠে। মনে হয় সর্বতীর্থময় হরি যেন বাস করছেন এই দক্ষিণেশ্বর তীর্থে।
নামাগ্নিতে দগ্ধীভূত হয়ে যাচ্ছে—বিজয়কৃষ্ণকে চিনতে পারল রামকৃষ্ণ।
বিধৌত হয়ে যাচ্ছে পরমপাবনী ভক্তিতে। এসেছে সেই ক্ষমা, বৈরাগ্য আর মান-

শূন্যতা। সেই আশাবন্ধসমুৎকণ্ঠা, ভগবানকে পাবার জন্যে বেগবতী আশা আর না পাওয়ার জন্যে ঐকান্তিকী কাতরতা। সেই নামগানে সদারুচি। আসক্তিস্তৎ-গুণাখ্যানে, প্রীতিস্তৎবসতিস্থলে। বিজয়ের সর্বাঙ্গে সেই ভাবকদম্ব পরিস্ফুট। ঠাকুরের তখন হাত ভেঙে গেছে, খুব কষ্ট পাচ্ছেন।
একজন ব্রাহ্ম ভক্ত বললে, 'আপনি তো জীবন্মুক্ত, এই কষ্টটুকু ভুলতে পাচ্ছেন না?'
ঠাকুর বললেন, 'তোদের সঙ্গে কথা বলে ভুলব? তোদের বিজয়কে আন। তাকে দেখলে আমি আপনাকে ভুলে যাই।'
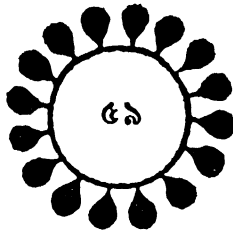
কলকাতায় এসে সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হল বিজয়কৃষ্ণ। রামচন্দ্র ভাদুড়ীর মেয়ে যোগমায়াকে বিয়ে করলে। বিজয়ের বয়স আঠারো আর যোগমায়ার ছয়।
বিজয়ের দুই বন্ধু রামময় আর কৃষ্ণময় খৃষ্টান হয়ে গেল।
বিরক্তিতে বিভ্রান্ত হল না বিজয়, বেদনায় ভাবতে বসল। হিন্দুধর্মের অনুষ্ঠানে তুলসী-বিল্বপত্রের সঙ্গে অনেক আগাছা এসে ভিড়েছে। তাই লোকে আস্থা হারাচ্ছে। রাস্তা হারাচ্ছে। উন্মার্গগামী হচ্ছে।
এখন উপায় কি।
রংপুরে শিষ্যবাড়ি গিয়েছিল, শিষ্য মন্ত্র আওড়ে পা-পুজো করলে। বললে, তুমি জ্ঞানবর্তিকা জেবলে অজ্ঞানের চক্ষুরুন্মীলন করেছ, তোমাকে প্রণাম।
ছাই করেছি। কিছু করিনি। আমার নিজের চোখ কে খুলে দেয় তার ঠিক নেই, আমি গেছি পরের চোখ খুলতে। একেই বলে গয়ায় মরে ভূত হওয়া। করব না আর কপটাচরণ।
যজমানগিরি ছেড়ে দিয়ে স্বাধীন ভাবে খেটে খাব কলকাতায়। পড়ব মেডিকেল কলেজে।
রংপুর থেকে বগুড়ায় এল বিজয়কৃষ্ণ। বগুড়ায় তিন জন ব্রাহ্মভক্তের সঙ্গে দেখা হল। এরা তো চমৎকার। যেমন শুনেছিলাম তেমন তো নয়। মদও খায় না, স্বেচ্ছাচারও করে না। শুধু ঈশ্বরের কথা কয়। সেই তো 'অমৃতস্য পরং সেতু'। বাক্যে তাঁর প্রকাশ হয় না অথচ বাক্যই তাঁর প্রকাশ।

কলকাতায় এসে ব্রাহ্মসমাজে হাজির হল এক দিন। সেদিন দেবেন ঠাকুর বক্তৃতা দিচ্ছেন। বক্তৃতার বিষয়—'পাপীর দুর্দশা ও ঈশ্বরের করুণা'। বক্তৃতা শুনে বিজয় অভিভূত, দ্রবীভূত হয়ে গেল। নিজেকে হঠাৎ মনে করল নিরাশ্রয় বলে। নির্জন, নিঃসহায় বলে। প্রার্থনা করতে বসল। 'এইমাত্র শুনলাম তুমি অনাথের নাথ, তুমি দীন জনের বন্ধু। তবে আমাকে তুমি নাও, আমাকে তুমি রাখো। তোমাকে যে পায়নি তার মত আর দীন কে! তুমি আমার, এই নিকট অনুভূতি যার নেই সেই তো অনাথ। আমি আর কোথাও যাব না, আর কোথাও ঘুরব না, এই তোমার দুয়ার ধরে পড়ে রইলাম—'

তাঁর দরজায় তিনি যে আমাকে পড়ে থাকতে দেবেন এই তো তাঁর অনেক দয়া। ভিখারীকে দোরগোড়ার স্থানটুকুই বা কে দেয়!

শুধু শরণাগতিতেই শান্তি। সর্বসাধনস্তম্ভরূপা শরণাগতি।

'শান্তিরেব শান্তিঃ, সা মে শান্তিরেধি।' যা আপনাতেই শান্তি সেই শান্তিই আমার হোক।

ঠাকুর বললেন, 'কাঠ পোড়া শেষ হলে আর শব্দ থাকে না—উত্তাপও থাকে না। সব ঠান্ডা। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।'

মেডিকেল কলেজের বাংলা বিভাগে পড়ছে বিজয়কৃষ্ণ। সাহেব অধ্যক্ষের সঙ্গে ছাত্রদের সংঘর্ষ বেধেছে। বিজয় সেই ছাত্রদলের পান্ডা।

ব্যাপার কি?

এক ছাত্রকে ওষুধচুরির অপবাদ দিয়ে পুলিশে সোপর্দ করেছেন অধ্যক্ষ। শুধু তাই নয়, জাত তুলে বাঙালীদের গাল দিয়েছেন। আর যায় কোথা! বিজয়ের নেতৃত্বে ছাত্রেরা সব কলেজ ছেড়ে দিলে।

এই নিয়ে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে দেখা বিজয়কৃষ্ণের।

বিজয়কে দেখে বিদ্যাসাগরের আনন্দ ধরে না। দুই তেজস্বী চক্ষু সত্যের আলোতে জ্বলছে। দৃপ্ত ব্যক্তিত্বে অবক্র নির্ভীকতা। শুধু তাই নয়, সঙ্গে তীব্র ঈশ্বরানুরাগ।

বিজয় বললে, 'আপনার বোধোদয়ে সবই তো লিখেছেন, কিন্তু সত্যিকার বোধোদয় হয় যাঁকে আশ্রয় করে, তাঁর কথাই কিছু নেই।'

কোনো উত্তর খুঁজে পেল না বিদ্যাসাগর। বিদ্যার সে সাগর বটে কিন্তু তার নামের প্রথমেই যে ঈশ্বর তার দিকেই বুঝি তার চোখ পড়েনি।

বোধোদয়ের পরের সংস্করণে 'ঈশ্বর' এল। নতুন পাঠ। কিন্তু নব-নবায়মান রস। পৈতে ফেলে দিয়ে ব্রাহ্ম হল বিজয়কৃষ্ণ। প্রেসিডেন্সি কলেজের সামনে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করতে লাগল। শুধু বক্তৃতা নয়, প্রচারণা। চাই ব্রহ্মবিদ্যা, পরা বিদ্যা। জড় ধর্ম থেকে মুক্ত হয়ে ভগবানকে লাভ করার সারমর্মই হচ্ছে ব্রাহ্মধর্ম।

এই সময় কেশব সেনের সঙ্গে আলাপ হল বিজয়ের। আলাপের সঙ্গে-সঙ্গেই গভীর বন্ধুতা। একে অন্যের দর্পণ হয়ে দাঁড়াল। এ দর্পণে পরস্পরের মুখ দেখে না, পরাবরের মুখ দেখে।

মেডিকেল-কলেজের শেষ পরীক্ষা কাছে, বিজয় বললে, পরীক্ষা দেব না, ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করব। দেশে-দেশে দিকে-দিকে ঈশ্বরের নাম গেয়ে বেড়াব এই ব্যাকুলতাই আমার জীবনের আকর্ষণ। জীবিকার চেয়ে জীবন বড়। জীবনের চেয়ে জীবনবল্লভ।

কিন্তু প্রচার মুখের কথা নয়। কেশব বললে, দস্তুরমতো পরীক্ষা দিয়ে পাশ করতে হবে।

'তাই করব।' পড়াশোনা করে পাশ করলে সহজেই। ধর্মের বৈজয়ন্তী নিয়ে বিজয় বেরুল দিগ্বিজয়ে।

'এ যে ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো।' আপত্তি করল বন্ধুরা। 'পেট চলবে কি করে?'

'যিনি মরুভূমিতে ঘাস বাঁচিয়ে রাখেন, তিনিই রাখবেন।'

মহর্ষি বললেন, 'নির্দিষ্ট কিছু বৃত্তি দেওয়া যাক তোমাকে।'

প্রবৃত্তির বৃত্তি করতে আসিনি। ঈশ্বরই আমার উদ্যম, ঈশ্বরই আমার উদ্দেশ্য। তাঁর উপরে যদি সত্যি আমার নির্ভর থাকে তা হলেই আমি অভীঃ।

সংসারে তার জায়গা হয়নি, তাই বলে সংসারকে ত্যাগ করেনি বিজয়কৃষ্ণ। শান্তিপুর তাকে তাড়িয়েছে কিন্তু বিজয় চলেছে আসল শান্তিপুরে।

তার গতি দুর্গবিঘাতিনী, তার বাণী অপরাঙ্মুখী।

কলকাতা ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য হল বিজয়।

বুধবার, উপাসনার দিন। প্রলয়ংকর ঝড়বৃষ্টি হচ্ছে। পথঘাট ডুবে গেছে, গাছ পড়েছে অনেক, গাড়ি-ঘোড়া জনমানবের চিহ্ন নেই। জলস্রোতে মৃতদেহ ভাসছে। ঘোর অন্ধকার। কার সাধ্য রাস্তায় বেরোয় এই দুঃসময়ে?

বিজয়ের সাধ্য। প্রথমে হাঁটুজল থেকে গলাজল। তার পরে সাঁতার। পথনদী পার হয়ে শেষ পর্যন্ত পৌঁছুল মন্দিরে। কিন্তু হা হতোহস্মি, এক জনও আসেনি, ব্যাকুলতার ঝড়ে ভক্তির নদী সাঁতরে। বিশ্বাসের ভেলায় ভেসে। অশ্রুজলের বর্ষণে।

মন্দিরের চাকরকে পাঠাল আচার্যের কাছে। আচার্য মানে দেবেন ঠাকুরের কাছে। তিনি লিখে পাঠালেন : প্রকৃতির আজ করালমূর্তি, আজ এর মধ্যেই পরমেশ্বরের লীলা দর্শন করো।

একাই উপাসনায় বসল বিজয়। বিজয় একাই একশো।

কতক্ষণ পরে কেশব এল পালকিতে করে। বসে পড়ল উপাসনায়। নীরন্ধ্র অন্ধকারে দুটি নিষ্কম্প দীপদ্যুতি—কেশব আর বিজয়। স্বস্থ, শান্ত, স্পন্দন-বিরহিত। ব্রহ্মনিষ্পন্ন।

বিজয়ের দিন কাটছে অর্ধাশনে, কখনো অনশনে। চাঁদার খাতায় চার আনা আট আনা ভিক্ষে করে। কখনো বা দেড় পয়সার মুড়ি খেয়ে। বাড়ির প্রাঙ্গণে কাঁটানটে শাক ফলেছে অজস্র, তাই দিয়ে ভাত মেখে। তাও না জোটে তেঁতুল-গোলা দিয়ে। তবু ঈশ্বরস্খলন নেই, নেই স্বভাবচ্যুতি।

কণ্ঠকূপে ক্ষুৎপিপাসা নিবৃত্তি—এই কাম্যকর্মত্রয় বিজয়ের। 'অন্নচিন্তা চমৎকারা'—এ যেন বিজয়ের পক্ষে খাটে না। সে জানে তৃষ্ণাসূত্র ছিন্ন না হওয়া পর্যন্ত জীবের সমস্তই দুঃখ, তৃষ্ণাচ্ছেদ থেকে যে কৈবল্য তাই একমাত্র আনন্দ। বিজয় আছে সেই বৃহদানন্দে, জগদানন্দে। যদি সে পৌত্তলিকতা বর্জন করে থাকে তবে সে সুখ-শান্তি অর্থ-আরাম যশ-মান—সমস্ত উপাধিই বর্জন করবে। উপাধিরই বিকার, উপাধিরই মৃত্যু, আত্মা স্থির, নির্বিচল।

আত্মা প্রকাশক, জড় প্রকাশ্য। কেবল উপাধির যোগেই ভাবি আত্মাই বুঝি কর্তা, আত্মাই বুঝি ভোক্তা। অবিদ্যার বশেই নিজেকে দেহবান মনে করি। মন মায়া, আভাস মাত্র। আমাদের আসল অধিষ্ঠান চৈতন্যে। ঈশ্বব মায়ার অতীত। ঈশ্বর চৈতন্যস্বরূপ।

বিজয় সেই চৈতন্যের দ্যোতনা।

কেশব আর বিজয়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পারছে না পাদ্রিরা। খৃষ্টধর্মে আর আকৃষ্ট হচ্ছে না বাঙালী, ব্রাহ্মধর্মেই পাচ্ছে তাদের পিপাসার পানীয়।

এখন কি করা! পাদ্রিরা ঠিক করল তর্কসভায় ব্রাহ্ম-প্রচারকদের আহ্বান করা যাক। তাদের তর্কে পরাস্ত করতে পারলেই বিদ্বৎসমাজ কৃতনিশ্চয় হবে যে খৃষ্টধর্মই শ্রেষ্ঠধর্ম।

তখন কেশব বিজয় আর প্রতাপ এলাহাবাদে। উপাসনার পরে মন্দিরে এক দিন এসেছে এক পাদ্রি। মহাজ্ঞানী আর তর্কবীর বলে প্রখ্যাত। খোদ বিলেত থেকে এসেছে খৃষ্টান মিশনের প্রতিনিধি হয়ে। আগে পাদ্রি, পরে বেনে, শেষকালে সৈন্য। এই ইংরাজী কূটনীতি। আগে মিষ্টি বুলি, পরে টাকার টুং-টুং, শেষ-কালে অস্ত্রের ঝঞ্চনা। সাদরে অভ্যর্থনা করল কেশব।

'তোমরা খৃষ্টধর্ম প্রচারে বাধা দিচ্ছ। সে বিষয়ে খোঁজ করতে এসেছি আমি। ধর্ম সম্বন্ধে আমি বিচার করতে চাই তোমাদের সঙ্গে। কি তোমাদের বক্তব্য, কি বা তার ভাব—'

চার দিকে তাকাল পাদ্রি। কার সঙ্গে কথা কইব? কে তোমাদের মধ্যে উপযুক্ত? যাকে ইচ্ছে তাকেই বেছে নাও। কিন্তু তোমাকে কে বাছল, তাই ভেবে পাচ্ছি না।

'ঐ যে এক জন বসে আছে স্থির হয়ে, উপাসনা শেষ হয়ে যাবার পরেও যে নড়ছে না, ওর নাম কি?'

'বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।'

'ওর সঙ্গেই আমি কথা কইব। ওকে বলো না, চেয়ারে এসে বসবে, ও ভাবে পা মুড়ে বসবার আমার অভ্যেস নেই।'

বিজয়ের ধ্যান ভাঙল। জানল সাহেবের অভিপ্রায়।

বললে, 'সাহেব, পাণ্ডিত্য তো অগাধ সঞ্চয় করেছ। আমার পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর আগে দাও। প্রশ্ন থেকেই বুঝে নাও ভারতবর্ষের জিজ্ঞাসার গভীরতা। ধর্ম কি? তার উৎপত্তি কোথায়? আত্মা কাকে বলে আর তার স্বরূপ কি? সত্য কি জিনিস? কাকে মায়া বলে? পাপ কি, কেন?'

পাদ্রি সাহেব এ পাশ ও পাশ তাকাতে লাগল, বললে, 'এ সব প্রশ্ন তো কই শুনিনি কোথাও। এ আবার কি কথা। আমরা তো শুধু বাইবেল জানি, বাইবেলই পড়েছি—'

'সাহেব, এ দেশের নাম ভারতবর্ষ।' কেশব বললে, 'এ দেশ থেকেই ধর্ম আর সভ্যতা গ্রীস হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে তোমাদের ইউরোপে। এ দেশকে জানো, বোঝো, তবে এসো এ দেশকে ধর্মে দীক্ষা দিতে। প্রশ্নের উত্তর তুমি যদি নিজে দিতে না পারো, তোমার দেশে ফিরে যাও, সেখান থেকে উত্তর নিয়ে এস।'

সৃষ্টির প্রথম প্রশ্নের ভারতবর্ষই শেষ উত্তর।

ভারতবর্ষ বৃক্ষ, আর সব ছায়া। একে সেবা করো, উচ্ছিন্ন কোরো না। আমাদের সেবা মঙ্গলরূপিণী। 'সেবিতব্যঃ মহাবৃক্ষঃ'।

যখন তিনি দূরে তাঁকে আরাধনা করি আর যখন তিনি কাছে তখন তাঁকে সুখে সেবা করি। তিনি সুখসেব্য দূরারাধ্য। তিনি গুহ্যগভীরগহন হয়েও সহজ-সুন্দর। তুমি, সাহেব, বুঝবে না এ তত্ত্ব। আগে শ্রদ্ধা দিয়ে বুদ্ধিকে বিশুদ্ধ করো। পরে দেখ ভারতবর্ষকে।

আর বাক্যস্ফুট না করে চম্পট দিলে পাদ্রি সাহেব।

শুষ্ক জ্ঞানে মন ভরে না বিজয়ের। মন ভক্তি চায় প্রীতি চায়। প্রীতিই একমাত্র মাধুর্যবিষয়িণী। আর ভাগবতী প্রীতিই ভক্তি। ভক্তিতেই সমস্ত জ্ঞানের অবসান।

ব্রাহ্ম ধর্ম প্রচার করতে-করতে বিজয় বৃন্দাবনে এসেছে। উপাসনার মধ্যে হঠাৎ কৃষ্ণের গোষ্ঠলীলার বর্ণনা শুরু করে দিলে। ব্রাহ্মরা যারা শুনছিল তারা চঞ্চল হয়ে উঠল। এ কি পথস্খলন!

'কে জানে! স্পষ্ট চোখের উপর দেখলাম কৃষ্ণ গোঠে গরু নিয়ে যাচ্ছে।'

শুধু তাই নয়, উপাসনায় বসে মাঝে-মাঝে 'মা' 'মা' করে ওঠে।

এ কী হচ্ছে! ক্ষুণ্ণ হয় ব্রাহ্মরা। এ কি ভগবতী না জগদ্ধাত্রীর আবাহন? কিন্তু সেই অধীর আর্তি স্পর্শ করে সবাইকে। এ তো বৈধী ভক্তি নয়, এ রাগানুগা ভক্তি। শাস্ত্রের শাসনে ঐশ্বর্যবানে যে ভক্তি তা বৈধী ভক্তি আর মাধুর্যময়ী স্বভাবরুচির ভক্তিই রাগানুগা ভক্তি। বৈধী ভক্তি পিতা, রাগানুগা ভক্তিই মা।

'জয় জয় বিজয়ের জয়!' কেশব চিঠি লিখছে বিজয়কে : 'ঈশ্বরকে একমাত্র নেতাজ্ঞানে উচ্চকণ্ঠে তাঁর নাম কীর্তন কর। বৈরাগী হয়ে পদানত কর সংসারকে। উৎসাহের উত্তাপ দিয়ে জাগাও প্রসুপ্তকে, এক প্রীতির বন্ধনে সবাইকে বেঁধে ফেল। যারা নিজেদের দরিদ্র বলে বোধ করছে, তাদের ভগবৎ-বিত্তে সম্রাটের চেয়েও ধনবান কর। দেশে-বিদেশে আমাদের রাজ্য বিস্তৃত হোক।'

বাইরে প্রচার হচ্ছে আর এদিকে ঘরের মধ্যে চেঁচামেচি। বিধবা-বিয়ে, অসবর্ণ বিয়ে, ব্রাহ্মমতে শ্রাদ্ধ —এই সব নিয়ে। তুমুল হট্টগোল। কেশবকে সবাই খৃষ্টান বলতে শুরু করে দিয়েছে। শুধু তাই নয় দিচ্ছে তাকে আরো অপকৃষ্ট অপবাদ। বইছে শুধু ঈর্ষার বিষবায়ু।

বিজয়ের মন বিমুখ হয়ে উঠল। আছি শ্রীপাদপদ্মবিষয়িণী ভক্তি নিয়ে, এ সব আবার কি সংস্কারের উৎপাত! যেন অধিষ্ঠানের চেয়ে অনুষ্ঠান বড়! বিজয় চলে এল কালনায়, ভগবান দাস বাবাজীর আশ্রমে।

জল খেতে চাইল বিজয়। বললে, আমি ব্রহ্মজ্ঞানী, আমাকে কিন্তু আলাদা পাত্রে জল দেবে। বাবাজী বললে, 'যার জ্ঞান তারই তো ভক্তি। ভক্তি বাদ দিয়ে কি জ্ঞান সম্ভব? আমার পিপাসাও আজ চরিতার্থ করব। আমার কমণ্ডলুতেই জল খান।'

বাবাজীর পাত্রেই জল খেল বিজয়।

এক ঢোঁকে বাকি জল খেয়ে নিলেন বাবাজী। কমণ্ডলু মাথায় ঠেকালেন।

'এ কি করলেন? ইনি যে ব্রাহ্ম।' কে এক জন চেঁচিয়ে উঠল : 'এঁর যে পৈতে নেই।'

'আমার অদ্বৈতেরও ছিল না। ব্রাহ্মসমাজে গেছেন, কিন্তু সেখানেও আমার গোঁসাইই আচার্য।'

'আহা, আচার্যের কি বাহার! গায়ে জামা, পায়ে জুতো, আহা ফিটফাট ফুল-বাবুটি!' ব্যঙ্গ করে উঠল সেই অভক্ত।

'প্রভুকে আমার পরিপাটি করে সাজাও।' ভগবান দাস উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেনঃ 'আমি দেখতে পাচ্ছি, আমার প্রভুর ললাটে তিলক, শিরে জটাজুট ও গলায় তুলসীর মালা। সর্বাঙ্গে বৈষ্ণব চিহ্ন।'

ব্রাহ্মমন্দিরে কীর্তন ঢোকাল বিজয়।

> 'কর্ণের ভূষণ আমার সে নাম শ্রবণ,
> নেত্রের ভূষণ আমার সে রূপ দর্শন,
> বদনের ভূষণ আমার সে রূপ কথন,
> হস্তের ভূষণ আমার সে পদ সেবন,
> (ভূষণের কি আর বাকি আছে)
> আমি কৃষ্ণচন্দ্রহার পরেছি গলে॥'

কেশবকে কীর্তনে দীক্ষিত করলেন ঠাকুর। কেশব গলায় খোল ঝোলালো। মাঝখানে ঠাকুরকে রেখে সকলে নাচছে। কেশবও শুরু করলে নাচতে।

কেশব যেমন আসে তেমনি ঠাকুরও যান কেশবের বাড়িতে।

নিমাই সন্ন্যাস দেখতে কেশবের বাড়িতে গিয়েছেন ঠাকুর। কেশবের এক খোসামুদে শিষ্য কেশবকে বললে, 'কলির চৈতন্য হচ্ছেন আপনি।'

কেশব ঠাকুরের দিকে তাকাল। হাসতে-হাসতে বললে, 'তাহলে ইনি কি হলেন?'

ঠাকুর বললেন, 'আমি তোমার দাসের দাস। রেণুর রেণু।'

কেশবকে বড় ভালোবাসে রামকৃষ্ণ। তার সঙ্গে তার অন্তরের মাখামাখি।

কিন্তু কাপ্তেন খড়্গহস্ত। সে বলে, কেশব ভ্রষ্টাচার, সাহেবের সঙ্গে খায়, ভিন্ন জাতে মেয়ের বিয়ে দিয়েছে। 'আমার সে সবে দরকার কি? কেশব হরিনাম করে, দেখতে যাই, শুনতে যাই। আমি কুলটি খাই, কাঁটায় আমার কি কাজ?'

কাপ্তেন ছাড়ে না তবু। 'কেশব সেনের ওখানে যাও কেন তুমি?'
'আমি তো টাকার জন্যে যাই না। আমি হরিনাম শুনতে যাই। আর তুমি লাট সাহেবের বাড়িতে যাও কেমন করে? তারা তো ম্লেচ্ছ—'
তবে নিবৃত্ত হল কাপ্তেন।
কেশবকে লক্ষ্য করে রঙ্গরসের গান গায় রামকৃষ্ণ :

'জানি ওহে জানি বঁধু
তুমি কেমন রসিক সুজন,
বলি, আর কেন কর প্রাণ জ্বালাতন।
নেচে ঘুরে ঘুরে
অভিমানে মুখ ফিরায়ে
বঁধু, আর কেন কর প্রাণ জ্বালাতন॥
রমণীর মন ভুলাতে
নিতি হয় আসতে-যেতে
কেন এলে নিশি প্রভাতে
ওহে, মদনমোহন বংশীবদন॥'

বিজয়কে কবে গান শোনাবে রামকৃষ্ণ? কবে তাকে নাচতে শেখাবে? কবে দেখবে তার গৈরিকবাস সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী মূর্তি?
আর, বিজয়কৃষ্ণ কবে এসে রামকৃষ্ণের পদতলে পড়বে? বক্ষে ধারণ করবে সেই পাদপদ্ম?
আর, সেই তো পরং পদং, পরা কাষ্ঠা।
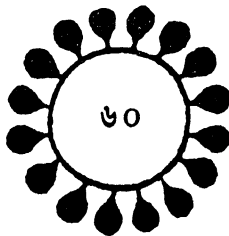
ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করছে বিজয়, আবার সেই সঙ্গে চিকিৎসাও করছে। চার দিকে এত রুগী, চুপ করে বসে থাকলে চলে কি করে? যেটুকু জ্ঞান ভাণ্ডারে আছে তা পরিবেশন না করে শান্তি কই?
দর্শনী ঠিক করল আট আনা। কিন্তু শুধু রোগ তো নয়, রোগের সঙ্গে নিষ্ঠুরতম

রোগ—দারিদ্র্য। তাই গরিব রুগীদের ওষুধ আর পথ্য জোগাতে গিয়ে দর্শনী অদৃশ্য হয়ে গেল। দর্শনী নেই বটে কিন্তু হতে লাগল অপূর্ব দর্শন।
রাত্রে প্রায়ই স্বপ্ন দেখে বিজয়। দেশনেতা সুরেন বাঁড়ুয্যের বাপ দুর্গাচরণ বাঁড়ুয্যে নামজাদা ডাক্তার। তিনি গত হয়েছেন বটে, কিন্তু স্বপ্নে প্রায়ই দেখা দেন বিজয়কে। কঠিন সব রোগের ব্যবস্থাপত্র দিয়ে যান। বিজয় তাই বিছানায় কাগজ ও পেন্সিল নিয়ে ঘুমোয়। স্বপ্নে-পাওয়া প্রেসক্রপশান ভোরে উঠেই টুকে রাখে। সে অন্ধকারে-ঢিল-ছোঁড়া ওষুধ নয়, সে একেবারে বিশল্যকরণী।
ডাক্তার হিসেবে বিজয়ের তাই জয়-জয়কার।
শুধু ডাক্তার হিসেবে?
শান্তিপুরের ওপারে গুপ্তিপাড়া। সেখানকার এক রুগী এসেছে বিজয়ের হাতে। সকালে একবার দেখে এসেছে, এখন আবার বিকেলে গিয়ে খোঁজ নেওয়া দরকার। শুধু খোঁজ নেওয়া নয়, নতুন আরেক দফা ওষুধ দিতে হবে। কিন্তু যায় কি করে? বর্ষাকাল, নিদারুণ ঝড়-বৃষ্টি শুরু হয়েছে। খেয়া বন্ধ, পাটনী রাজী নয় নৌকো ছাড়তে। তবে, উপায়? উপায় জগৎপিতা। কাপড়ের পাগড়ি করে ওষুধের শিশি মাথায় বাঁধল বিজয়, বর্ষার ভরা নদী পার হয়ে গেল সাঁতরে।
রুগী চোখ চেয়ে দেখল, দুয়ারে ধন্বন্তরি দাঁড়িয়ে।
সেই দুর্গাচরণই শেষে আরেক-দিন স্বপ্ন দেখালেন। বললেন, 'তুমি কি শুধু দেহের চিকিৎসা করেই দিন কাটাবে? অন্তরের চিকিৎসা করবে না? তুমি শুধু আয়ুর্বেদী নও, তুমি ভবরোগবৈদ্য।'
ডাক্তারি ছেড়ে দিল বিজয়। থাকে বন্ধু ব্রজসুন্দর মিত্রের বাড়িতে। তাকে উদ্দেশ্য করে চিঠি লিখল তক্ষুনি : 'ভাই, আমার ভিখিরির ঘরে জন্ম, তাই আবার ভিক্ষের ঝুলি কাঁধে তুলে নিলাম। ব্যবসা করা আমার পোষাল না। তাই তোমার আশ্রম ছেড়ে চললাম আবার নিরুদ্দেশে। ঈশ্বরের পায়ে নিজেকে বহু দিন বেচে দিয়েছি, তাই তিনি আর আমাকে ত্যাগ করতে পারবেন না। ব্রাহ্মধর্মের জয় হোক। আমার শোণিত পোষণ করুক ব্রাহ্মধর্মকে। ব্রাহ্মধর্মই আচরণীয়। প্রচরণীয়।'
শান্তিপুরে নির্জনে এসে বাস করছে বিজয়। শুধু স্থানের নির্জনে নয়, গুহাশয়ী মনের নির্জনে। হঠাৎ এক দিন সেখানে দেখা দিল শ্যামসুন্দর। বিজয় তাকে ত্যাগ করেছে বটে, কিন্তু শ্যামসুন্দর যে ত্যাগীকেও ত্যাগ করে না। ছাড়তে শিখিয়েও যে ধরে থাকে। পথহারা করিয়েও যে পথ দেখায়!
'তোকে ঘর থেকে বাইরে নিয়ে এলাম, নিয়ে এলাম মন্দির থেকে মুক্ত প্রাঙ্গণে—' বললে শ্যামসুন্দর : 'আবার তুই এসে সেই ঘরে ঢুকেছিস? ঢুকেছিস সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে? বেরিয়ে আয়, বেরিয়ে আয় আগল ভেঙে—'
কে শোনে কার কথা! বিজয় ভাবলে ছলনা। নিরংশ জ্ঞানের জগতে ভাবের কুজ্ঝটিকা।
আরেক দিন গভীর রাত্রে ব্রহ্মনাম সাধন করছে বিজয়, মনে হল রুদ্ধ দরজায় কে

ঘা মারছে বাইরে থেকে। ভাবতন্দ্রা ঘুচে গেল বিজয়ের। প্রশ্ন করলেন : 'কে?' কোনো উত্তর নেই। শুধু দ্রুত করশব্দ। মনে হল এক জন নয়, বহু লোকের সমাগম হয়েছে বাইরে।
খুলে দিল দরজা। এক দল জ্যোতির্ময় পুরুষ ঘরে ঢুকল একসঙ্গে। জ্যোতির প্লাবনে ভরে গেল গৃহাঙ্গন।
তাদের মধ্য থেকে এক জন এল এগিয়ে। বললে, 'আমি অদ্বৈত আচার্য। আর চেয়ে দেখ, ইনি মহাপ্রভু, ইনি নিত্যানন্দ, ইনি শ্রীবাস—'
প্রিয়তন্ময়তায় বিহ্বল হয়ে রইল বিজয়।
'তোমার ব্রাহ্মসমাজের কাজ শেষ হয়েছে।' বললে অদ্বৈত আচার্য : 'এবার মহাপ্রভুর শরণাপন্ন হও। স্নান করে এসো চট করে। মহাপ্রভু দীক্ষা দেবেন তোমাকে। নাম দেবেন।'
কুয়োর ধারে চলে এল বিজয়। নিশীথ রাত্রে স্নান করলে। মহাপ্রভু তাকে দীক্ষা দিয়ে সদলবলে অন্তর্হিত হলেন।
পরদিন সকালে কুয়োতলায় ভিজে কাপড় দেখে যোগমায়া তো অবাক। স্বামীর দিকে জিজ্ঞাসু চোখ তুলতেই বললে সব বিজয়। শুধু স্ত্রীকেই নয়, কেশব সেনকেও বললে চুপিচুপি।
কেশব বললে, 'কাউকে বোলো না আর এ-কথা। কেউ বিশ্বাস করবে না। তোমাকে পাগল বলবে।'
নিজেরই পাগল বলে মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে স্বপ্নজাল। ব্রাহ্মধর্মে তার ভক্তি অচলা কি না তাই পরীক্ষা করবার ভৌতিক ষড়যন্ত্র। কতগুলি প্রেতলোকবাসী আত্মা এসেছিল হয়তো, তাকে একটু দেখে গেল বাজিয়ে। দেখে গেল মন টলে কি না। খাঁটি কি না সে তার ব্রহ্মৈক্যবাদে।
বিজয় আছে বজ্রবন্ধনে। তার ব্রাহ্মী স্থিতি নিশ্চল স্থিতি। সে টলবার পাত্র নয়।
ব্রাহ্মধর্ম প্রচারে কাশীতে এসেছে বিজয়। এসে ত্রৈলঙ্গ স্বামীর সঙ্গে দেখা। শুধু দেখা নয়, সাহচর্য। সঙ্গে-সঙ্গে থাকে আর দেখে তার কাণ্ড-কারখানা। নৈকট্যের তাপ নেয়। নেয় যোগামৃতরসের স্বাদ।
তখনো স্বামীজী অজগরবৃত্তি নেননি, কিন্তু মৌনাবলম্বন করে রয়েছেন। সারা দিন ধরে ঘুরছে-ফিরছে দুজনে, খাওয়া নেই। এক সময় হঠাৎ ইশারায় জিগগেস করলেন স্বামীজী, কিছু খাবে? বিজয় হ্যাঁ করল। অমনি স্বামীজী ইশারা করলেন আরেক জনকে, বিজয়ের জন্যে কিছু খাবার নিয়ে এস। খাবার এসে গেল তক্ষুনি, কিন্তু পাঁচ-সাত জনের খাবার। বিজয় বললে, এত আমি খেতে পারব না। আপনি কিছু খাবেন?
খাব। স্বামীজী হাঁ করলেন। ইশারায় বললেন, মুখের মধ্যে ফেলে দাও।
আস্তে-আস্তে সমস্ত খাবারই নিঃশেষ হবার যোগাড়। গ্রাস আর রুদ্ধ হয় না কিছুতেই।

বিজয় দেখলে, সমূহ বিপদ। তার ভাগে আর থাকে না বুঝি এক মুঠ। তাড়াতাড়ি সে তার ভাগটা সরিয়ে রাখল চালাকি করে। ঠিক চোখে পড়েছে স্বামীজীর। স্বামীজী হাসলেন, লিখে দিলেন মাটিতে—বাচ্চা সাঁচ্চা হ্যায়।
এক দিন এক কালীমন্দিরে নিয়ে গেলেন বিজয়কে। প্রস্রাব করে কালীর গায়ে ছিটিয়ে দিতে লাগলেন। বিজয় তো হতভম্ব। জিগগেস করলে, এ কি?
মাটিতে লিখে দিলেন ত্রৈলঙ্গ স্বামী : 'গঙ্গোদকং।'
'কিন্তু গঙ্গাজল ছিটিয়ে দেবার মানে?'
'পূজা—পূজা করছি।'
'এ পূজার দক্ষিণা কি?'
'দক্ষিণা? দক্ষিণা যমালয়।'
অর্থাৎ দক্ষিণ দিকে যমালয়।
মন্দিরের পুরোত-পূজারীদের কাছে ব্যাপারটা প্রকাশ করে দিল বিজয়। তারা বিন্দুমাত্র বিচলিত হল না। বললে, 'তা তো ঠিকই। এঁর প্রস্রাব তো গঙ্গোদকই। ইনি যে সাক্ষাৎ বিশ্বনাথ।'
এক দিন ত্রৈলঙ্গ স্বামী মৌনভঙ্গ করলেন। দশাশ্বমেধ ঘাটে এসে বললেন, 'আস্নান করো।'
নিজের হাতে ধরে স্নান করালেন বিজয়কে। বললেন, 'তোকে দীক্ষা দেব।'
বিজয় পরিহাস করে উঠল : 'আর রাজ্যে লোক নেই, আপনার কাছ থেকে দীক্ষা! আপনার গঙ্গোদকের যে নমুনা তাতে ভক্তি উড়ে গেছে।' পরে গম্ভীর হয়ে বললে, 'আমি ব্রহ্মজ্ঞানী। গুরুবাদ মানি না। মাপ করুন, পারব না দীক্ষা নিতে।'
'বাচ্চা সাঁচ্চা হ্যায়'—এবার মুখর হয়ে ঘোষণা করলেন স্বামীজী। পরে বললেন, 'শোন্, তোর গুরু আমি নই—সে আসবে ঠিক সময়ে। আমি শুধু তোর শরীর শুদ্ধ করে দেব। আমার উপরে তাই ভগবানের আদেশ।'
কানে মন্ত্র দিল বিজয়ের। বিজয় ভাবল একাকিনী গঙ্গা দিয়ে বুঝি হবে না। গঙ্গাকে এসে মিশতে হবে যমুনার সঙ্গে। জ্ঞানকে এসে মিলতে হবে ভক্তির নির্মল মুক্তিতে। জ্ঞান আত্মানন্দ, ভক্তি বিশ্বানন্দ। ভগবৎ-তত্ত্বের প্রকাশকারিণী শক্তির নামই ভক্তি। ভক্তই ভগবৎ-অস্তিত্বের প্রমাণ। ভক্তিই বিশ্বাত্মতা।
দেহ-গেহে ভক্তিই প্রীতি-প্রদীপ। ভক্তি ছাড়া সবই অন্ধকার।
লাহোরে এসেছে বিজয়, প্রচারের কাজে। হঠাৎ খবর পেল, তার মা, স্বর্ণময়ী পাগল হয়ে গেছেন। পাগল হয়ে কোন দিকে যে চলে গেছেন কেউ জানে না।
তক্ষুনি বাড়ি ফিরল বিজয়। কিন্তু কোথায় মা! কে এক জন কাঠুরে বললে, 'বাঘের গায়ে শিয়র দিয়ে ঘুমোচ্ছেন।'
বনগাঁয়ের কাছাকাছি দুর্ভেদ্য বন। মা'র খোঁজে সেখানেই ঢুকল বিজয়। এমন স্থান নেই যা বিজয়ের কাছে অজেয়।
ঠিকই বলেছে কাঠুরে। বাঘের গায়ে মাথা রেখে মা ঘুমোচ্ছেন। মা'র বসন নেই,

বাঘের নেই হিংসে। মা'র চোখ বোজা, কিন্তু বাঘ চেয়ে আছে মা'র দিকে। বশ্যতার তৃপ্তিতে।
লোকজন জড়ো করল বিজয়। বাঘকে তাড়িয়ে মাকে সরিয়ে আনতে হয়! কিন্তু কে এগোয়—কী নিয়ে এগোয়!
গোলমালে তন্দ্রা ভেঙে গেছে স্বর্ণময়ীর।
বাঘকে জিগগেস করছেন, 'বাঘ, তুই কার?'
দুই চোখে ভয়ংকর স্থৈর্য নিয়ে স্তব্ধ হয়ে আছে বাঘ।
'বল্ সত্যি করে, তুই আমার? আমার যদি হোস, আমাকে তবে তোর পিঠে কর দিকিনি?'
নিশ্চল হয়ে বসে রইল বাঘ। একটা শুধু হাই তুলল।
'বুঝেছি, তুই আমার নোস। কি করেই বা আমার হবি? আমি যে উলঙ্গ কালী। আমি তো দশভুজা নই। দশভুজা দুর্গা যদি হতাম, তুই তবে আমায় পিঠে চড়াতিস।'
বাঘ তেমনি প্রশান্তদৃষ্টি।
'দাঁড়া, তোর জন্যে কিছু খাবার নিয়ে আসি।' বলেই স্বর্ণময়ী বেরুলেন বন থেকে। ছুটলেন নক্ষত্রগতিতে। চক্ষের পলকে বিজয় তাঁর পায়ে পড়ল।
'কে তুই?' থমকে দাঁড়ালেন স্বর্ণময়ী।
'আমি আপনার দাস।'
'দাস হওয়া কি মুখের কথা? কিন্তু দেখি তোর মুখখানি! কেমন যেন চেনা-চেনা মনে হচ্ছে।'
'আপনি চিনবেন না? বিশ্বভুবনের সমস্ত আপনি চেনেন, আর আমাকে চিনবেন না?'
'কে কাকে চেনে? কিন্তু তোকে কোথায় এর আগে দেখেছি বল্ তো? দেখেছি তো, আবার দেখিনি কেন? কোথায় ছিলি? সেখান থেকে আবার এলি কি করে এখানে?'
মাকে স্নান করাল বিজয়। পরিয়ে দিল নতুন কাপড়। বাড়িতে এনে তুলসী তলায় আসন পাতলে। সে-আসনে মাকে বসিয়ে বললে, 'মা, আহ্নিক করো।'
'আহ্নিক কাকে বলে?' স্বর্ণময়ী যেন আকাশ থেকে পড়লেন।
'সে কি কথা? আহ্নিক তোমার মনে নেই? আমি বলে দেব?'
মৃদু-মৃদু হাসলেন স্বর্ণময়ী। 'বল্ তো—শুনি।'
কোন বাল্যকালে মন্ত্র দিয়েছিলেন মা, তাই মা'র কানে উচ্চারণ করল বিজয়। শোনামাত্রই স্বর্ণময়ীর চোখ অশ্রুতে আচ্ছন্ন হয়ে এল। ভক্তির অশ্রু, আনন্দের অশ্রু! বিজয় এখনো তা হলে ভোলেনি। মুক্তির পথে বেরুলেও এখনো তার মাকে মনে আছে! আর, ভক্তিই তো মুক্তির মা।
চিদ্‌বিলাসের সূচনাই ভক্তি। সমাপ্তিই প্রেম। সেই ভক্তির আভাস কি এখনো জাগবে না বিজয়ে?

প্রতিমায় কি শুধু শিলা? মন্ত্রে কি শুধু অক্ষরযোজনা? শুদ্ধ চেতনার চেয়ে আবেগানুরাগ কি বড় নয়? শুষ্ক একটা বিদ্যমানতার বোধে বুক ভরে কই? সেই বোধের বস্তুতে নিয়তচিত্ত থাকবার জন্যে চাই আতীব্র অনুরাগ। সুখকর অনুসরণ। সেই ঈশ্বরপ্রীতি-প্রার্থনাই ভক্তি। ভক্তিই জাগতিক ক্ষুধানাশক। না, বিজয় আছে নির্বিশেষ জ্ঞানের স্বরাজ্যে। ঈশ্বরের অগাধবোধে।

তাই তার অসহ্য মনে হল যখন শুনল কেশব সেনকে ব্রাহ্মরা কেউ-কেউ অবতার বলে খাড়া করতে চাইছে। ঈশ্বরজ্ঞানে কেশবের পায়ের ধুলো নিচ্ছে; শুধু তাই নয়—জল দিয়ে পা ধুয়ে দিচ্ছে নিজের হাতে। এ কী পৌত্তলিক তামসিকতা! খেপে গেল বিজয়। সরাসরি গিয়ে পাকড়াও করল কেশবকে।

'এ সব কি হচ্ছে? তুমি আর-সবাইর পুজো নিচ্ছ?'

'তার আমি কি জানি!' কেশব পাশ কাটাতে চাইল কথাটার। বললে, 'লোকে কি করে না করে তাতে আমার কি যায়-আসে! অন্যের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করার আমার অধিকার কোথায়?'

উত্তর মোটেই মনঃপূত হল না বিজয়ের। লোকে তোমাকে নিয়ে যদৃচ্ছা নাচবে, আর তুমি বলবে কি না স্বাধীনতা! বিজয় লেখনীতে কশাঘাত শুরু করলে। সংবাদপত্রের কালো কালি লজ্জায় লাল হয়ে উঠল। কেশবের দলের লোকেরা বিজয়কে নাস্তিক বলে গাল দিলে। কেউ-কেউ বা মারের ভয় দেখাল। বিজয়ের দল নেই। কোনো বন্ধনে সে বন্দীভূত নয়।

হতশ্রী কোলাহল শুরু হয়ে গেল চার দিকে। কেশবের নিজেরই কেমন খারাপ লাগতে লাগল। আতিশয্যের মাঝে আর দেখতে পেল না ঐশ্বর্য। সর্বত্র অভ্যাসের শুষ্কতা।

কে এক ভক্ত পায়ে ধরে কাঁদছে।

'এখানে কি?' ধমকে উঠল কেশব। 'আমার কাছে কাঁদলে কি হবে? ঈশ্বরের কাছে গিয়ে কাঁদুন।'

'আপনিই তো সেই ঈশ্বরের অবতার।'

'মিথ্যে কথা। আমি এক জন সামান্য মানুষ।'

সামান্য মানুষ? ভক্তের দল চটে গেল। কেশবকে গাল পাড়তে শুরু করলে। বললে, ভণ্ড, মিথ্যেবাদী।

বিজয়ের সঙ্গে হাত মেলাল কেশব। আমরা কেউ কারু নিজের জয় চাই না। শুধু ঈশ্বরের জয় হোক। জয় হোক ব্রাহ্মধর্মের।

কিন্তু সে বারের ঝগড়া বুঝি আর মেটে না।

কেশবের আন্দোলনে ব্রাহ্মবিবাহ আইন পাশ হয়েছে। সে আইনে অন্যূন বয়স ধার্য হয়েছে, ছেলের পক্ষে আঠারো আর মেয়ের পক্ষে চৌদ্দ। বেদী থেকে ঘোষণা করল কেশব, এ বিধি কেবল রাজবিধি নয়, এ ঈশ্বরের বিধি।

কিন্তু ঘটল বিধি-বিড়ম্বনা। কুচবিহারের রাজার সঙ্গে নিজের মেয়ের বিয়ে ঠিক করেছে কেশব। কিন্তু মেয়ের বয়স চৌদ্দ হয়নি এখনো। তাতে কি! রাজার

সঙ্গেই মেয়ের বিয়ে দেবে। আইন লঙ্ঘন হয় হোক, কেশব মানবে না সে-আইন। আবার ঘোষণা করল কেশব, এ বিয়ে ঈশ্বরের আদেশ। ঈশ্বরের আদেশের কাছে আবার আইন কি!

এ হচ্ছে সংকীর্ণ সুবিধাবাদীর ব্যবস্থা। বিজয় খেপে গেল। ফুলের চেয়ে সে মৃদু হোক, সে আবার বজ্রের চেয়েও কঠোর। ক্ষমায় সে পৃথিবীর সমান হোক কিন্তু তেজে সে কালানল।

তীব্র প্রতিবাদ করে উঠল। শুধু লেখনীতে নয়, বক্তৃতায়। অন্যায় ও অসত্যের প্রতিবাদ না করা পাপ। আর নিজের যা স্খলন বা বিচ্যুতি তা ঈশ্বরের উপর আরোপ করা ঘোরতর দুষ্কৃতি।

তুমুল লড়াই শুরু হল। এ যদি মারে ঢিল ও ছোঁড়ে কাদা। শেষ পর্যন্ত বিজয়ের স্ত্রী যোগমায়াকে ভয় দেখিয়ে চিঠি। বিজয়কে ক্ষান্ত করুন, নইলে বিপদ অনিবার্য।

চিঠি পড়ে হাসল বিজয়। বললে, 'কেশব কি আমার সৃষ্টিকর্তা না পালনকর্তা যে ও আমাকে বিপদে ফেলবে? আসুক বিপদ, তবু সত্যের অপমান আমি সইতে পারব না।'

মেয়ের বিয়ে শেষ পর্যন্ত হিন্দুমতেই দিতে হল কেশবকে। আহত ভুজঙ্গের মত সে ফুঁসতে লাগল। 'নববিধান' নাম দিয়ে সে নতুন ব্রাহ্মসমাজ চালু করলে। বিজয়ের দলে শিবনাথ শাস্ত্রী, আনন্দমোহন বসু আর দুর্গামোহন দাশ। তারা স্থাপন করলে 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ।'

অসাধারণ ঝগড়া। আকাশ রইল আকাশের মনে, ঘট নিয়ে মারামারি।

কিন্তু কেশব যখন একবার রামকৃষ্ণের দেখা পেল তখন আর আবার ঝগড়া কি! কিসের বিবাদ-বচসা, কিসের মতভেদ! মনের মালিন্য মুছে গেল এক মুহূর্তে, বইতে লাগল প্রসন্নতার মুক্তবায়ু। চোখের সামনে জ্বলছে মূর্তিমান ব্রহ্মজ্ঞানাগ্নি! এ আগুনের কাছে আবার শত্রু-মিত্র কি, মান-অপমান কি, নিন্দা-স্তুতি কি! শুধু নির্গলিত আনন্দ। অমৃতায়িত নির্মলতা।

এ আর কেউ নয়—জাজ্বল্যদর্শন রামকৃষ্ণ। সর্বকামদ কল্পতরু। অহেতুকদয়ানিধি। এর খবর কি কেউ না দিয়ে থাকতে পারে? বিজয় গুরুর সন্ধানে বনে-বনে ঘুরছে। সে একবার দেখে যাক রামকৃষ্ণকে।

তাই কেশব লিখে পাঠাল : বন্ধু, একবারটি দেখবে এস। এমনটি তুমি আর দেখনি। বিজয় ছুটে এল খবর পেয়ে। এসে কী দেখল?

কি দেখল কে জানে! রামকৃষ্ণের দুই পা বুকের মধ্যে চেপে ধরল। স্পর্শাতীতের জগতের স্পর্শমণিকে খুঁজে পেয়েছে।

দেখল, সমস্ত জিজ্ঞাসার উত্তর বসে আছে। সমস্ত প্রশ্নের সমাধান। সমস্ত তর্কের নিষ্পত্তি। সমস্ত জটিলতার মীমাংসা। সমস্ত যাত্রার উত্তরণ।

নরপূজার বিরুদ্ধে এক দিন প্রতিবাদ করেছিল বিজয়। কিন্তু, এখন এ সব কী হচ্ছে?

নর কোথায়? এ যে নরাকারে নিরাকার!
পরমেশ্বর ইচ্ছাবশে মায়াময় রূপ ধরে অবতীর্ণ হয়েছেন সংসারে।
অতীন্দ্রিয় রাজ্যের সম্রাট হয়েও আছেন হৃদয়েশ্বর হয়ে। খেলার সাথী হয়ে, বিশ্রম্ভের সখা হয়ে। স্নেহে মাতা পালনে পিতা হয়ে। দশদিগন্তব্যাপী প্রেমের মহাসমুদ্র হয়ে।
বিজয়ের কণ্ঠে শুধু সেই শ্রবণলোভন আকৃতি, 'হে শ্রীহরি—'
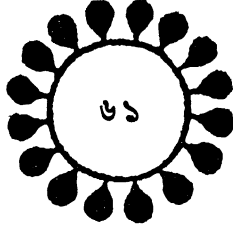
শুধু বিজয়কে নয়, আরো অনেককেই কেশব ডেকে নিয়ে গেল একে-একে। কেশব শুধু নিমিত্ত। যিনি অন্তরে বসে ডাক দেবার তিনিই ডাক দিলেন।
এগারো নম্বর মধু রায় লেনে থাকে রামচন্দ্র দত্ত—সে গেল সকলের আগে। ক্যাম্বেল মেডিকেল ইস্কুল থেকে ডাক্তারি পাশ করে বেরিয়েছে—ঘোরতর নাস্তিক। নাস্তিক হলেও রামকৃষ্ণের প্রতি অশ্রদ্ধাবান নয়। যখন কেশব বললে, যীশুখৃষ্টের মত রামকৃষ্ণেরও 'ট্রান্স' হয়, তখন রাম দত্ত ভাবল, মিরগি রোগ নিশ্চয়ই।
'না হে, হাত-পা খেঁচাখেঁচি করে না। ধীর-স্থির শান্ত হয়ে থাকে। আপনা-আপনি ভালো হয়। ডাক্তার লাগে না কখনো।'
কি জানি বা! এমনতরো কই পড়িনি বইয়ে।
প্রগতিবাদী ছেলে-ছোকরারা ব্যঙ্গ করে পরমহংসকে। বলে, গ্রেট গুস।
পানিহাটিতে বৈষ্ণবদের উৎসব হচ্ছে। যাকে বলে হরিনামের হাটবাজার। ভক্তদের নিয়ে ঠাকুর যাচ্ছেন সে উৎসবে। ভক্তদের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষ দুইই আছে। চার-চারটে পানসি ভাড়া করা হয়েছে।
শ্রীমা যাবেন কি না—এক জন স্ত্রী-ভক্ত এসে জিগগেস করলে ঠাকুরকে।
'তোমরা তো সবাই যাচ্ছ—' বললেন ঠাকুর, 'ওর যদি ইচ্ছা হয় তো চলুক—'
ইচ্ছা হয় তো চলুক—নিশ্চয়ই মন খুলে মত দিচ্ছেন না। প্রচ্ছন্ন সুরটি ঠিক ধরতে পেরেছেন শ্রীমা। যদি মন খুলে সম্মতি দিতেন, তা হলে প্রফুল্ল স্বরে বলে উঠতেন, হ্যাঁ, যাবে বৈ কি। তার বদলে, ইচ্ছা হয় তো চলুক। একটু যেন কুণ্ঠার কুয়াশা আছে কোথাও।
শ্রীমা গেলেন না। বললেন, 'অত ভিড়ে আমি যাব না। তোমরা যাও।'

উৎসবশেষে ঠাকুর ফিরেছেন দক্ষিণেশ্বরে। ঠাকুর বলছেন, 'সাধে কি আর ও যায়নি? ও মহাবুদ্ধিমতী। ওর নাম সারদা।'
স্ত্রী-ভক্তরা ঠাকুরের দিকে তাকিয়ে রইল উৎসুক হয়ে।
'ওখানে আমার ভাবসমাধি হচ্ছিল, তাই দেখে কেউ-কেউ রঙ্গ করছিল আমাকে নিয়ে।' ঠাকুর বললেন ক্ষমাময় স্নিগ্ধ হাস্যে : 'ওকে সঙ্গে দেখলে নিশ্চয়ই বলত ঠাট্টা করে—হংস-হংসী এসেছে!'
তুমি যদি মানসসরোবর, আমরা মানসযাত্রী হংস। আমাদের সমস্ত প্রাণ তোমার দিকে উড়ে চলুক পাখা মেলে। দৈনিক জীবনযাত্রার মধ্যে আমাদের সমাপ্তি নেই, আমরা তাই যাত্রা করেছি তোমার দিকে। পরিপূর্ণের দিকে। অপর্যাপ্তের দিকে।
কলকাতা মেডিকেল কলেজের সহকারী রসায়ন-পরীক্ষক হয়েছে রাম দত্ত। কুরচি গাছের ছাল থেকে রক্তামাশায়ের ওষুধ বের করেছে। বিজ্ঞানের আওতায় এসে নাস্তিকতার নেশায় পেয়েছে। ঈশ্বর আছেন তার প্রমাণ কি? তাঁকে কি দেখা যায়?
ব্রাহ্মসমাজে ঘোরে রাম দত্ত। তারা তো ঈশ্বরকে নিরাকার বলেই কাজ সেরেছে। দেখবার আর দায় রাখেনি।
পর-পর এক মেয়ে আর দুই ভাগ্নী মারা গেল কলেরায়। বিজ্ঞানে কুলোল না। ডাক্তারি ডাক্তারকে উপহাস করলে। অস্থির হয়ে পড়ল রাম দত্ত। দগ্ধ মনে শান্তির ওষুধ দেবে এখন কোন ডাক্তার?
হঠাৎ এক দিন দক্ষিণেশ্বরের দিকে রওনা হল। সঙ্গে দুই মিত্তির—মনোমোহন আর গোপালচন্দ্র। দেখি রামকৃষ্ণ কি বলে!
গিয়ে দেখে, দরজা বন্ধ। ভিতরে নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু কি বলে তাকে ডাকে। দ্বিধা করতে লাগল রাম দত্ত। রামকৃষ্ণ মনের কথা টের পেয়েছে। অমনি খুলে দিল দরজা। 'নারায়ণ' বলে নমস্কার করলে।
আমাদের মনের দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে নারায়ণ। জেনে-শুনেও খুলি না দরজা। অর্গল এঁটে মনের অন্ধকারে বসে কাঁদি।
'বোসো।'
বসল তিন জন। রাম দত্তের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল রামকৃষ্ণ। বললে, 'হ্যাঁ গা, তুমি না কি ডাক্তার। আমার হাতটা একবার দেখ না।'
রাম দত্ত তো অবাক। কি করে জানলে?
এক মুহূর্তে ফুটে উঠল অন্তরঙ্গতার আবহাওয়া। একে যেন সব কিছু বলা যায়, এ একেবারে ঘরের মানুষ। জিগগেস করল রামচন্দ্র : 'ঈশ্বর কি আছেন?'
'দিনের বেলায় তো একটি তারাও দেখা যায় না। তাই বলে কি বলবে তারা নেই?' বললে রামকৃষ্ণ। 'দুধে মাখন আছে কিন্তু দুধ দেখলে কি তা ঠাহর হয়? যদি মাখন দেখতে চাও, দুধকে আগে দধি করো। তার পর সূর্যোদয়ের আগে মন্থন করো সে দধিকে। তখন দেখতে পাবে মাখন।'

'কিন্তু কি করে তাঁকে দেখা যায়?'
'বড় পুষ্করিণীতে মাছ ধরতে চাইলে কি করো? আগে খোঁজ নাও। যারা সে পুকুরে মাছ ধরেছে তাদের থেকে খোঁজ নাও। কি মাছ আছে, কি টোপ খায়, কি চার লাগে। শেষে সেই পরামর্শানুসারে কাজ করো। ধরো সেই মনোনীত মাছ।' একটু থামল রামকৃষ্ণ। বললে, 'কিন্তু ছিপ ফেলামাত্রই কি মাছ ধরা পড়ে? স্থির হয়ে অপেক্ষা করতে হয়। তবেই আস্তে-আস্তে 'ঘাই' আর 'ফুট' দেখা যায়। তখন বিশ্বাস হয়, পুকুরে মাছ আছে—আর বসে থাকতে-থাকতে আমিও এক দিন ধরে ফেলব।'
ঈশ্বর সম্বন্ধেও তাই। গুরুর কাছে তত্ত্ব করো। ভক্তি-চার ফেল। মনকে ছিপ করো। প্রাণকে কাঁটা। নামকে টোপ। তার পরে টোপ ফেল সরোবরে। ঈশ্বরের ভাব-রূপ 'ফুট' আর 'ঘাই' জানান দেবে। বসে থাকো তন্নিষ্ঠ হয়ে। টোপ গিলবে মাছ। খেলিয়ে-খেলিয়ে ডাঙায়, মানে সংসারে তুলে নিয়ে আসবে। সাক্ষাৎকার হবে।
তার পর?
তার পর আর কি। সেই মাছ তখন ঝালে খাও ঝোলে খাও ভাজায় খাও অম্বলে খাও।
শান্তি পেল রাম দত্ত। শোকে অস্থির হয়ে কাজকর্ম ছেড়ে দিয়েছিল, আবার ধীর-স্থির হয়ে কাজ করতে লাগল। ঈশ্বর যদি আছেন তবে সুরাহা এক দিন একটা হবেই। সমস্ত কাটাকুটি ও যোগ-বিয়োগের পর হিসেব এক দিন মিলবেই। মন খাঁটি করে রইল।
কুলগুরুর কাছে দীক্ষা না নিয়ে রামকৃষ্ণের থেকে দীক্ষা নিল রাম দত্ত। রাম দত্ত বৈষ্ণব, দীক্ষাদাতা শাক্ত। পাড়ায় ঢি-ঢি পড়ে গেল। 'রাম ডাক্তারের গুরু জুটেছে হে। ঐ যে দক্ষিণেশ্বরে থাকে—কৈবর্তদের পুজুরী। কেলেঙ্কারি করলে মাইরি—'
সবাই চটল। চটল কিন্তু পিছিয়ে গেল। পিছন থেকে চিপটেন কাটতে লাগল। এগিয়ে এল পাড়ার সুরেশ মিত্তির, আসল নাম সুরেন মিত্তির। দুর্ধর্ষ শাক্ত। কেশব সেন যখন বিডন স্কোয়ারে ব্রাহ্মধর্মের বক্তৃতা দেয়, তখন তার খোলের চামড়া কেটে দিয়েছিল ছুরি দিয়ে।
'ওহে রাম, তোমার গুরুর কাছে একবার নিয়ে চল।' বললে সুরেশ। 'কেমন হংস একবার দেখে আসি।'
রাম দত্ত হাসল। বললে, 'চল।'
'কিন্তু এক কথা। তোমার হংস যদি মনে শান্তি দিতে না পারে তবে তার কান মলে দিয়ে আসব।'
সে যুগে 'কান মলে দেব' কথাটার বড় বেশি চল। অন্যের কানটা যেন হাতের কাছেই আছে এমনি একটা আত্মদৃপ্ত উদ্ধত ভাব সকলের।
সিমলে স্ট্রীটে থাকে। সদাগরি অফিসের মুৎসুদ্দি। বুদ্ধিতে পাটোয়ার। আর

মদে টুপভুজঙ্গ। গেল রাম দত্তের সঙ্গে। দেখল ভক্ত-পরিবৃত হয়ে ভাবে বিভোর হয়ে বসে আছে রামকৃষ্ণ। রাম দত্ত প্রণাম করল। এক পাশে সুরেশ বসল নির্লিপ্ত হয়ে। ভাবখানা এই, কান মলে যে দিইনি এই যথেষ্ট।

বাঁদরের বাচ্চা না বেড়ালের বাচ্চা—এই গল্পটাই তখন বলছিল রামকৃষ্ণ।

'বাঁদরের বাচ্চা জোর করে মা'র কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে, মা ব্যাজার হয়ে ফেলে দেয়, পড়ে গিয়ে কিচমিচ করে। কিন্তু মা-অন্ত প্রাণ বেড়ালছানা মা-ও মা-ও, কি না মা-মা বলে ডাকে। মা যেখানে রাখে সেখানেই সুখে থাকে। ছাইয়ের গাদায়ই হোক বা গদিবিছানায়ই হোক। একেই বলে নির্ভরের ভাব—'

অমৃতময় কথা। সুরেশের সমস্ত জিজ্ঞাসার নিরসন হয়ে গেল। ভক্তিভরে প্রণাম করল রামকৃষ্ণকে।

রামকৃষ্ণ বললে, 'কালী ভজনা কর যখন, মা'র উপর নির্ভর রাখ ষোলো আনা। তবে মাঝে-মাঝে এসো এখানকে, ভগবৎ-ভাবের উদ্দীপনা হবে!'

'ভাই, কান মলতে গিয়েছিলাম, কান মলা খেয়ে এলাম।' রাম দত্তের কানে-কানে বললে সুরেশ।

নরেন্দ্রনাথেরও সেই কথা।

নরেন্দ্রনাথ আরো দুর্ধর্ষ। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে উপাসনায় ধ্রুপদ গায়। হার্বার্ট স্পেনসার, স্টুয়ার্ট মিল পড়ে। গলার জোরে গায়ের জোরে তর্ক করে। পাদরিদেরও ছাড়ে না। তেড়েফুঁড়ে কথা কয়। কথার দাপটে ভূত ভাগায়।

তাকে এক দিন ধরলে রাম দত্ত। 'বিলে, শোন্—'

নরেন দাঁড়াল।

'দক্ষিণেশ্বরে এক পরমহংস আছেন দেখতে যাবি?'

'সেটা তো মুখখু—' এক ফুঁয়ে উড়িয়ে দিল নরেন। বললে, 'কী তার আছে যে শুনতে যাব? মিল স্পেনসার লকি-হ্যামিলটন এত পড়লুম, কোনো কিনারা হল না। ঐ একটা কৈবর্তের বামুন, কালীর পুজুরী—ও কি জানে?'

'একবার গিয়ে কথা বলেই দেখ না—'

কি ভাবল নরেন। বললে, 'বেশ, যদি রসগোল্লা খাওয়াতে পারে তো ভালো, নইলে কান মলে দেব বলছি।'

স্যার কৈলাস বসুও চেয়েছিলেন ঠাকুরের কান মলতে।

রাম দত্তকে বললেন, 'তুমি বলছ, তাই যাচ্ছি একবার তোমার পরমহংসকে দেখতে। যদি ভালো লোক হয়তো ভালো, নইলে তার কান মলে দেব বলে রাখছি।'

ঠাকুর তখন কাশীপুরের বাগানে, অসুস্থ। উপরে আছেন। নিচে বসে অপেক্ষা করছে কৈলাস। নিচের ঘরের অবস্থার বর্ণনা দিচ্ছে এই ভাবে : 'আরে, গিয়ে দেখলুম নরেনটা বি-এ পাশ করে একেবারে বকে গেছে। নিচেকার হল-ঘরের কতগুলো ছোঁড়া নিয়ে এলোমেলো ভাবে বসে আছে আর রামের বাড়ির সেই চাকর-ছোঁড়া লাটু—সেটাও বসে আছে ওদের সঙ্গে। আরে ছ্যা!'

উপর থেকে কে এক জন চলে এল নিচে। বললে, 'ঠাকুর পাঠিয়ে দিলেন। বললেন,

যে বাবুটি আমার কান মলে দেবেন বলেছেন তাঁকে ওপরে নিয়ে এস। তাই নিতে এসেছি। তিনি কে, কোনটি?'

কৈলাস তো স্তম্ভিত! সিমলেতে ঘরের মধ্যে বসে রামের সঙ্গে কি কথা কয়েছি কাশীপুরের বাগানে সে-কথা এল কি করে এখুনি? স্খলিত পায়ে উঠে গেল কৈলাস। অচ্যুত-পায়ে প্রণাম করলে। মানলে গুরু বলে, দিগদর্শক বলে।

কিন্তু গিরিশ ঘোষ আরেক কাঠি সরেস। তার থিয়েটারে গিয়েছেন ঠাকুর, মাতাল হয়ে তাঁকে বাপান্ত গালাগাল করলে গিরিশ। নেপথ্যে নয়, মুখের উপর। দক্ষিণেশ্বরে ফিরে এসে তাই বলছেন ঠাকুর: 'শুনেছ গা! গিরিশ ঘোষ দেড়খানা লুচি খাইয়ে আমায় যা না তাই বলে গালাগাল দিয়েছে।'

'ওটা পাষণ্ড। ওর কাছে আপনি যান কেন?'

যাই কেন! যাই বলে এই ব্যবহার! রাম দত্তের কাছে নালিশ করলেন ঠাকুর।

কেন, বেশ তো করেছে। ঠিকই করেছে। গিরিশকে সমর্থন করল রাম দত্ত।

'শোন, শোন, রাম কি বলে শোন। সে আমার মাতৃপিতৃ উচ্চারণ করল, আর রাম বলে কি না—'

'ঠিকই বলি। কালীয়কে শ্রীকৃষ্ণ তাড়া করলেন, কি জন্যে তুমি বিষ উদ্‌গীরণ কর? কালীয় কী বললে? বললে, ঠাকুর, তুমি আমাকে বিষ দিয়েছ, সুধা উদ্‌গীরণ করব কি করে? গিরিশ ঘোষকে আপনি যা দিয়েছেন তাই দিয়ে সে আপনার পুজো করছে।'

হাসলেন ঠাকুর। বললেন, 'যাই হোক, আর কি তার বাড়িতে যাওয়া ভালো হবে?'

'কখনোই না।' অনেকে বলে উঠল একসঙ্গে।

'রাম, গাড়ি আনতে বলো।' উঠে পড়লেন ঠাকুর। 'চলো তার বাড়ি যাই।'

সকলে তো লুপ্তবাক।

তুমিও চলো, রাম। তুইও চল, নরেন। পতিতপাবন চললেন জীবোদ্ধারে।
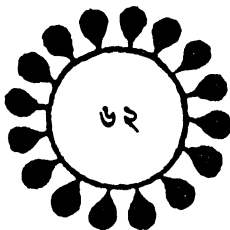
হে ঈশ্বর, তুমি তো জানো আমরা কত দুর্বল, কত অক্ষম, কত ক্ষণভঙ্গুর। মুখোমুখি তোমার সামনে গিয়ে যে দাঁড়াতে পারি এমন আমাদের সাধ্য নেই। কি করে সইব তোমার সেই আলো, কি করে বইব তোমার সেই ভালোবাসা!

আমরা ক্ষুদ্র, আমরা ক্ষীণ, আমরা অল্পপ্রাণ। তা জানো বলেই তো আমাদের জন্যে তোমার এত কৃপা, এত অনুকম্পা। তাই তো তোমার ও আমাদের মাঝখানে তুমি অন্তরাল রচনা করেছ। তোমার চিরন্তন উপস্থিতির উলঙ্গ উজ্জ্বলতা সইতে পারব না বলেই এই অন্তরাল। এই অন্তরালটিই তোমার মায়া। এই অন্তরালের নামই সংসার।

ছোট-ছোট বেড়া তুলে দিয়েছ আমাদের চার পাশে। ধনের বেড়া মানের বেড়া অহঙ্কারের বেড়া। তুচ্ছ আশা-আকাঙ্ক্ষার শুকনো খড়কুটো দিয়ে চাল ছেয়ে দিয়েছ মাথার উপরে। আশে-পাশে ছোট-ছোট সুখ-দুঃখের ঘুলঘুলি বসিয়েছ। মৃত্তিকার মেঝেটি শীতল করে লেপে দিয়েছ স্নেহ-প্রেমের সিঞ্চনে। এমনি করে অপরিসর ঘরের মধ্যে আমাদের ঢুকিয়ে দিয়ে তুমি দূরে সরে দাঁড়িয়েছ। সরে না দাঁড়িয়েই বা করবে কি। তোমার কি দোষ! আমরাই যে অশক্ত, অসমর্থ। তোমার আলোর ছটায় আমাদের দু চোখ যে ধাঁধিয়ে যাবে, তোমার ভালোবাসার ভারে ভেঙে পড়বে যে আমাদের বুক। তাই তুমি কৃপা করে তোমার ও আমাদের মাঝখানে মায়ার যবনিকা ফেলে রেখেছ। রেখেছ এই রমণীয় ব্যবধান। এই মনোহর দূরত্ব।

সংকীর্ণ পর্বতপথরেখা ধরে চলেছে রামসীতা, অনুগামী লক্ষ্মণকে সঙ্গে নিয়ে। সর্বাগ্রে রাম, রামের পিছনে সীতা, সীতার পিছনে লক্ষ্মণ। এই তাদের বনাভিযানের চিরন্তন চিত্র। রাম আর লক্ষ্মণের মাঝখানে অপরিহরণীয়া সীতা। লক্ষ্মণ ভাবছে, এত দিন চলেছি একসঙ্গে, রামকে দাদা ছাড়া আর কিছু বলে দেখতে পেলাম না কোনো দিন। হনুমান তাঁকে নারায়ণ বলে সেবা করছে, বিভীষণও পুজো করছে বিষ্ণুজ্ঞানে, কিন্তু আমার কাছে তিনি শুধু আমার সেই শাদাসিদে দাদা, দশরথের জ্যেষ্ঠ পুত্র। আমি তো কই তাঁকে কেষ্টবিষ্টু বলে দেখতে পাচ্ছি না। কি করে পারবে? কি করে রামকে দেখবে তাঁর স্বভাব-মূর্তিতে? লক্ষ্মণ আর রামের মধ্যখানে যে মায়ারূপিণী সীতা দাঁড়িয়ে। মায়াই যে দেখতে দিচ্ছে না মায়াধীশকে। সীতা যতক্ষণ না সরে দাঁড়াচ্ছেন ততক্ষণ শ্রীরামদর্শন হচ্ছে না লক্ষ্মণের। ততক্ষণ রাম শুধু দশরথের ছেলে, শুদ্ধ-ব্রহ্ম-পরাৎপর রাম নয়।

তেমনি, ঈশ্বর, এই মায়াময় সংসার সৃষ্টি করে তুমি আমাদের দৃষ্টি থেকে নিজেকে আড়াল করেছ। তোমাকে ভুলে-থাকবার খেলায় অষ্টপ্রহর মেতে আছি আমরা। কিন্তু তুমি তোমার নিজের খেলায় মেতে থেকেও আমাদের ভোলনি। যবনিকা সরিয়ে মাঝে-মাঝে উঁকিঝুঁকি মারছ। আভাসে তোমার গায়ের বাতাস আমাদের গায়ে লাগছে। আমরা চমকে-চমকে উঠছি, বুঝতে পারছি না, ধরতে পারছি না। এমন একেকটা আনন্দ দিয়েছ, তোমাকে দেখবার জন্য ব্যগ্র হয়ে বাইরে ছুটে এসেছি। এমন একেকটা দুঃখ দিয়েছ, ঘরের নিঃসঙ্গ অন্ধকারে কেঁদেছি তোমাকে বুকে নিয়ে। তবু, কই, তোমাকে দেখতে পাচ্ছি কই! রুদ্ধদৃষ্টি বধির যবনিকা দুর্ভেদ্য বাধা মেলে দাঁড়িয়ে রয়েছে চোখের সামনে।

এই যবনিকা উত্তোলন করো। উন্মোচিত করো এই নিষ্ঠুর অবগুণ্ঠন। তোমাকে দেখতে দাও। দেখতে দাও তোমার সম্পূর্ণ মুখচ্ছবি। তোমার নীরবতার মুখ, গভীরতার মুখ, অতলতার মুখ। পদ্ম যেমন সূর্যকে দেখে, তেমনি করে দেখতে দাও তোমাকে। তুমি অপাবৃত হও, উদ্ঘাটিত হও, দূর করে দাও এই আচ্ছাদনের কুহেলি।

সারদা হঠাৎ মুখের ঘোমটা খুলে দাঁড়াল রামকৃষ্ণের সামনে। আর রামকৃষ্ণ করজোড়ে স্তব করতে লাগল।

মুখের ঘোমটা ঠিক সারদা নিজে সরায়নি, সরিয়েছে আরেক জন। সেই কথাটাই বলি।

এমনিতে সব সময়ে মুখের উপর ঘোমটা টানা সারদার। যখন রামকৃষ্ণের কাছে এসে দাঁড়ায়, তখন জড়পুত্তলী ছাড়া তাকে আর কি বলবে! যা-ও দু-একটা কথা কয়, তা-ও ঘোমটার ভিতর দিয়ে। কথার সঙ্গে-সঙ্গে মুখের ভাবটি কেমন হয় তা কে জানে!

রামকৃষ্ণের তখন খুব অসুখ, সারদা থাকে দূরে, শম্ভুবাবুর সেই চালাঘরে। রামকৃষ্ণের সেবার তাই অসুবিধে হচ্ছে। কাশী থেকে কে একজন মেয়ে এসেছে, সেই সেবা করছে রামকৃষ্ণের। সেই মেয়ের কি নাম, কোথায় বাড়ি, কবে এল কবে যাবে কেউ কিছু খবর রাখে না।

এক দিন রাত্রে সেই কাশীর মেয়ে চালাঘর থেকে সারদাকে ধরে নিয়ে এল। ধরে নিয়ে এল সটান রামকৃষ্ণের ঘরের মধ্যে। রামকৃষ্ণ যেখানে বসে ছিল, সেইখানে তার চোখের সামনে দাঁড় করিয়ে দিল। অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সারদা। মুখে তার সেই দীর্ঘ ও দুর্ভেদ্য ঘোমটা।

কাশীর মেয়ে সহসা সবল হাতে সারদার সেই মুখের ঘোমটা খুলে ফেলল এক টানে। রামকৃষ্ণকে দেখাল সেই মুখ।

রামকৃষ্ণ কী দেখল রামকৃষ্ণই জানে।

করজোড়ে তৎক্ষণাৎ স্তব শুরু করল। কোথায় অসুখ, কোথায় সেবা, সমস্ত রাত ভগবৎ-কথা ছাড়া আর কথা নেই। ঠায় দাঁড়িয়ে রইল সারদা। পটার্পিতের মত। কখন যে রাত পুইয়ে ভোর হয়ে গেল ধীরে-ধীরে, কেউ টের পেল না।

এবারে কলকাতায় এসে সোজাসুজি দক্ষিণেশ্বরে উঠল না সারদা। সঙ্গে প্রসন্নময়ী ছিল, উঠল প্রথমে তার বাসায়। পরদিন সকালে দক্ষিণেশ্বরে হাজির। সারদার মা শ্যামাসুন্দরী সেবার সঙ্গে এসেছে, সারদা তাই একটু তটস্থ। মনে আশা, মাকে কেউ একটু সমাদর করুক। মিষ্টি করে কথা বলুক দুটো।

বরং ঠিক তার উলটোটা ঘটল। হৃদয় এল তেরিয়া হয়ে। শ্যামাসুন্দরীকে লক্ষ্য করে বললে, 'এখানে কি! এখানে তোমরা কি করতে এসেছ?'

শ্যামাসুন্দরী তো হতবাক। সারদা অপ্রস্তুত। এমন কাণ্ড কে কবে দেখেছে! দরজায় পা দিতে-না-দিতেই গলাধাক্কা!

আর কাউকে কথা বলতে দিল না। নিজেই গজরাতে লাগল হৃদয় : 'তোমাদের

এখানে আসবার কি দরকার! বলা নেই কওয়া নেই সটান এখানে এসে হাজির! এখানে মজাটা কিসের জানতে পাই?'

শ্যামাসুন্দরী শিওড়ের মেয়ে, হৃদয় তাই তাকে গ্রাহ্যই করলে না। উলটে অপমান করলে। সবাই ভাবলে রামকৃষ্ণ এর একটা প্রতিকার করবে। কিন্তু হাঁ-না কিছুই বললে না রামকৃষ্ণ। বলতে গেলে গালমন্দ করে হৃদয় তাকে নাস্তানাবুদ করবে। হৃদয়ের মুখ তো নয় যেন বিষের হাঁড়ি। হৃদয়কে রামকৃষ্ণের বড় ভয়।

শেষকালে শ্যামাসুন্দরী বললে, 'চল দেশে ফিরে যাই। এখানে কার কাছে মেয়ে রেখে যাব?'

অন্তরে মরে গেল সারদা। মা'র মনের ব্যথাটি গুমরাতে লাগল মনের মধ্যে।

'তাই যাও মেয়ে নিয়ে। ওরে রামলাল, পারের নৌকো এনে দে।'

রামলাল নৌকো নিয়ে এল। সেই দিনই মাকে নিয়ে ফিরে গেল সারদা। আর কোনো দিন আসব না এমন কোনো প্রতিজ্ঞা করল না রাগ করে। বরং মা-কালীকে উদ্দেশ করে মনে-মনে বললে, 'মা, আবার যদি কোনো দিন আনাও তো আসব।'

হৃদয়কে নিয়ে রামকৃষ্ণের বড় যন্ত্রণা। বড় হাঁকডাক করে, কথায়-কথায় হৈ-হুজ্জুত। এত শাসন-জুলুম ভালো লাগে না রামকৃষ্ণের। অথচ উচ্চ-বাচ্য করার যো নেই। কিছু বলতে গেলেই আবার তেড়ে আসবে। দাঁতে খড়কে দিয়ে বসে থাকে রামকৃষ্ণ।

শুধু কি তাড়না? ফোড়ন দিতেও ষোলো আনা ওস্তাদ।

কাউকে হয়তো উপদেশ দিচ্ছে রামকৃষ্ণ, অমনি হৃদয় চিপটেন ঝাড়ল : 'তোমার বুলিগুলি সব এক সময়ে বলে ফেল না! ফি বার একই বুলি বলার মানে কি?'

সর্বাঙ্গ জ্বলে গেল রামকৃষ্ণের। ঝাঁজিয়ে উঠল তক্ষুনি : 'তা তোর কি রে শালা? আমার বুলি, আমি লক্ষ বার ঐ এক কথা বলব—তাতে তোর কি?'

গালাগাল তো দেয়ই, আবার থেকে-থেকে টাকা-টাকা করে। জমি-জায়গার ফিকির খোঁজে। হাটে যায় গরু কিনতে। এক দিন রামকৃষ্ণকে এসে বললে, একখানি শাল কিনে দাও দেখি।

রামকৃষ্ণ তো অবাক। আমি কোথা শাল পাব?

'না দেবে তো নালিশ করব বলে রাখছি।' হৃদয় চোখ রাঙালো।

কর্ না। শেষকালে শালের বদলে শূল এসে না জোটে।

শুধু চাওয়া আর চাওয়া! শুধু হৈ-চৈ। আশুতোষের ঘরে কেউ নয়, সবাই অসন্তোষের ঘরে। বাজ পড়লে ঘরের মোটা জিনিস তত নড়ে না, শার্সিই খটখট করে।

রামকৃষ্ণ ঠিক করল কাশীবাসী হব। আর সহ্য হয় না জ্বালাতন।

কিন্তু কাশী যে যাবে, কাপড় না-হয় নেবে, কোনো রকমে রাখবে না-হয় পরনে, কিন্তু টাকা নেবে কেমন করে? হাতে মাটি দেবার জন্যে মাটি নিতে পারে না রামকৃষ্ণ। বটুয়া করে পান আনবার যো নেই। কাশী যাবার টিকিট রাখবে কিসের মধ্যে?

আর কাশী যাওয়া হল না।
কিন্তু একটা ব্যবস্থা তো দরকার।
ব্যবস্থা আবার কি! হৃদয় না হলে দেখবে-শুনবে কে, সেবা করবে কে? বর্ষার দিনে পেট-খারাপের সময় মাছের ঝোল আর শুক্তোর যোগাড় দেখবে কে?
তুমি তোমার কাজ করো না। হৃদয়কে থাকতে দাও না তার মোড়লির মণ্ডলে। তুমি এত বড় জগৎ-সংসারের মোড়লি করছ, হৃদয়ের এই সেবার প্রভুত্বে কেন বাদ সাধছ? হৃদয় আর কাউকে তোমার পা ছুঁতে দেয় না, শুধু ঐ পা দুখানি নিজের নিভৃত বুকে ধরে রেখেছে বলে।
তবু জীব-নিয়তির বন্ধন তার গলায়। সে টাকা চায়, জমি চায়, স্ত্রী-পুত্র-পরিবার চায়। তোমার ও তার মাঝখানে চায় সে একটি সহন-শোভন যবনিকা। জীব-নাটকের বিচিত্রিত পটপৃষ্ঠা। তুমি যদি না তোলো, কার সাধ্য তা সরায়! তুমি যদি না খোলো, কার সাধ্য তা নড়ায়!
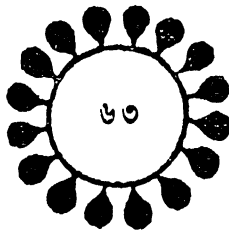
অর্ধেক রাতে উঠে রামকৃষ্ণ কুটনো কুটতে লেগেছে। তা-ও দিগম্বর হয়ে।
এমন কথা শুনেছে কেউ? হৃদয় খেপবে না তো কি!
শুধু তাই নয়, কাল সকালের চাল-ডাল মশলা সব যোগাড় করে রাখছে রামকৃষ্ণ।
'তুমি তো বেশ লোক।' খুট-খুট শব্দ শুনে ঘুম ভেঙে গিয়েছে হৃদয়ের। 'চোখে ঘুম নেই বুঝি? মাঝ রাতে উঠে এই কাণ্ড?'
হৃদয়ের কথা রামকৃষ্ণ তো ভারি গ্রাহ্য করে! নিজের মনে কাজ করে চলেছে।
'কেন? ও সব কি সকালে হয় না?'
'তুই তার কি বুঝবি? ঘুম ভেঙে গেল, ভাবলুম বসে-বসে কি আর করি, কালকের রান্নার যোগাড় দেখি গে যাই।' সরল সহাস মুখে বললে রামকৃষ্ণ।
'কিন্তু ও তোমার কি কাজের ছিরি! ঠিক একটা লোকের মত অল্প-সল্প করে যোগাড় করছ। ঐটুকু তরকারিতে তোমার পেট ভরবে?' হৃদয় ঝামটা মেরে উঠল : 'আচ্ছা কিপ্পন যা হোক।'
'তা তো বলবিই। তোদের কি! খুব খানিকটা বেশি-বেশি করে অপচয় করতে পারলেই হল! আমার পেটের আটকোল যখন জানিস না তখন চুপ করে থাক—'

'রাখো। তোমার মত গুনে-গুনে একশোটা ভাতের দানা রাখতে পারব না পাতে।'
'শোন্, এই ভাতের জন্যই কুলীন বামুনের ছেলে হয়ে এখানে চাকরি করতে এসেছিস। নইলে কোথায় শিওড় আর কোথা দক্ষিণেশ্বর! যদি দেশে তোর ধানের জমি বা টাকা-পয়সা সচ্ছল থাকতো তা হলে কি আসতিস এখানে? শোন্, লক্ষ্মীছাড়া হতে নেই, মিতব্যয়ী হবি।'
একজনকে একটা দাঁতন-কাঠি আনতে বলল রামকৃষ্ণ। সোজা দু-তিনটে ডাল ভেঙে আনলে সে।
'শালা, তোকে একটা আনতে বললুম, তুই এতগুলি আনলি কেন?'
লোকটা ভেবেছিল রামকৃষ্ণ বুঝি খুশি হবে অনেকগুলি দাঁতন পেয়ে। উলটে ধমক খাবে ভাবতে পারেনি।
দু দিন পরে আবার সেই লোককেই বললে রামকৃষ্ণ : 'ওরে একটা দাঁতন দে না—'
সে আবার ছুট দিল বাগানের দিকে।
'ওরে, কোথা যাচ্ছিস?'
'আজ্ঞে গাছ থেকে ভেঙে আনতে যাচ্ছি।'
'কেন, সেদিন যে অতগুলি আনলি—নেই?'
'আছে।'
'তবে আবার ডাল ভাঙতে ছুটছিস যে?' রামকৃষ্ণ শাসনের সুরে বললে, 'ও গাছ কি তুই সৃজন করেছিস যে মনে করলেই টপ করে কিছু ডাল ভেঙে আনবি! যার সৃজন সেই জানে। বুদ্ধি-শুদ্ধি আছে, বুঝে-সুজে কাজ কর্। জিনিসের অপচয় করবি কেন?'
ঠিক-ঠিক উপদেশ মত চলতে চেষ্টা করে রামলাল। রাত্রে যত বার বিড়ি খায়, পোড়া দেশলাইয়ের কাঠি দিয়ে ধরিয়ে নেয় লণ্ঠন থেকে। ফালতু একটিও বাক্সের কাঠি খরচ করে না।
'যত সব হাড়-কিপ্পন—' হৃদয়কে বাগানো যায় না কিছুতেই।
খিটিমিটি বেধেই আছে রামকৃষ্ণের সঙ্গে। সামান্য বচসা নয় দস্তুরমতো লম্বাই-চওড়াই ঝগড়া। রামলাল বলে, সে সব ঝগড়া দেখবার মত।
একেক সময় ভীষণ রেগে যায় রামকৃষ্ণ। হৃদয়কে যা-তা গালাগাল দিয়ে বসে। এমন সব কথা বলে যা মুখে আনা যায় না।
হৃদয় তখন চুপ করে থাকে। যখন অসহ্য হয়, বলে, 'আঃ, কি কর মামা। ও সব কথা কি বলতে আছে? আমি যে তোমার ভাগনা।'
আমার গালাগাল দেওয়া নিয়ে কথা। কথার অর্থ দিয়ে আমার কী হবে?
আমার পুজো করা নিয়ে কথা। আমার স্তোত্রমন্ত্র দিয়ে কী হবে?
আমার ভালোবাসা দেওয়া নিয়ে কথা। আমি রূপ-গুণ রত্ন-বস্ত্র দিয়ে কী করব?
একেক সময় গালাগালেও মেটে না। হাতের সামনে যা পায়, ঝাঁটা-জুতো, সপাসপ লাগিয়ে দেয় হৃদয়ের পিঠে। হৃদয় নীরবে সহ্য করে।
মনে হয় এই বুঝি দুজনে ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবে। কিন্তু পরক্ষণেই আবার দুজনে

ভালোবাসা, আবার ঠাট্টা-ইয়ার্কি। আবার হৃদয়ের প্রাণ-ঢালা সেবা। পর্যন্তহীন পরিচর্যা। তখন আবার হৃদয় হুকুম করছে রামকৃষ্ণকে। আর রামকৃষ্ণ তাই শুনছে চুপ করে। হৃদয়ের যখন প্রভুত্বের পালা তখন আবার সেই মাত্রাজ্ঞানহীন কোলাহল। রামকৃষ্ণের যন্ত্রণার একশেষ।

রামকৃষ্ণ ভাবল এ দেহ আর রাখব না। গঙ্গায় ঝাঁপ দেবার জন্যে পোস্তার উপর গিয়ে দাঁড়াল।

দেহত্যাগ করতে হবে না রামকৃষ্ণকে। মা অন্য রকম ব্যবস্থা করে দিলেন।

হৃদয়ের কি খেয়াল হল, কুমারী-পূজা করবে। কিন্তু কুমারী কোথায়? মথুরবাবুর নাতনী—ত্রৈলোক্য বিশ্বাসের মেয়েকে পাকড়াও করলে হৃদয়। পায়ে ফুল-চন্দন দিয়ে পুজো করলে।

খবর শুনে নিদারুণ চটে গেল ত্রৈলোক্য। কে জানে কি অকল্যাণ হবে না-জানি মেয়ের। যত সব মূর্খ অঘটন।

মন্দিরের কাজ থেকে ছাড়িয়ে দিলে হৃদয়কে। হ্যাঁ, এই মুহূর্তে চলে যাও মন্দির ছেড়ে। আর কোনো দিন ঢুকতে পাবে না এর ত্রিসীমায়।

দারোয়ান এসে বললে, 'আপনাকে এখান থেকে যেতে হবে।'

'আমাকে?' রামকৃষ্ণ চমকে উঠল : 'সে কি রে? আমাকে নয়, হৃদুকে।'

'না, বাবুর হুকুম,' দারোয়ান বললে শাসনগম্ভীর কণ্ঠে : 'তাকে আর আপনাকে দুজনকেই যেতে হবে।'

ব্যস, আর বিন্দুমাত্র বাক্যব্যয় নেই, ক্ষণমাত্র দ্বিধা-দ্বন্দ্ব নেই, রামকৃষ্ণ চটি পরে বেরিয়ে গেল।

হাঁ-হাঁ করতে-করতে ছুটে এল ত্রৈলোক্য। ছুটে এসে হাতে-পায়ে ধরল রামকৃষ্ণের।

'ও কি ? আপনি যাচ্ছেন কেন? আপনাকে তো আমি যেতে বলিনি।'

'তাই নাকি?' কিছু আর না বলে ফিরে এল রামকৃষ্ণ।

ত্যাগেও ঝাঁজ নেই রামকৃষ্ণের। নির্লিপ্ত, নিরভিমান। যেতে বলো চলে যাচ্ছি। থাকতে বলো থাকছি এককোণে। আমার কোনো ইতরবিশেষ নেই। আমার যেতেও যেমন আসতেও তেমন।

'ওরে হৃদু, তোকে একাই চলে যেতে বলেছে।'

হৃদয় চলে গেল হেঁট মুখে। রামকৃষ্ণ দেখল, মা-ই তাকে সরিয়ে দিলেন।

এবার আবার হাজরাকে নিয়ে মুশকিল হয়েছে। ব্রহ্ম আর শক্তি যে অভেদ এ সে কিছুতেই মানতে চায় না।

তখন রামকৃষ্ণ মাকে ডাকতে বসল। বললে, 'মা, হাজরা এখানকার মত উলটে দেবার চেষ্টা করছে। হয় ওকে বুঝিয়ে দে, নয় ওকে সরিয়ে দে এখান থেকে।'

'হাজরার কথায় আপনার এত লাগল?' জিগগেস করল ভবনাথ।

'এখন আর লোকের সঙ্গে হাঁক-ডাক করতে পারি না। হাজরার সঙ্গে যে ঝগড়া করব এ রকম অবস্থা আর আমার নয়—'

মা প্রার্থনা শুনলেন।

পর দিন হাজরা এসে বললে, 'হ্যাঁ, মানি। বিভু সকল জায়গায় বর্তমান।'
জীবের স্বভাবই সংশয়। হ্যাঁ বললেও, ঢোক গিলে বলে, কিন্তু—। বিশ্বাস হতে হবে প্রহ্লাদের মত। স্বতঃসিদ্ধ। স্বতঃস্ফূর্ত। 'ক' দেখেই প্রহ্লাদের কান্না। 'ক' দেখেই দেখেছে কৃষ্ণকে।
বালকের বিশ্বাস চাই।
এক দিন ঘাসবনে কি কামড়েছে ঠাকুরকে। ভয় হল, যদি সাপ হয়! তবে কি করা! ঠাকুর শুনেছিলেন, আবার যদি সাপ কামড়ায়, তা হলে বিষ ঠিক তুলে নেয়। তখন সাপের গর্ত খুঁজতে লাগলেন ঠাকুর, যাতে আবার কামড়ায় দয়া করে। কিন্তু গর্ত ঠিক ঠাহর হচ্ছে না। একজন জিগগেস করলে, কি করছেন? সব বললেন তাকে ঠাকুর। লোকটি বললে, যেখানটায় আগে কামড়েছে ঠিক সেই জায়গায় কামড়ানো চাই। তখন উঠে পড়লেন ঠাকুর।
আরেক দিন রামলালের কাছে শুনেছিলেন, শরতের হিম ভালো। নজির হিসেবে কি একটা শ্লোকও আওড়েছিল রামলাল। কলকাতা থেকে গাড়ি করে ফিরছেন ঠাকুর, গলা বাড়িয়ে রইলেন বাইরে, যাতে সব হিমটুকু লাগে।
তাই লাগল। তার পর অসুখ।
'গঙ্গাপ্রসাদ আমাকে বললে আপনি রাত্রে জল খাবেন না। আমি ঐ কথা বেদবাক্য বলে ধরে রেখেছি। আমি জানি সাক্ষাৎ ধন্বন্তরি।'
বিশ্বাসের কত জোর! সাক্ষাৎ পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ যে রাম তাঁর লঙ্কায় যেতে সেতু লাগল। কিন্তু শুধু রাম নামে বিশ্বাস করে লাফ দিয়ে সমুদ্র ডিঙোল হনুমান। তার সেতু লাগল না।
তোমার-আমার বিরহের অন্তরালে আর কত সেতু বাঁধব? যে সমুদ্রে আমি সে সমুদ্রে তুমিও। আমি যাচ্ছি ও-পার, তুমি আসছ এ-পার। মাঝসমুদ্রে দেখা হয়ে যাবে দুজনের। আমাদের হাতেহাতে সেতুবন্ধ।
কিন্তু হৃদয় কি সত্যিই চলে গেল? রামকৃষ্ণের সঙ্গছাড়া হল?
শ্রীমা বললেন, 'তা ভালো জিনিস কি চিরদিন কেউ ভোগ করতে পায়?'
'কিন্তু ঠাকুরকে অনেক কষ্টও দিত। গাল-মন্দ করত।'
'যে অত সেবা-পালন করেছে সে একটু মন্দ বলবে না? যে যত্ন করে সে অমন বলে থাকে।' শ্রীমার কণ্ঠস্বরে মমতার ফল্গু।
রামকৃষ্ণেরও সেই অন্তঃশীলা করুণা। বললে, 'অমন সেবা বাপ-মাও করতে পারে না।'
কিন্তু এখন তোমাকে কে দেবে সেবা-স্নেহ্?
'দেবার সেই ঈশ্বর।' বললে রামকৃষ্ণ: 'শাশুড়ি বললে, আহা, বৌমা, সকলেরই সেবা করবার লোক আছে, তোমার কেউ পা টিপে দিত বেশ হত। বউ বললে, ওগো, আমার পা হরি টিপবেন। আমার কারুকে দরকার নেই। সে ভক্তি-ভাবেই ঐ কথা বললে—'
তার মানে, আমি যখন ঈশ্বরে সম্পূর্ণ নির্ভর করে আছি তিনিই সব ভারবহনের

ব্যবস্থা করবেন। এ চাই, ও চাই, বলে তো বহু বাহানা করি, কিন্তু কী বা কতটুকু আমার সত্যিকার চাইবার মত, তা কি আমি জানি? মা জানেন, মা-ই ঠিক করে দেবেন। হয়তো শয্যা পেলাম, নিদ্রা পেলাম না; বিষয় পেলাম, মামলা বাধল; প্রেয়সী পেলাম কিন্তু প্রেম হল অস্তমিত। কী পেলে আমার চলে, কিসে বা কতটুকুতে আমার শান্তি ও সমতা, তা বুঝি আমার সাধ্য কি। আমি লোভান্ধ, অল্পদৃষ্টি, স্বার্থপর। তাই তিনি বঞ্চনা দিয়ে বাঁচান, আঘাত দিয়ে চেনান, বিচ্ছেদ ঘটিয়ে নিয়ে আসেন নতুন পরিচ্ছেদে। রাজার বেটা যদি ঠিক মাসোয়ারা পায়, হরির বেটা ঠিক হরিসেবা পাবে।

যিনি ক্লেশ হরণ করেন পাপ হরণ করেন মনোহরণ করেন তিনিই হরি।

ত্রৈলোক্য নতুন এক হিন্দুস্থানী চাকর রেখে দিল। হৃদয়ের বদলে সে-ই সেবা করবে রামকৃষ্ণের।

কিন্তু শুদ্ধ সাত্ত্বিক লোক ছাড়া আর কারু ছোঁয়া সহ্য করতে পারে না রামকৃষ্ণ। তাই কি করে চলে ও-সব হেটো চাকরে?

দু দিন পরে রাম দত্ত এসেছে দক্ষিণেশ্বরে।

'তোমার সঙ্গে এই ছেলেটি কে হে?' উৎসুক হয়ে জিগগেস করল রামকৃষ্ণ।

'লালটু। আমার বাড়ির চাকর।'

'ওকে এখানে আমার কাছে রেখে দাও। ও বড় শুদ্ধসত্ত্ব ছেলে।'

এই লাটু মহারাজ। এই স্বামী অদ্ভুতানন্দ।

ঠাকুরের সন্ন্যাসী-শিষ্যদের মধ্যে প্রথমাগত। প্রথম-পরশ-ধন্য।
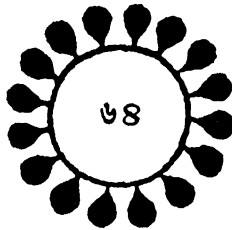
আদি নাম রাখতুরাম। ছাপরা জেলার কোন এক গণ্ডগ্রামে জন্ম। খুব ছেলেবেলাতেই বাপ-মা মরে গিয়েছে। আছে খুড়োর সংসারে। খুড়োর ছেলেপিলে নেই। রাখতুরামকে সহজেই সে টেনে নিল বুকের কাছে।

কিন্তু রাখতুরামের জন্যে নিভৃত পক্ষিনীড় নয়। ঝড়ের আকাশে তার নিমন্ত্রণ। কোন এক সমুদ্রগামী জাহাজের মাস্তুলে এসে সে বসবে।

রাখতুরাম রাখালি করে। গোঠে-মাঠে ঘুরে বেড়ায়। প্রকৃতির পাঠশালায় পড়ে। খোলা মাঠ তার বই, আকাশ আর মেঘ তার শ্লেট-পেন্সিল, বৃষ্টি তার ধারাপাত।

ঘরের পশু আর বনের পাখি তার সহপাঠী।
আর গুরু? কে জানে! থেকে-থেকে গান করে রাখতুরাম : 'মনুয়া রে, সীতারাম ভজন কর লিজিয়ে।'
মহাজনের খপ্পরে পড়েছে চাচাজী। ঋণের দায়ে নিলেম হয়ে গেল জমি-জমা। রাখতুরামকে নিয়ে চাচাজী পথে বসল।
ভাগ্যের সন্ধানে কলকাতায় এল দুজনে। কিন্তু ইটের পর ইট, ওখানে শুধু মানুষ-কীটের বাসা। কোথাও স্নেহ নেই, কোমলতা নেই। অতিথিকে ওখানে ভিক্ষুক মনে করে, ভিক্ষুককে মনে করে চোর।
দেশের লোক কাউকে পাওয়া যায় কিনা, এখানে-ওখানে খুঁজতে লাগল চাচাজী। পাওয়া গেল ফুলচাঁদকে। ফুলচাঁদ মেডিকেল কলেজে রাম দত্তের আরদালি।
'আমার কাছে রেখে যা। দেখি বাবুকে বলেকয়ে রাজি করাতে পারি কিনা।'
'সব কাজ করবে। খুব বাধ্য ছেলে রাখতুরাম।' খুড়ো মিনতি করল।
দেখেই কেমন পছন্দ হয়ে গেল রাম দত্তের। বেশ উজ্জ্বল চোখ দুটো ছেলেটার। মুখে একটা অকাপট্যের ভাব। শরীরে কাঠিন্যের লাবণ্য।
কাজ আর কি। বাজার করা, মেয়েদের বেড়াতে নিয়ে যাওয়া, মায়েদের ফরমাস খাটা আর অফিসে রাম দত্তের টিফিন দিয়ে আসা। কি, পারবি তো?
'কিন্তু এক কথা। তোর অত বড় নাম আমি বলতে পারব না। ছোট্ট করে বলব, লালটু। কি, রাজী?'
লালটু থেকে লাটু। ঠাকুর ডাকেন লেটো বলে।
কুস্তি করে লাটু। আশ্চর্য, তাতে পাড়ার গৃহস্থদের আপত্তি। চাকর আবার কুস্তি করবে কি! কুস্তিগীর চাকর হলে তো সর্বনাশ।
রাম দত্তের কাছে নালিশ করে কেউ-কেউ। এতে নালিশ করবার কী আছে। শেষ কালে বললে রাম দত্ত : 'কুস্তি করা তো ভালো। কুস্তি করলে কাম কমে যায়, আপনা-আপনি বীর্য রক্ষা হয়। নিজেরা যেমন দুর্বল, চাকরও তেমনি দুর্বল খোঁজো।'
কিন্তু তবু নিবৃত্ত হয় না পড়শীরা। একজন এসে বললে, বাজারের পয়সা চুরি করে লাটু।
'হ্যাঁ রে ছোঁড়া,' হাঁক দিল রাম দত্ত : 'ক পয়সা আজ চুরি করেছিস বাজার থেকে?'
রুখে দাঁড়াল লাটু। প্রতিবাদের ভঙ্গিতে ফুটে উঠল পালোয়ানের ভাব। জ্বলে উঠল প্রস্ফুট দুই চোখ। আধা হিন্দির তোতলামি মিশিয়ে বললে, 'জানবেন বাবু! হামি নোকর আছে, চোর না আছে!'
এই তো কথার মত কথা! জীবলোকে যত দীপ্তি আছে সবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে সত্যদীপ্তি।
রামকৃষ্ণের থেকে দীক্ষা নিয়ে রাম দত্ত তখন ঈশ্বরমদে মাতোয়ারা। সে মদের ছিটে-ফোঁটা পড়ছে এসে সংসারে। যিনি সর্বমন্ত্রপ্রণেতা তাঁরই বাণীবিন্দুর বর্ষণ। রামের উদ্দীপনায় বাড়ির সবাই কমবেশি উৎসাহিত হচ্ছে, কিন্তু একেকটা কথা

লাটুর মনে নেশা ধরিয়ে দিচ্ছে। কথার মানে সে ভালো বোঝে না কিন্তু একটি ইশারা মনের মধ্যে কেবল কেঁদে-কেঁদে বেড়ায়। একটা ভ্রমর যেন গুনগুনিয়ে উড়ে বেড়াচ্ছে। · তার মনের মধ্যে যে ফুলটি ফুটিফুটি করছে তার মধু খেতে।
'ভগবান মন দেখেন। কে কি কাজে আছে, কে কোথায় পড়ে আছে, তা দেখেন না।' কথাটা বাজল একটা আশ্বাসের মত। পথহারা প্রান্তরে আলো-জ্বালা আশ্রয়ের মত।
'নির্জনে বসে কাঁদতে হয় তাঁর জন্যে। তবে তো তাঁর দয়া হবে।'
দুপুর বেলায় গায়ে কম্বল চাপা দিয়ে শুয়ে আছে লাটু। মাঝে-মাঝে বাঁ হাত দিয়ে চোখ মুছছে। পাশ ফিরছে খানিক বাদে। আবার চোখ মুছছে ডান হাত দিয়ে।
'কাকার জন্যে মন কেমন করছে রে লাটু?' রামবাবুর স্ত্রী জিগগেস করলেন কাছে এসে।
তাঁর দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল লাটু। কার জন্যে কাঁদছি তা কি আমি জানি? কেউ কি তা জানে?
এক রোববার রাম দত্ত চলেছে দক্ষিণেশ্বরে, লাটু এসে তার সঙ্গ নিল। বললে, 'হামাকে নিয়ে চলুন।'
'সে কি, তুই কোথা যাবি?'
'যার কথা আপুনি বলেন, সেই পরমহংসকে হামি দেখবে।'
কেমন মায়া হল রাম দত্তের। সঙ্গে করে নিয়ে গেল লাটুকে।
গোলগাল বেঁটেখেটে জোয়ান চেহারার চাকর। চাকর বলে ঘরে ঢুকতে সাহস নেই। রামকৃষ্ণের ঘরের সামনে পশ্চিমের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে চুপ করে। দাঁড়িয়ে আছে কিন্তু হাত-জোড়।
রাম দত্ত ঘরে ঢুকে রামকৃষ্ণকে দেখতে পেল না। বাইরে থেকে রামকৃষ্ণ তখন আসছে নিজের ঘরের দিকে। রাধিকার কীর্তন গাইতে-গাইতে। 'তখন আমি দুয়ারে দাঁড়ায়ে—'। নিজের মনে আখর দিচ্ছে রামকৃষ্ণ। 'কথা কইতে পেলুম না। আমার বঁধুর সনে কথা হল না। দাদা বলাই ছিল সাথে তাই কথা হল না।'
বারান্দায় লাটুর সঙ্গে দেখা। তুই কে রে? তুই কোত্থেকে এলি? তোকে এখানে কে আনল?
রামকৃষ্ণকে দেখেই ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে রাম দত্ত।
'এ ছেলেটাকে বুঝি তুমি সঙ্গে করে এনেছ? একে কোথা পেলে? এর যে সাধুর লক্ষণ।'
রাম দত্তের দেখাদেখি লাটুও প্রণাম করলে রামকৃষ্ণকে। বুঝলে চোখের সামনে এই সেই নয়নাতীত।
কিন্তু ঘরে ঢুকেও বসছে না সবাইর মত। হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে আছে ঈষন্নত হয়ে। যেন রামের কাছে হনুমান।
'বোস না রে বোস।' হুকুম করল রামকৃষ্ণ। তখন লাটু এক পাশে বসল জড়সড় হয়ে।

'যারা নিত্যসিদ্ধ তারা যেন পাথর-চাপা ফোয়ারা। জন্মে-জন্মে তাদের জ্ঞান-চৈতন্য হয়েই আছে। এখানে-সেখানে ওসকাতে-ওসকাতে যেই চাপটা সরিয়ে দিল মিস্ত্রি, অমনি ফোয়ারার মুখ থেকে ফরফর করে জল বেরুতে লাগল—' বলেই রামকৃষ্ণ হঠাৎ ছুঁয়ে দিল লাটুকে।
লাটুর গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠল, ঠোঁট দুটো কাঁপতে লাগল ঘন-ঘন, আর দেখতে-দেখতে দু চোখ ফেটে উথলে উঠল কান্না।
সকলে অবাক। এক ঘণ্টার বেশি হয়ে গেল, তবু কান্না থামে না লাটুর।
'ছেলেটা কি এমনি সারাক্ষণই কাঁদবে না কি?' ব্যস্ত হল রাম দত্ত।
রামকৃষ্ণ আবার স্পর্শ করল লাটুকে। কান্না থেমে গেল তৎক্ষণাৎ।
যে হাতে কাঁদাও সেই হাতেই আবার মুছে দাও কান্না। খেলার আরম্ভে যেমনি তুমি, খেলার ভাঙার বেলায়ও তুমি।
বাড়ি ফিরে এসে কেমন আনমনা হয়ে রইল লাটু। কাজে-কর্মে উৎসাহ নেই, মন যেন দেশান্তরী হয়েছে। দেহযন্ত্রটা ঠিক-ঠিক চলছে বটে, কিন্তু যন্ত্রের মধ্যে থেকেও যে যন্ত্র নয়, সেই মনটিরই এখন যন্ত্রণা।
পরের রবিবার দক্ষিণেশ্বরে কিছু ফল-মিষ্টি পাঠাবার কথা উঠল। কিন্তু কে নিয়ে যায় বয়ে। রাম দত্তের কোথায় কি কাজ পড়েছে, সে যেতে পারবে না।
মনমরা হয়ে বসে ছিল লাটু। ঝটকা মেরে লাফিয়ে উঠল। জোয়ার-আসা গাঙের মত খুশির ঢেউয়ে উলসে উঠল সর্বাঙ্গ। বললে, 'হামি যাবে। হামাকে দিন, হামি সব উখানকে লিয়ে যাবে। ঠিক পছন লিবে আমাকে।'
তাই গেল লাটু। দীর্ঘ পথ একটা বাঁশির সুরের মত বাজতে লাগল। এত দিন গোষ্ঠে ফিরেছে লাটু, আজ চলল গোকুলে।
দূর থেকে দেখা যাচ্ছে রামকৃষ্ণকে। বাগানে দাঁড়িয়ে আছে। বেলা প্রায় এগারোটা। দেখেই দৌড় মারল লাটু। এক ছুটে হাজির হল পায়ের কাছে। লুটিয়ে পড়ে প্রণাম করলে। 'কি রে, এসেছিস? আজ এখানে থাক।'
'শুধু আজ নয়, বরাবরই ইখানকে থাকবে। হামি আর নোকরি করবে না। আপনার কাজ করবে।'
রামকৃষ্ণ হাসল। বললে, 'তুই এখানে থাকবি আর আমার রামের সংসার দেখবে কে? রামের সংসার যে আমারই সংসার।'
এই বলে রামকৃষ্ণ তাকে বুঝিয়ে দিল কি করে চাকরি করতে হয় মনিবের বাড়িতে। কি করে কর্ম করতে হয় সংসারে। মনিবের বাড়িতে থাকবি আর মন পড়ে থাকবে দেশের বাড়িতে। মনিবের ছেলেদের 'আমার রাম' 'আমার হরি' বলবি, কিন্তু মনে-মনে ঠিক জানবি ওরা তোর কেউ নয়।
কিন্তু এখন কোন ধরনের প্রসাদ নিবি তুই?
কালীবাড়ির আমিষ প্রসাদ নিতে কুণ্ঠা ছিল লাটুর। রামকৃষ্ণ তা বুঝতে পেরেছে। বললে, 'ওরে, মা-কালীর আমিষ ভোগ হয় আর বিষ্ণু মন্দিরে হয় নিরামিষ। সব গঙ্গাজলে রান্না। প্রসাদে কোনো দোষ নেই।'

'আমি অত-শত কি জানি!' লাটু শুধু জানে কোথায় তার আসল প্রসাদ।
'আপুনি যা পাবেন হামনে তাই খাওয়া করবে। হামি তো আপুনার প্রসাদ পাবে—বাকি আর কুছু পাবে না।'
রামলালের দিকে তাকিয়ে বললে রামকৃষ্ণ, 'শালা কেমন চালাক দেখেছিস। আমি যা পাব শালা তাতেই ভাগ বসাতে চায়।'
'বাচ্চা সাচ্চা হ্যায়।'
সারা বেলা কাটিয়ে দিল লাটু। বুঝিয়ে-সুজিয়ে তাকে বাড়ি পাঠিয়ে দিল রামকৃষ্ণ। যাবার সময় বলে দিল, 'দেখিস বাপু, এখানে আসবার জন্যে যেন মনিবের কাজে ফাঁকি দিসনি। রাম তোর আশ্রয়দাতা, তার যদি কাজ না করবি তা হলে নেমকহারামি হবে। খবরদার, নেমকহারাম হবি না। যখন সময় হবে তখন আমিই তোকে এখানে ডেকে নেব।'
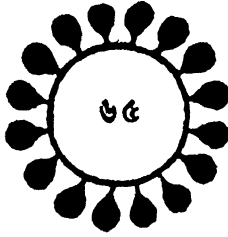
রামকৃষ্ণকে এখন একবার দেশে যেতে হয়। এই প্রথম তার হৃদয়-ছাড়া দেশে যাওয়া।
মাকে বলে হৃদয়কে নিজেই সরিয়ে দিয়েছে রামকৃষ্ণ। কায়মনে এত সেবা করে অথচ টাকার মায়া কাটাতে পারে না। থেকে-থেকে কোত্থেকে সব বড়লোক এনে হাজির করে। বলে, এটা চাও, ওটা নাও, এদিক-ওদিক সুবিধে দেখ। লছমীনারাণ মাড়োয়ারীকে ওই ধরে এনেছিল কিনা ঠিক কি। যখন বললে, টাকাটা হৃদয়-বাবুর কাছে রেখে যাই, হৃদয়বাবুর স্ফূর্তি তখন দেখে কে।
এক কথায় নিরস্ত করে দিলে রামকৃষ্ণ। টাকা কাছে রাখাই মানে অহঙ্কারকে জীইয়ে রাখা।
মাড়োয়ারী তখন আরেক কৌশল করলে। বললে, তোমার স্ত্রীর নামে লিখে দি।
হৃদয় বললে, 'সেই ভালো।'
রামকৃষ্ণ ভাবল, মন্দ কি, জিগগেস করা যাক সারদাকে।
নিভৃতে ডাকিয়ে আনল। বললে, 'দশ-দশ হাজার টাকা! তোমাকে দিতে চাচ্ছে লছমীনারাণ। নাও না? নেবে?'
সার কথা বুঝতে পেরেছে সারদা। বললে, 'তা কেমন করে নিই? আমি নিলে

যে তোমার নেওয়াই হয়ে গেল। আমি আর তুমি কি আলাদা? তুমি যা নিতে পারো না তা আমিও নিতে পারি না।' চলে গেল সারদা।

হৃদয়ের মুখ ম্লান হল বটে কিন্তু হাঁপ ছাড়ল রামকৃষ্ণ।

টাকার যে এত অহঙ্কার কর, তোমার ক' হাঁড়ি আছে জিগগেস করি? তোমার যদি আছে হাঁড়ি, ওর আছে জালা। তোমার যদি আছে জালা, ওর আছে মটকি। আধিক্যেরও আতিশয্য আছে। সন্ধের পর যখন জোনাকি ওঠে তখন সে ভাবে জগৎকে খুব আলো দিচ্ছি। কিন্তু যেই আকাশে তারা উঠল, তার অভিমান চলে গেল। তারারা ভাবতে লাগল, আমরাই আলো দিচ্ছি জগৎকে। কিছু পরে যেই চাঁদ উঠল, লজ্জায় মলিন হয়ে গেল তারারা। চাঁদ ভাবল জগৎ আমার আলোতেই হাসছে। দেখতে-দেখতে অরুণোদয় হল, সূর্য উঠলেন। তখন কোথায় বা চাঁদ, কোথায় বা কি।

গোড়ায়-গোড়ায় রামলালও এক-আধটু হাত বাড়াত। ঠাকুরের অসুখের সময় মহেন্দ্র কবরেজ দেখতে এসেছে সেবার। যাবার সময় পাঁচটি টাকা দিয়ে গেল রামলালের হাতে।

ডাক্তার কই ভিজিট নেবে, সেই কিনা উলটে টাকা দেয় রুগীকে।

বিছানায় ছটফট করছেন ঠাকুর। সারাক্ষণ কত হাওয়া করল লাটু, তবু কমছে না যন্ত্রণা। বুকের মধ্যে যেন বিল্লি আঁচড়াচ্ছে। শেষে বললেন, 'যা তো, রামনেলোকে ডেকে নিয়ে আয় তো, সে শালা নিশ্চয় কিছু করেছে, নইলে চোখ বুজছে না কেন?' রামলাল কাছে আসতেই ঠাকুর চেঁচিয়ে উঠলেন: 'যা শালা যা, এখানকার জন্যে যার ঠেঙে টাকা নিয়েছিস তাকে শিগগির ফিরিয়ে দিয়ে আয়।'

রাত তখন প্রায় দুটো। লাটুকে সঙ্গে নিয়ে রামলাল গেল সেই কবরেজের বাড়ি। কবরেজকে ঘুম থেকে তুলে তার টাকা তাকে ফেরৎ দিলে।

ঠাকুর ঠাণ্ডা হয়ে দুচোখ একত্র করলেন।

'ওরে রামলাল,' ঠাকুর বলেছিলেন এক দিন স্নেহস্বরে: 'যদি জানতুম জগৎটা সত্যি, তবে তোদের কামারপুকুরটাই সোনা দিয়ে মুড়ে দিয়ে যেতুম। জানি যে, ও সব কিছু নয়, একমাত্র ভগবানই সত্যি।'

ওরে, সে যে আনন্দং নন্দনাতীতং। প্রেয়ঃ পুত্রাৎ, প্রেয়ো বিত্তাৎ, প্রেয়োনাস্মাৎ সর্বস্মাৎ। তার মত ভালোবাসার জিনিস আর কিছু নেই।

শ্রীমতী বললে, 'সখি, চতুর্দিক কৃষ্ণময় দেখছি।'

তা তো দেখবেই। তুমি যে অনুরাগ-অঞ্জন চোখে দিয়েছ।

সখীরা বললে, 'রাধে, ঐ দেখ কৃষ্ণ এসেছে। তোমার সর্বস্ব ধন হ'রে নিতে এসেছে—'

ওরে, নিক হরণ করে। ওই তো আমার সর্বস্ব।

কেশব সেন যখন আসে দক্ষিণেশ্বরে, হাতে করে কিছু নিয়ে আসে। হয় ফল নয় মিষ্টি। রামকৃষ্ণের পায়ের কাছে বসে কথা কয়। একেক দিন বা বক্তৃতা দেয়। সেদিন বড় ঘাটে গঙ্গার দিকে মুখ করে বক্তৃতা দিলে কেশব।

হৃদয়ের যেমন মুরুব্বিয়ানা করা অভ্যেস, গম্ভীর মুখে বললে, 'আহা, কী বক্তৃতা! মুখ দিয়ে যেন মল্লিকে ফুল বেরুচ্ছে!'

কিন্তু বক্তৃতার মধ্যেই উঠে গেল রামকৃষ্ণ। যারা জমায়েত হয়েছিল বলাবলি করতে লাগল, লোকটা মুখখু কিনা, মাথায় কিছু ঢোকে না, তাই কেটে পড়ল।

কিন্তু কেশবের মনে ডাক দিল, কোনো ত্রুটি হয়েছে নিশ্চয়ই। তাড়াতাড়ি কাছে এসে জিগগেস করলে রামকৃষ্ণকে, 'কিছু কি অন্যায় করে ফেলেছি?'

'নিশ্চয়ই। তুমি বললে, ভগবান, তুমি আকাশ দিয়েছ বাতাস দিয়েছ—কত-কি দিয়েছ। তারি জন্যে যেন তোমার কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। ও সব তো ভগবানের বিভূতি। বিভূতি নিয়ে কথা কইবার দরকার কি? এ কি তুমি বলে শেষ করতে পারবে? তা ছাড়া, এ সব বিভূতি যদি তিনি নাই দিতেন, তা হলেও কি তিনি ভগবান হতেন না?' একটু থামল রামকৃষ্ণ। বললে, 'বড়লোক হলেই কি তাঁকে বাপ বলবে? যদি তিনি গরিব হতেন, নিঃস্ব ও নির্ধন হতেন, তা হলে কি তাঁকে বাপ বলবে না?'

কেশব চুপ করে রইল।

হৃদয়কে জিগগেস করি, এখন এ কোন ফুল বেরুচ্ছে মুখ দিয়ে?

সকলে বলাবলি করতে লাগল, 'সত্যি বড়লোক হলেই কি বাপ হবে? গরিব হলে সে আর বাপ নয়?'

এরই নাম ভালোবাসা। ভগবান আমাকে কিছু দিন বা না-দিন, আমার দিকে তাকান বা না-তাকান, তবু আমি তাঁকে ভালোবাসি। আমি তাকিয়ে আছি তাঁর দিকে।

দক্ষিণেশ্বরের পাগলা বামুন কেশব সেনের মাথা ভেঙে দিয়েছে। এই নিয়ে শুরু হল হৈ-চৈ। বলে কিনা, বড়লোক না হলে বাপ কি আর বাপ হবে না? সন্তান কি গরিব বাপকে ডাকবে না বাবা বলে?

তার পরে যখনই কেশবকে বক্তৃতা দেবার জন্যে অনুরোধ করেছে রামকৃষ্ণ, কেশব সলজ্জ হাস্যে বলেছে, 'কামারের দোকানে আমি আর ছুঁচ বেচতে আসব না। আপনিই বলুন, আমরা শুনি।'

হৃদয়ের মাতব্বরি করার দিন ফুরিয়ে গেল। দক্ষিণেশ্বর ছেড়ে চলে যাবার সময়ও নরম হল না। বললে, 'মামা, তুমি এদের ছাড়ো। দু-চারটে বড়মানুষ ধরো, দেখবে কত বাগানবাড়ি তোমার হবে।'

ত্রৈলোক্য তাড়া দিচ্ছে বেরিয়ে যাবার জন্যে।

'তুমিও আমার সঙ্গে চলো, মামা।' হৃদয় এক মুহূর্ত তাকাল পিছন ফিরে। বললে, 'তোমায় যদি পেতুম, দেখতে কত বড় কালীবাড়ি জাঁকিয়ে তুলতুম! ইট চুন সুরকির মন্দির নয়, একেবারে সোনার মন্দির।'

চলে গেল হৃদয়। রামকৃষ্ণ নিঃসঙ্গ। একা-একা গেল কামারপুকুর।

বালক লাটু একা-একা চলে এসেছে দক্ষিণেশ্বরে। কিন্তু এসে দেখছে, সমস্ত ফাঁকা, রামকৃষ্ণ নেই, তার ঘর বন্ধ। তখন কি করে লাটু, গঙ্গার ঘাটে বসে

অঝোরে কাঁদতে বসল। ডাকতে লাগল আকুল হয়ে, তুমি কোথায়? একবার দাঁড়াও আমার চোখের সামনে।

আর কত কাঁদবি? এবার বাড়ি যা। আজই তাঁর ফেরবার দিন নয়।

ফেরবার দিন নয় মানে? তিনি কি কুথা গেছেন নাকি? তিনি ইখানকেই আছেন।

এখানেই আছেন কি রে? তিনি দেশে গেছেন।

আপনি জানেন না। ইখানকেই আছেন। হামি তার সাথে দেখা না কোরে যাবে না।

তবে থাক বসে। কতক্ষণে দেখা পাস দ্যাখ।

মন্দিরে সন্ধ্যারতি হচ্ছে। ওদিকে লক্ষ্য নেই লাটুর। গঙ্গার পরপারে তাকিয়ে আছে একদৃষ্টে।

কে একজন বুঝি তাকে প্রসাদ দিতে এল। এসে দেখল লাটু যেন প্রাণ ঢেলে কাকে প্রণাম করছে। সামনে লোকজন কেউ নেই, তবু প্রাণ-ঢালা প্রণাম।

অনেকক্ষণ পর মাথা তুলল লাটু। অপরিচিত লোক সামনে দেখে থ হয়ে গেল। বললে, 'সে কি! পরমহংসমশায় কুথায় গেলেন! এই যে ছিলেন এতক্ষণ ইখানকে।'

রাম দত্তকে জিগগেস করলে রামকৃষ্ণ : 'কি মধু পেয়ে ছোঁড়াটা এখানে পড়ে থাকতে চায় বলো তো! আমি তো কিছু বুঝি না।'

রাম দত্তও বোঝে না। তার স্ত্রীও বোঝে না।

রাম দত্তের স্ত্রী বলে, 'ওখানে তোকে খাওয়াবে কে? কাপড়চোপড় দেবে কে?'

কি রকম অবুঝের মতন তাকায় লাটু। খাওয়া? কাপড়চোপড়? দক্ষিণেশ্বরের সংসারে এও আবার একটা জিজ্ঞাস্য নাকি? জোটে জুটবে না জোটে না জুটবে। সে যে দক্ষিণ-ঈশ্বর।

তবু বিনা মাইনেয় নোকরি করতে হবে কষ্ট সয়ে! এরই বা অর্থ কি?

কালবোশেখীর দুর্যোগ, তবু নরেন চলেছে দক্ষিণেশ্বর। বাবা বললেন, যদি একান্তই যাবি, ঘোড়ার গাড়িতে যা। কেন মিছিমিছি পয়সা নষ্ট! শেয়ারের নৌকোতেই চলে যাবে দক্ষিণেশ্বর। নৌকো যদি ডোবে তো ডুববে!

একেই বলে ডানপিটের মরণ গাছের আগায়। কোনো সুবুদ্ধির সে ধার ধারে না।

'এসেছিস?' ডাক দিয়ে উঠল রামকৃষ্ণ।

পর মুহূর্তেই গম্ভীর হবার ভান করে বললে, 'কেন আসিস বল তো? আমার কথা যখন শুনিস না তখন আসিস কি করতে?'

'তুমি আবার শোনাবে কি! তুমি কি কিছু জানো? নিজে কি কিছু পেয়েছ যে তাই পরকে দেবে?' নরেনের কণ্ঠে স্পষ্ট অস্বীকার। রূঢ় প্রত্যাখ্যান।

'বেশ তো, জানি না কিছু, পাইনি কানাকড়ি।' রামকৃষ্ণ স্নেহকরুণ চোখে তাকাল নরেনের দিকে : 'তবু, যার থেকে কিছুই শেখবার নেই, যাকে তুই নিস না, মানিস না, তার কাছে এই ঝড়দাপটে তুই আসিস কেন?'

'আসি কেন?' হাসল নরেন : 'তোমাকে ভালোবাসি বলে দেখতে আসি।'
রামকৃষ্ণ জড়িয়ে ধরল নরেনকে। বললে, 'সকলেই স্বার্থের জন্যে আসে। নরেন আসে আমাকে শুধু ভালোবাসে বলে।'
একেই বলে ভালোবাসা!
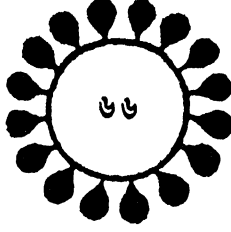
স্বরবর্ণ হয়ে গিয়েছে। এখন লাটুকে ব্যঞ্জনবর্ণ শেখাচ্ছে রামকৃষ্ণ।
সামনেই বর্ণপরিচয় খোলা।
রামকৃষ্ণ বললে, 'বল্, "ক"—'
লাটু উচ্চারণ করলে, '"কা"—'
'ওরে "কা" নয়, "ক"। বল্, "ক"—'
আবার লাটু বললে, '"কা"—'
কিছুতেই পশ্চিমী জিভ সজুত করতে পারছে না। রামকৃষ্ণ যত বলছে "ক", লাটু তত বলছে "কা"।
ঝলসে উঠল রামকৃষ্ণ : 'শালা, "ক"কেই যদি "কা" বলবি তবে "ক"-এ আকারকে কি বলবি? যা শালা, তোর আর পড়ে কাজ নেই।'
ছুটি মিলে গেল লাটুর। তাকে আর পাশের পড়া পড়তে হল না।
ঠাকুর বলেন, 'পাশ করা, না, পাশ পরা!'
লেখা-পড়া না শিখিস, নেশা-করাটা শিখে নে।
কিসের নেশা?
মদ-ভাঙের নেশা নয়। এ একেবারে রাজা নেশা। ব্রহ্ম-নেশা।
বই পড়ে কি জানবি? যতক্ষণ না হাটে পেঁছুনো যায়, দূর হতে শুধু হো-হো শব্দ। হাটে পেঁছুলে আরেক রকম। তখন দেখতে পাবি, শুনতে পাবি স্পষ্ট। দেখতে পাবি দোকানিকে। শুনতে পাবি, আলু, নাও, পয়সা দাও!
বড়বাবুর সঙ্গেই আলাপের দরকার। তাঁর কখানা বাড়ি, কটা বাগান, কত কোম্পানির কাগজ, এ আগে থেকে জানতে এত ব্যস্ত কেন? কেন এ-দোর ও-দোর ঘোরাঘুরি করা? চাকরদের কাছে গেলে দাঁড়াতেই দেয় না, তারা বলবে কোম্পানির কাগজের খবর! কিন্তু যো-সো করে বড়বাবুর সঙ্গে একবার আলাপ কর্, তা

ধাক্কা খেয়েই হোক বা বেড়া ডিঙিয়েই হোক—তখন একে-একে সব জানতে পাবি। কত বাড়ি কত বাগান কত কোম্পানির কাগজ তিনিই সব বলে দেবেন। বাবুর সঙ্গে আলাপ হলে চাকর-দারোয়ানরা সব সেলাম করবে।

'এখন বড়বাবুর সঙ্গে আলাপ হয় কিসে?' একজন কে জিগগেস করলে।

'তাই তো বলি, কর্ম চাই।' বললে রামকৃষ্ণ: 'ঈশ্বর আছেন বলে বসে থাকলে চলবে? যো-সো করে তাঁর কাছে গিয়ে পেঁছুতে হবে।'

'কি করে পেঁছুই?'

'নির্জনে তাঁকে ডাকো, প্রার্থনা করো। দেখা দাও বলে কাঁদো ব্যাকুল হয়ে। কামিনীকাঞ্চনের জন্যে তো পাগল হয়ে বেড়াতে পারো, একবার তাঁর জন্যে একটু পাগল হও দেখি। লোকে বলুক, অমুকে ঈশ্বরের জন্যে পাগল হয়েছে।'

একটু নির্জনে যা। নির্জন না হলে মন স্থির হবে না। নির্জনে বসে একটু ধ্যান কর। বাড়ির থেকে আধ পো অন্তরে ধ্যানের জায়গা কর। নির্জনে গোপনে তাঁর নাম করতে-করতে তাঁর কৃপা হয়। তার পরেই দর্শন।

'দর্শন?' চমকে উঠল কেউ-কেউ।

'হ্যাঁ, দর্শন। যেমন ধরো, জলের ভিতর ডোবানো বাহাদুরী কাঠ আছে—তীরে শিকল দিয়ে বাঁধা। সেই শিকলের এক-এক পাপ্ ধরে-ধরে গেলে, শেষে বাহাদুরী কাঠকে স্পর্শ করা যায়।'

কেন সংসার কি দোষ করল? আমরা জনক রাজার মত নির্লিপ্ত ভাবে সংসার করব।

'মুখে বললেই জনক রাজা হওয়া যায় না। জনক রাজা হেঁটমুণ্ড হয়ে ঊর্ধ্বপদ করে কত তপস্যা করেছিলেন। তোমাদের হেঁটমুণ্ড বা ঊর্ধ্বপদ হতে হবে না, কিন্তু সাধন চাই। নির্জনে বাস চাই। দই নির্জনে পাততে হয়। ঠেলাঠেলি নাড়ানাড়ি করলে দই বসে না।'

সবাইর মুখভাব একটু কঠিন হয়ে উঠল। কোমলকে পাবার জন্যে সাধনা চাই কঠিন। বন্ধুর পথটি বন্ধুর হয়ে রয়েছে!

'এ তো ভালো বালাই হল!' রামকৃষ্ণ কথায় একটু বিদ্রূপের টান দিল: 'ঈশ্বরকে তুমি দেখিয়ে দাও আর উনি চুপ করে বসে থাকবেন। দুধকে দই পেতে মন্থন করলে তো মাখন হবে! তা তুমি মাখন তৈরি করে ওঁর মুখের কাছে তুলে ধরো! ভালো বালাই—তুমিই মাছ ধরে হাতে দাও।'

ওরে, রাজাকে দেখতে চাস? রাজা আছেন সাত দেউড়ির পারে। প্রথম দেউড়ি পার না হতে-হতেই বলে, রাজা কই? 'যেমন আছে, এক-একটা দেউড়ি তো পার হতে হবে। যেতে হবে তো এগিয়ে।

রাম দত্তকে বলে লাটুকে রেখে দিয়েছে রামকৃষ্ণ। এমন শুদ্ধসত্ত্ব ছেলে আর দুটি হতে নেই।

গাড়ু ছুঁতে পারে না রামকৃষ্ণ। শৌচে যখন যায় গাড়ু নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে লাটু। জপে বসেছে লাটু, হঠাৎ জপ ছুটে গেল। কে যেন ছুটিয়ে দিলে।

'ওরে, তুই যার ধ্যান করছিস, সে এক গাড়ু জলও পায় না।' সামনে দাঁড়িয়ে রামকৃষ্ণ। বলছে, 'এ রকম ধ্যানে কী ফল হবে রে?'
গাড়ু হাতে সঙ্গে-সঙ্গে চলল লাটু।
'যার সেবা করবি তার কখন কি দরকার হুঁশ রাখবি। তবে তো সেবার ফল পাবি।' শোন, কাজের মাঝেই তাকে ধরবি। কিন্তু সব সময়ে জানবি তুই যন্ত্র তিনি যন্ত্রী। তুই চক্র, তিনি চক্রী। তুই গাড়ি তিনি ইঞ্জিনিয়র।
পাতাটি নড়ছে সেও জানবি ঈশ্বরের ইচ্ছে। সেই তাঁতি কি বলেছিল জানিস না? তাঁতি বললে, রামের ইচ্ছেতেই কাপড়ের দাম এক টাকা ছ আনা, রামের ইচ্ছেতেই ডাকাতি। রামের ইচ্ছেতেই ধরা পড়ল ডাকাত, রামের ইচ্ছেতেই আমাকে ধরে নিয়ে গেল, আবার রামের ইচ্ছেতেই ছেড়ে দিলে।
ওরে ঘোলেরই মাখন, মাখনেরই ঘোল। খোলেরই মাঝ, মাঝেরই খোল।
এক দিন লাটুকে জিগগেস করলে রামকৃষ্ণ : 'ওরে লেটো, বলতে পারিস ভগবান ঘুমোয় কি না?' প্রশ্ন শুনে লাটুর তো চক্ষুস্থির! বললে, 'হামনে জানে না।'
'ওরে, জীবজগতে সকলেই ঘুমের অধীন, কিন্তু ভগবানের ঘুমোবার যো নেই। তিনি ঘুমুলে সব অন্ধকার! সারা রাত সারা দিন জেগে তিনি জীব-জন্তুর সেবা করছেন। তিনি জেগে আছেন বলেই জীবজন্তু নির্ভয়ে ঘুমুতে পারছে।'
শুধু কি তাই? ঘুমে বা জাগরণে কে কখন কেঁদে ওঠে, তিনি না জেগে থাকলে তা শুনবে কে? আমরা অন্ধকারে ঘুমুই, আর তিনি সারা রাত আলো জ্বালিয়ে বসে থাকেন শিয়রে।
অধর সেন দক্ষিণেশ্বরে এসে প্রায়ই ঘুমিয়ে পড়ে।
এক দিন ঠাকুরকে এসে শুধোলেন, 'তোমার কি-কি সিদ্ধাই হয়েছে বলো তো?'
'যারা ডিপটি হয়ে সবাইকে ভয় দেখিয়ে থাকে,' ঠাকুর বললেন হাসতে-হাসতে, 'মায়ের ইচ্ছেয় সে সব ডিপটিকে ঘুম পাড়িয়ে রাখি।'
তারই জন্যে কি অধর দক্ষিণেশ্বরে এসে ঘুমোয়?
এ কেমন হীনবুদ্ধি! ভাগ্যবলে দক্ষিণেশ্বরে এসেছিস, 'বিল্ডিং' না দেখে বরং গঙ্গা দ্যাখ, মাকে দ্যাখ, ঠাকুরকে দ্যাখ—তা নয়, গা ঢেলে লম্বা ঘুম! সবাই নিন্দে করতে লাগল অধরের। নিতান্তই পাশবদ্ধ জীব, ত্রিনাথের এলাকায় এসেও ত্রাণ নেই।
কিন্তু ক্লান্তিহরণের কণ্ঠে অপূর্ব করুণা। স্নেহশান্ত স্বরে বললেন ঠাকুর, 'তোরা কি বুঝবি রে? এ মায়ের ক্ষেত্র, শান্তি-ক্ষেত্র। ওরা এখানে এসে বিষয়-কথা না বলে ঘুমুচ্ছে, সে অনেক ভালো। তবু একটু শান্তি পাচ্ছে!'
কৃষ্ণধন নামে এক রসিক ব্রাহ্মণ আসে দক্ষিণেশ্বরে। সারাক্ষণ কেবল ফষ্টি-নষ্টি করে।
'কি সামান্য ঐহিক বিষয় নিয়ে তুমি রাত-দিন ফষ্টি-নষ্টি করে সময় কাটাচ্ছ? ঐটি ঈশ্বরের দিকে মোড় ফিরিয়ে দাও। শোনো, যে নুনের হিসেব করতে পারে, সে মিছরিরও হিসেব করতে পারে।'

কৃষ্ণধন সহাস্যে বললে, 'আপনি টেনে নিন।'
'আমি কি করব! তোমার চেষ্টার উপর সব নির্ভর করছে। এ মন্ত্র নয়, এ মন তোর!'
'কি করতে হবে বলুন—'
'সামান্য রসিকতা ছেড়ে ঈশ্বরের পথে এগিয়ে পড়ো। ঈশ্বরই সব চেয়ে বড় রসিক, তাঁর তত্ত্বটিই হচ্ছে সব চেয়ে বড় রসিকতা। সেই রসিকতার সন্ধান করো। শুধু এগিয়ে পড়ো—'
'এ পথের আর শেষ নেই—'
'কিন্তু চলতে-চলতে যেখানেই শান্তি, সেখানে "তিষ্ঠ"। সেখানেই বিশ্রাম করে নাও।'
আহা, অধর সেন এখানে এসে শান্তিতে একটু বিশ্রাম করছে! ওকে জাগাস নে। ওকে ঘুমুতে দে একটু ঠান্ডা হয়ে!
কিন্তু যে সেবা করতে এসেছে তারই সেবায় লাগল নাকি রামকৃষ্ণ?
লাটুকে শিবমন্দিরে ধ্যান করতে পাঠিয়েছে রামকৃষ্ণ। ঢুকেছে সেই দুপুর বেলা, বিকেল হয়ে এল, লাটুর এখনো বেরুবার নাম নেই। কি করছে দেখে আয় তো রে। রামলালকে খোঁজ নিতে পাঠাল। রামলাল এসে বললে, এক গা ঘেমে আছে। নিথর পাথর! একখানা পাখা নিয়ে আয়। পাখা নিয়ে চলল রামকৃষ্ণ। আর, শোন্, এক প্লাশ জল চাই ঠান্ডা। জল নিয়ে গিয়ে রামলাল দেখে, রামকৃষ্ণ লাটুকে হাওয়া করছে। আর পাখার হাওয়ায় লাটুর শরীর কাঁপছে, তুলো যেমন কাঁপে তেমনি।
'ওরে বেলা যে আর নেই। সন্ধে-টন্ধে কখন সাজাবি?' রামকৃষ্ণের আওয়াজে লাটুর ধ্যান ভাঙল। চোখ চেয়ে দেখল যাকে ধরবার জন্যে মহাশূন্যে পাখা মেলেছিল তিনিই পাখা হাতে করে পাশটিতে বসে আছেন। সস্নেহে বাতাস করছেন মা'র মত। ব্যস্ত হয়ে উঠতে চাইল আসন ছেড়ে। রামকৃষ্ণ বললে, 'আগে একটু সুস্থ হ, তার পরে উঠিস। দেখছিস না, গরমে কেমন ঘেমে গেছিস।'
'আপুনি এ কী করছেন! এতে হামার অকল্যাণ হবে।'
হাসল রামকৃষ্ণ। বললে, 'তোর কে সেবা করছে? তোর মধ্যে যে শিব এসেছিলেন তাঁর সেবা করছিলুম। গরমে যে তাঁর কষ্ট হচ্ছিল। নে, এখন এই এক গেলাশ জল খা দিকিনি—'
জড়ভরত রাজার পালকি বইছে। রাজা পালকি হতে নেমে এসে বললে, 'তুমি কে গো?'
জড়ভরত বললে, 'আমি নেতি।'
'সে আবার কি?'
'আমি শুদ্ধ আত্মা।'
যেমন বাতাস। ভালো-মন্দ সব গন্ধই বাতাস নিয়ে আসে কিন্তু বাতাস নির্লিপ্ত। যেমন প্রদীপ। প্রদীপের সামনে বসে কেউ ভাগবত পড়ে, কেউ বা দলিল জাল করে। প্রদীপ নির্লিপ্ত। যেমন সূর্য। শিষ্টকেও আলো দিচ্ছে দুষ্টকেও আলো

দিচ্ছে। ধোঁয়া যতই কালো হোক দেয়ালকে ময়লা করতে পারে, আকাশকে নয়। চামড়া-ঢাকা অখণ্ড খোলের মধ্যে খোঁজো সেই প্রাণস্বরূপে। হাড়মাসের খাঁচার মধ্যে ধরো সেই পলাতক পাখি!
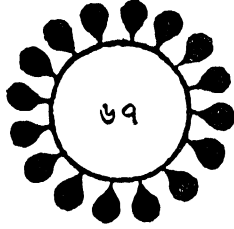
রাম দত্তের বাড়ি, মধু রায়ের গলিতে, রামকৃষ্ণ এসেছে।

কলকাতাকে বড় ভয়, বড় সম্ভ্রম রামকৃষ্ণের। সব জ্ঞানী-গুণীর বাসা এখানে। রাজা-রাজড়া সুখী-ভোগীদের আস্তানা। পাড়াগাঁয়ের আলাভোলা ছেলে আমি, এখানে কি কলকে পাব? আমাকে কি কেউ খাতির-যত্ন করবে?

ঠাকুরের তখন হাত ভেঙেছে, দেবেন্দ্র মজুমদার দেখতে এসেছে দক্ষিণেশ্বরে। পরনে লাল-পাড় কাপড়, ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা হাত গলার সঙ্গে ঝোলানো, ঠাকুর বসে আছেন তক্তপোশে। দেবেন্দ্রকে জিগগেস করলেন, 'কোত্থেকে আসা হচ্ছে?'

'কলকাতা থেকে।'

কলকাতার নাম শুনে যেন শিউরে উঠলেন ঠাকুর। নিশ্চয়ই তবে একজন গন্যিমান্যি লোক।

'কী দেখতে এসেছ? এমনি—?' বলে ঠাকুর হাতের পর হাত রেখে ত্রিভঙ্গবঙ্কিম কৃষ্ণের ভঙ্গি করলেন।

'না, শুধু আপনাকে দেখতে এসেছি।' কণ্ঠস্বরে যেন ভক্তির সুরটি পাওয়া গেল।

ঠাকুরের গলায় কান্না ফুটে উঠল: 'আর আমায় কী দেখবে বলো! পড়ে গিয়ে আমার হাত ভেঙে গিয়েছে! দেখ দেখি সত্যি ভেঙেছে কিনা! বড় যন্ত্রণা। কি করি?' হাতখানি বাড়িয়ে দেবার ইঙ্গিত করলেন। দেবেন্দ্র স্পর্শ করল সেই হাত। একটু বা টিপে-টিপে দেখল। জিগগেস করল, 'কি করে ভাঙল?'

কাঁদ-কাঁদ মুখে ঠাকুর বললেন, 'কি একটা অবস্থা হয়, তাইতে পড়ে গিয়ে ভেঙে গিয়েছে। ওষুধ দিলে আবার বাড়ে। অধর সেন ওষুধ দিয়েছিল, বেশি করে ফুলে উঠল। তাই আর কিছু দিইনি। হাঁ গা, সারবে তো?'

যিনি সকলের ব্যথা সারান তাঁরই কণ্ঠে ব্যথার জিজ্ঞাসা।

'আজ্ঞে সেরে যাবে বৈ কি। নিশ্চয় সারবে।' দেবেন্দ্র জোরের সঙ্গে বললে।

আহ্লাদে শিশুর মতন হয়ে গেলেন ঠাকুর। আর সকলকে উদ্দেশ করে বলতে

লাগলেন : 'ওগো, ইনি বলছেন আমার হাত সেরে যাবে। আর ভয় নেই। ইনি যেমন-তেমন লোক নন। ইনি কলকাতা থেকে এসেছেন!'
কলকাতা সম্বন্ধে এত তাঁর ভয়-ভক্তি। সেই কলকাতায় তিনি এসেছেন বিদ্বৎ সমাজে! বসেছেন তাদের বৈঠকখানায়। শেষে চাতরে না হাঁড়ি ভাঙে!
মা গো, পাশে এসে বোস্। রাশ ঠেলে দে।
রামকৃষ্ণের চোখের দিকে চেয়ে মা হাসেন মিটি-মিটি।
রাম দত্তের হাঁপানি, তাই নিয়ে সে ছুটোছুটি করছে। এসেছে সুরেশ মিত্তির, ভাবে বিভোর হয়ে টলছে মাতালের মত। গায়ে জামা নেই গলায় পৈতে, এক পাশে এসে বসেছে দেবেন মজুমদার। গ্যাস জ্বলছে ঘরে। তাতে আর কতটুকু আলো হবে! রামকৃষ্ণের গায়ের আলোয় মধুরায়ের গলি ভেসে যাচ্ছে। আকাশের সুধাকর এসেছেন নগরের ধূলির নিকেতনে।
ওরে, রাম দত্তের বাড়িতে দক্ষিণেশ্বরের সেই সাধু এসেছে। চল দেখবি চল। রাস্তায় কর্পোরেশনের বাতি নেই, সাধুই নাকি সব অলি-গলি আলো করে বসেছে! একটি সহজসুন্দর মানুষ। ঘরছাড়া হয়েও যেন ঘরের লোক। গালে একটু-একটু কপচানো দাড়ি, চোখের পাতা অনবরত মিটমিট করছে—
ওরে, ভালো করে চেয়ে দ্যাখ, কমলবিশদনেত্র ক্লেশনাশন কেশব বসে আছেন। সর্ববান্ধবস্বরূপ দীনবন্ধু।
কলকাতায় এসেছে, তাই গায়ে জামা পরে এসেছে। জামার আস্তিন কনুই আর কব্জির মাঝখানে। রঙিন একটি বটুয়া সামনে। তারই থেকে একটু মশলা নিয়ে মুখে দিচ্ছে মাঝে-মাঝে। কতক্ষণ আর থাকা যায় কঠোর ভদ্রলোক সেজে? গায়ের জামা খুলে ফেলল রামকৃষ্ণ। এমনি যে আভা ছিল তার শতগুণ বিভা বেরুচ্ছে গা থেকে। সুধাকরের বদলে নেমে এসেছে প্রভাতের দিবাকর। নখজ্যোতিতেই যেন শরদিন্দুর দীপ্তি গায়ের আলো বহু দূর ছড়িয়ে পড়েছে। একটি স্থিরস্ফুট বিদ্যুৎ যেন চিরজীবী হয়ে আছে আকাশে।
বহু লোক এসে জমায়েৎ হয়েছে। ঘর ছাপিয়ে ভিড় করেছে রোয়াকে, রোয়াক ছেড়ে রাস্তায়। অথচ সবাই স্তব্ধ, অভিভূত। বিস্ময়বিভোর।
এ কে বল দেখি? দরিদ্রের মধ্যে রাজরাজেশ্বর! মর্তধামে ত্রিলোকপালক! যিনি শ্মশানে ভূতনাথ তিনিই আবার গৃহে জগদগুরু।
কথা ক' না! প্রশ্ন কর্। যার যা জিগগেস করবার আছে জেনে নে।
কেউই প্রশ্ন করে না। প্রশ্ন করবার কথা মনেও হয় না কারুর। শুধু এই মনে হয়, অশেষ প্রশ্নের শেষ উত্তরটি যেন জীবন্ত হয়ে জ্বলন্ত হয়ে বসে আছে। গভীর উপলব্ধির সহজ একটি উচ্চারণ। বসে আছে বাকপতি, বিবুধেশ্বর। বাক্য দিয়ে শুধু হরিনামের মালা গাঁথা। তাই যা বাক্য তাই কাব্য।
নিজের মনেই বলে যাচ্ছে রামকৃষ্ণ। বলছে ঈশ্বরপ্রসঙ্গ। সতৃষ্ণকর্ণে তাই শুনছে সকলে। কোনো তর্ক-বিচার করছে না। যা বলছে তাই যেন চরাচরের চরম কথা। এর পরে আর বিষয় নেই, বর্ণনা নেই। পারাপার নেই। যা শুনছে

তাই নিঃসন্দেহে মানছে সকলে। কি যে শুনছে মনে ধরে রাখতে পারছে না, তবু মন বলছে এ অত্যন্ত খাঁটি কথা, এ কথার আর ওর নেই।
কথা বলতে-বলতে মাঝে-মাঝে থামছে রামকৃষ্ণ। তখনই সবাই শ্রবণতৃষ্ণায় অস্থির হয়ে উঠছে। রামকৃষ্ণের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকছে নিষ্প্রাণের মত। কথা কও, তুমি সর্বমন্ত্রপ্রণেতা, তোমার কথায় নিশ্চল নিস্তব্ধতায় প্রাণসঞ্চার করো। অথচ কী সরল কথা! পণ্ডিতগিরি ফলানো নেই এতটুকু। এতটুকু বক্তৃতা মারা নেই। লঘুতা-প্রগলভতা নেই। সহজের সংবাদটি সহজ করে পরিবেশন করছেন।
'আগে শাদাসিধে জ্বর হত, সামান্য পাচনেই সেরে যেত। এখন যেমন ম্যালেরিয়া জ্বর, তেমনি ওষুধও ডি-গুপ্ত! আগে লোকে যোগ-যাগ তপস্যা করত, এখন কলির জীব, দুর্বল, অন্নগত প্রাণ—এক হরিনামই তার সম্বল। হরিনামেই সে পেরিয়ে যাবে ভবনদী। নামও করো, সঙ্গে-সঙ্গে প্রার্থনাও করো, দুদিনের জিনিসের উপর থেকে ভালোবাসা যেন কমে যায়। দুদিনের জিনিস মানে টাকা, মান, যশ, দেহসুখ। টাকার জন্যে যেমন ঘাম বার করো, হরিনাম করে নেচে গেয়ে ঘাম বার করতে পারো তো বুঝি।'
তার পর গান ধরে রামকৃষ্ণ।

'নামেরই ভরসা কেবল শ্যামা গো তোমার।
কাজ কি আমার কোশাকুশি দেঁতোর হাসি লোকাচার!
নামেতে কালপাশ কাটে, জটে তা দিয়েছে রটে;
আমি তো সেই জটের মুটে, হয়েছি আর হব কার॥'

এ তো গান নয়, শিবের জটা ছেড়ে গঙ্গার মর্তাবতরণ।
'জানতে, অজানতে বা ভ্রান্তে যে কোনো ভাবেই হোক না কেন, তাঁর নাম করলেই ফল হবে।' আবার কথা শুরু করলে রামকৃষ্ণ : 'কেউ তেল মেখে নাইতে যায়, তারও যেমন স্নান হয়, যদি কাউকে জলে ঠেলে ফেলে দেওয়া হয় তারও তেমনি স্নান হয়। আর কেউ ঘরে শুয়ে আছে, তার গায়ে জল ঢেলে দিলে তারও স্নানের কাজ হয়ে যায়। নিতাই তাই কোনো রকমে হরিনাম করিয়ে নিতেন। চৈতন্যদেব বলেছিলেন, ঈশ্বরের নামের ভারি মাহাত্ম্য। তক্ষুনি-তক্ষুনি ফল না পেলেও এক সময়ে না এক সময়ে পাবেই। বাড়ির কার্নিশে যদি বীজ পড়ে, অনেক দিন পরে বাড়ি পড়ে গেলেও সেই বীজ মাটিতে পড়ে গাছ হয়ে তার ফল হবে।'
রাত হয়ে গেল কিন্তু বাড়ি ফেরবার কারু নাম নেই। খিদে পেয়েছে তেষ্টা পেয়েছে এ অত্যন্ত তুচ্ছ চিন্তা। এখন শুধু নয়নের তৃষ্ণা। জীবনের রাত অনেক হয়ে গেল বটে কিন্তু গৃহ বলতে এঁরই পদাশ্রয়। রামকৃষ্ণকে ছেড়ে কোথায় আবার আমাদের ঘর-বাড়ি?
হঠাৎ রামকৃষ্ণের সমাধি উপস্থিত হল।

পাড়া-বেপাড়ার ভিড় করা শহুরে লোকেরা দেখুক তা চর্মচক্ষে।
রামকৃষ্ণের ডান হাতের মাঝের তিনটি আঙুল বেঁকে গেল, শক্ত ও সিধে হয়ে গেল হাত দুখানি। মোটেই দেহবিকারের লক্ষণ নয়, বিদেহবিহারের লক্ষণ।
রামকৃষ্ণ এখন দিব্য ভাবের দীপ্র মূর্তি। তার সঙ্গে ভাবনবনীর অমিয় লাবণ্য।
এ কি কর্পূরকুন্দেন্দুধবল শিব না রাজীবলোচন দূর্বাদলশ্যাম রাম!
দেবেন্দ্র মজুমদারের মনের মধ্যে গুরুস্তোত্রের শ্লোক গুঞ্জন করে ফিরতে লাগল :

'মন-বারণ-শাসন-অঙ্কুশ হে,
নরত্রাণ তরে হরি চাক্ষুষ হে।
গুণগানপরায়ণ দেবগণে,
গুরুদেব দয়া করো দীন জনে॥'

রামকৃষ্ণের ভাবের হাওয়া লেগে সবাইর মন মাটি ছেড়ে উড়তে লাগল আকাশে। ঘোর-ঘোর নেশা আর কাটতে চায় না। মন যেন আর থা পায় না মাটিতে। ভাবের বাতাসেই কেবল উড়তে চায়। উড়তে-উড়তেই যেন ধরতে পারবে কাউকে। সেই চিরকালের অধরাকে।
দেবেন্দ্র তখন পৌঁছে গেছে শেষ শ্লোকে :

'জয় সদ্‌গুরু ঈশ্বরপ্রাপক হে,
ভবরোগবিকারবিনাশক হে।
মন যেন রহে তব শ্রীচরণে,
গুরুদেব দয়া করো দীন জনে॥'
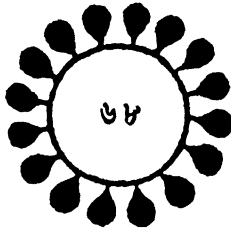
দক্ষিণেশ্বরে যিনি আছেন তাঁর আরেক নাম দক্ষিণ-ঈশ্বর।
রুদ্র, যত্তে দক্ষিণমুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্‌।
উত্তরে-দক্ষিণে পূবে-পশ্চিমে ডাক পাঠাচ্ছে রামকৃষ্ণ। কখনো নহবৎখানা থেকে, কখনো বা কুঠির ছাদের উপর উঠে। আরতির সময় ঘড়ি-ঘণ্টা বাজছে আর ডাকছে

রামকৃষ্ণ : ওরে তোরা কে কোথা আছিস চলে আয়। তোদের ছাড়া দিন আর কাটে না রে—

প্রথমে এল লাটু। দ্বিতীয় এল রাখাল।

রামকৃষ্ণ দেখল গোপাল এসেছে। পায়ে নূপুর বাজছে ঝুম-ঝুম। 'আয়, আয়—' হাত বাড়িয়ে দিল রামকৃষ্ণ। আর রাখাল দেখল স্নেহ-শান্তির সুধাসত্র বিছিয়ে মা বসে আছেন। ঝাঁপিয়ে পড়ল কোলের মধ্যে।

কখনো তার গায়ে হাত বুলোয় রামকৃষ্ণ, কখনো বা স্তন্য পান করায়। গদগদভাবে কখনো বা ডাকে, গোপাল, গোপাল; কখনো বা যদি দেখতে না পায়, গলা ছেড়ে কান্না ধরে, আমার ব্রজের রাখাল কোথায় গেলি?

যখন আসে ক্ষীর-ননী খাওয়ায়, কত খেলা দেয়, কখনো বা কাঁধে করে নাচে। আঠারো বছরের জোয়ান মরদ, বিয়ে করেছে, মনে হয় যেন অবোলা শিশু।

পড়াশোনায় মন নেই, মানে না গুরুজনদের। সব চেয়ে আশ্চর্য, নতুন বিয়ে করেছে, অথচ শ্বশুরবাড়ি যায় না। কান্তিমতী কিশোরী স্ত্রী, এতটুকু টান নেই। 'কোথায় যাস তুই রোজ-রোজ?' বাপ হুঙ্কার করে উঠল।

ব্রাহ্মসমাজে যেত খুব আগে-আগে। সেখানকার প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করে এসেছে নিরাকার ও অদ্বিতীয় ব্রহ্ম ছাড়া আর কারু ভজনা করব না। এ সবে তত আপত্তি ছিল না আনন্দমোহনের। কিন্তু তিনি তো জানেন কোথায় আজকাল ছেলের গতিবিধি। ব্রাহ্মসমাজে মিশে কেউ তো আর বিবাগী হয় না, কিন্তু যেখানে এখন সে যাওয়া-আসা শুরু করেছে সেখানে যে এক বিশ্বভোলা বাউণ্ডুলের বাসা। আজব কারখানা। ওখানে গেলে আর মানুষ হতে হবে না, রাখালিই করতে হবে সারা জীবন।

'খবরদার, আর যেতে পারবি না ওখানে!' ছেলেকে ঘরের মধ্যে বন্ধ করল আনন্দ-মোহন। বসিরহাটের শিকরা গাঁয়ের বলদৃপ্ত জমিদার, অগাধ পয়সার মালিক, তার ছেলে কিনা পথে-পথে ভেসে বেড়াবে! কখনোই না। থাক ঐ ঘরের মধ্যে বন্দী হয়ে।

এদিকে বৎসহারা গাভীর মত কাঁদছে রামকৃষ্ণ। ওরে রাখাল, কোথায় গেলি? তোকে না দেখে যে থাকতে পারছি না। মা'র মন্দিরে গিয়ে কাকুতি-মিনতি করছে : মা, আমার রাখালকে এনে দাও। রাখালকে না দেখে বুক ফেটে যাচ্ছে—

খাঁচায় পোরা বনের পাখির মত পাখা ঝাপটাচ্ছে রাখাল। বন্ধ ঘরে ছটফট করছে।

সেদিন কি দয়া হয়েছে, আনন্দমোহন ছেলেকে বন্ধ ঘরে না রেখে নিজের চোখের সামনে বসিয়ে রেখেছে। নজরবন্দী করে রেখেছে। নিজে নিবিষ্ট মনে দেখছে কি সব নথি-পত্র। বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে জটিল মামলা, কাগজপত্রও পর্বতপ্রমাণ।

তেরছা চোখে বাপকে একবার দেখল রাখাল। দেখল, কাগজের মধ্যে ডুবে আছেন, কাগজ ছাড়া আর কিছুতে লক্ষ্য নেই। টুপ করে সরে পড়ল আলগোছে। নিজের দেহের ছায়াটিকে পর্যন্ত জানতে না দিয়ে। পথে নেমেই দে-ছুট। একেবারে দক্ষিণেশ্বর।

'রাখাল, রাখাল—' কান্নার স্বর দূর থেকে রাখাল শুনতে পাচ্ছে।
'আমি এসেছি। আমি এসেছি। এই যে আমি।' রামকৃষ্ণের প্রসারিত বাহুর মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল রাখাল।
এই মোকদ্দমায় আর জেতবার কোনো আশা নেই। নথির থেকে মুখ তুলল আনন্দমোহন। এ কি! রাখাল কোথায়? রাখাল কোথায় গেল।
আর কোথায় গেল! ছাঁদন-দড়ি খুলে দেবার পর বাছুর আবার যায় কোথায়! এখন কোর্টের বেলা হয়ে গেছে, এখন আর ছেলের পিছু ছোটা যায় না দক্ষিণেশ্বর। সন্ধের পর ব্যবস্থা করতে হবে। এবার ফিরিয়ে এনে সত্যি-সত্যি লোহার বেড়ি পরিয়ে দেব। যৌবনের সোনার শৃঙ্খলে সে বশ মানেনি।
কিন্তু মামলায় হঠাৎ উলটো রকম ফল হয়ে গেল। ঘূণাক্ষরেও ভাবেনি, মামলায় ডিক্রি পেল আনন্দমোহন।
ছেলের সাধুসঙ্গের জোরেই ঘটেনি তো এই ফললাভ? কে জানে!
ছেলেকে ফিরিয়ে আনতে দক্ষিণেশ্বরের দিকে যাচ্ছে বটে আনন্দমোহন, কিন্তু মনের মধ্যে আর তাড়ন-পীড়নের তাপ নেই। তার প্রথম পক্ষের সন্তান রাখাল। কত ভোগবিলাসে মানুষ। তার কিনা সইবে ও-সব অনাসৃষ্টি? ভুলিয়ে-ভালিয়ে যেমন করে হোক মনের মোড় ঘুরিয়ে দিতে হবে। ফিরিয়ে আনতে হবে ঐ বিপথগামীকে।
'ওরে রাখাল, ঐ তোর বাপ আসছে বুঝি।' রামকৃষ্ণ যেন ভয় পাবার মত করে বললে। 'দ্যাখ দেখি তাকিয়ে—'
তা ছাড়া আবার কে! ঐ তো আনন্দমোহন। দূর থেকে ঠিক চিনেছে রামকৃষ্ণ।
বাপের আভাস পেয়ে রাখালের মুখ এতটুকু হয়ে গেল। বললে, আমি কোথাও গিয়ে লুকোই। নইলে বাবা আমাকে ঠিক ধরে নিয়ে যাবে। আর আসতে দেবে না।
'ভয় কি! আসুক না!' রামকৃষ্ণ অভয় দিলে। 'বাপ তো সাক্ষাৎ দেবতা। তাকে আবার ভয় কিসের! সামনে এলে বেশ ভক্তিভরে প্রণাম করবি। মা'র ইচ্ছে হলে কী না হতে পারে—'
আনন্দমোহনকে খুব সমাদর করে বসাল রামকৃষ্ণ। রাখালও দেহ-মন ঢেলে বাবাকে প্রণাম করলে।
কত গুণ আমার রাখালের! কেমন দিব্যগন্ধময় তার সত্তা। সর্ব তীর্থে তার স্নান, সর্ব যজ্ঞে তার দীক্ষা। ও হচ্ছে ব্রহ্মশ্রোতা, ব্রহ্মমন্তা ছেলে। রাখালের প্রশংসা করতে লাগল রামকৃষ্ণ। শুধু কি প্রশংসা? প্রতিটি কথার অন্তরালে সীমাহীন স্নেহ। কূলহীন ভালোবাসা।
ছেলের মুখের দিকে তাকাল আনন্দমোহন। আনন্দে জ্বলছে রাখালের চোখ দুটি। হয়তো ভালো করে খায়নি, কে জানে সারা দিন উপোস করেই আছে কিনা—তবু যেন আনন্দের প্রতিমূর্তি।
'বাবা, ক্যা ভোজন হুয়া?' এক সাধুকে জিগগেস করলে একজন।

'আজ মালিক নেহি মিলায়ে।' বললে সেই সাধু, 'আজ রামজীকি ইচ্ছাই হ্যায় ভোজন মিলনে নেহি হ্যায়। আজ আনন্দই হ্যায়—'
সর্বাবস্থায় সদানন্দ। এই আনন্দের হাট থেকে আমার তোলা বন্ধ করে দিও না।
কেমন যেন হয়ে গেল আনন্দমোহন। ছেলেকে পারল না ফিরিয়ে নিতে। শুধু রামকৃষ্ণকে বললে, 'মাঝে-মাঝে এক-আধবার পাঠিয়ে দেবেন দয়া করে।'
তাই সেই অনুরোধই এখন করছে রামকৃষ্ণ। ওরে, অনেক দিন হয়ে গেল, এখন একবার বাড়ি গিয়ে বাপকে দেখা দিয়ে আয়। যদি এক্কেবারে না যাস, কেলেঙ্কারি হবে, তোকে চিরদিনের মত আটকে রাখবে, আর তোকে আসতে দেবে না।
তুইয়ে-তাইয়ে পাঠিয়ে দেয় বাড়িতে।
দুদিন যেতে না যেতেই ফের ফিরে আসে। বাপের চোখের উপর দিয়েই ফিরে আসে। আনন্দমোহনের কেমন ধারণা হয়েছে এ সাধুকে ছেড়ে দেওয়া ঠিক হবে না। এর আস্তানায় অনেক গণ্যমান্য লোক যাতায়াত করছে। ওর এখন বিস্তর নামডাক। এর কৃপাতেই মামলাতে সুফল হয়েছিল। বলা যায় না, লেগে থাকলে কোন না আবার সুবিধে হবে!
রাখালের খোঁজে নিজেও দু-এক দিন চলে আসে আনন্দমোহন।
রামকৃষ্ণ খুব খাতির-যত্ন করে। আগে-আগে শুধু ছেলের প্রশংসা করত এখন বাপেরও প্রশংসা করে। বলে, 'যেমন ওল তেমন মুখীটি তো হবে। গাছটি রসালো বলেই তো ফলটি মিঠে।'
'এমনি করেই রাখালের বাবার মন খুশি রাখতেন।' বললেন একদিন শ্রীমা : 'রাখালের বাবা এলেই যত্ন করে এটি-ওটি দেখাতেন, খাওয়াতেন, কত কথা যে বলতেন তার শেষ নেই। মনে ভয়, পাছে রাখালটিকে ওখানে না রাখে, নিয়ে যায়। রাখালের সৎ-মা ছিল। সে যখন দক্ষিণেশ্বরে আসত, ঠাকুর রাখালকে বলতেন, ওরে ওঁকে ভালো করে সব দ্যাখা, শোনা, যত্ন কর্—তবেই তো জানবে ছেলে আমাকে ভালোবাসে।'
একবার রামলালাকে ধরেছিল, এখন ধরল বালগোপালকে। আগে ছিল অষ্টধাতুর বিগ্রহ এখন সপ্তধাতুর মানুষ। আগে ছিল মনোমূর্তি, এখন মানস-পুত্র।
'ভারি খিদে পেয়েছে।' রাখাল বললে এসে রামকৃষ্ণকে। যেমন আবদারে ছেলে মাকে এসে বলে। খিদে পেয়েছে! কি সর্বনাশ, এখন তোকে খেতে দিই কি! ঘরে খাবার নেই, দোকানও বা কই এখানে কাছে-ভিতে! এখন করি কি, যাই কোথায়! আমার রাখালের যে খিদে পেয়েছে! উতলা হয়ে গঙ্গার ধারে চলে এল রামকৃষ্ণ। গলা ছেড়ে কান্নার সুরে ডাকতে লাগল : 'ও গৌরদাসী, এস, আমার রাখালের খিদে পেয়েছে।'
বৃন্দাবনের সন্ন্যাসিনী এই গৌরদাসী। বলরাম বসুর কাছে শুনেছে রামকৃষ্ণের কথা। সটান চলে এসেছে দক্ষিণেশ্বর। এসে দেখল রামকৃষ্ণ কোথায়, এ যে সেই গৌরহরি। সেই থেকে আছে তার পদচ্ছায়ে।
আচ্ছা, গৌরদাসী কি মেয়ে? রামকৃষ্ণ বলে, মেয়ে যদি সন্ন্যাসী হয় সে কখনো

মেয়ে নয়, সে পুরুষ। গৌরদাসীও তাই পুরুষ। অদম্য কর্মশক্তি। অভঙ্গ ব্রতে অসাধ্যসাধিকা।

রামকৃষ্ণ বলে, 'আমি জল ঢালছি, তুই কাদা মাখ।'

আমি ভাব দি, তুই তাকে আকার দে। আমার রূপকে তুই রীতিতে নিয়ে যা। আমার বস্তুকে নিয়ে যা আস্বাদে।

শ্রীমা যেবার রামেশ্বর থেকে ফিরলেন, তাঁকে জিগগেস করলে মেয়েরা, 'কি দেখে এলেন বলুন—'

'আমাকে তারা লেকচার দিতে বললে।' শ্রীমা একটু হাসলেন। 'বললাম আমি লেকচার দিতে জানি না। যদি গৌরদাসী আসত তবে দিত।' একটু থেমে আবার বললেন, 'যে বড় হয় সে একটিই হয়। তার সঙ্গে অন্যের তুলনা হয় না। সে আমাদের গৌরদাসী।'

সেই গৌরদাসীকে লক্ষ্য করে কাঁদছে রামকৃষ্ণ। ওরে আয়, অসাধ্যসাধন করে দিয়ে যা। ঘরে এক দানা খাবার নেই। আমার রাখালকে কিছু খাবার দিয়ে যা শিগগির। তুই না হলে এ অসম্ভব কে সম্ভব করবে?

চাঁদনি ঘাটে নৌকো লাগল। কে তোরা কোত্থেকে আসছিস? পথে আমার গৌরদাসীকে দেখেছিস কেউ? নৌকোর মধ্যেই তো গৌরদাসী। সঙ্গে বলরাম বোস। আরো কয়েকজন ভক্ত। সবাই এসে পড়েছে এক ডাকে। একে-একে নামতে লাগল। গৌরদাসীও নামল। গৌরদাসীর হাতে খাবারের পুঁটলি।

'ওরে, রাখাল, আয়, ছুটে আয়, খাবার খাবি আয়। তোর জন্যে খাবার নিয়ে এসেছে গৌরদাসী।' ব্যাকুল হয়ে ডাকতে লাগল রামকৃষ্ণ।

রাখাল কাছে এসে মুখ ভার করে রইল। বললে, 'খাব না।'

'সে কি রে? এই না বলছিলি খিদে পেয়েছে!'

'বলেছিলাম তো বলেছিলাম! তাই বলে চার দিকে ঢাক পেটাতে হবে নাকি?'

'আহাহা, তাতে কি হয়েছে।' রাখালের পিঠে হাত বুলুতে লাগল রামকৃষ্ণ : 'তোর খিদে পেয়েছে, তোর খাবার চাই, এ কথা বললে দোষ কি! খিদে পাবার মধ্যে লজ্জা কিসের! আর, খিদে যখন পেয়েছে, তখন খেতে তো হবেই। এতে আবার রাগের কথা কি! নে, এখন খা।' রাখালকে খাইয়ে দিতে লাগল রামকৃষ্ণ।

বড় করে হাঁ কর্। ভালো করে খা।

'কি অবস্থাই গেছে। মুখ করতুম আকাশ-পাতাল জোড়া আর মা বলতুম। যেন মাকে পাকড়ে আনছি। যেন জাল ফেলে মাছ হড়-হড় করে টেনে আনা।'

সেই গানে আছে না—

> 'খাব খাব বলি মা গো, উদরস্থ না করিব,
> এই হৃদিপদ্মে বসাইয়ে, মনোমানসে পূজিব।
> যদি বল কালী খেলে কালের হাতে ঠেকা যাব,
> আমার ভয় কি তাতে, কালী বলে কালেরে কলা দেখাব॥'
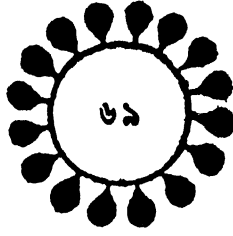
কামারপুকুরের লক্ষ্মণ পানকে দিয়ে রামকৃষ্ণ খবর পাঠাল সারদাকে।

'এখানে আমার কষ্ট হচ্ছে। রামলাল মা-কালীর পূজারী হয়ে বামুনের দলে মিশেছে, এখন আমাকে আর তত খোঁজ করে না। তুমি অবশ্য আসবে। ডুলি করে হোক, পাল্কি করে হোক, দশ টাকা লাগুক, বিশ টাকা লাগুক, আমি দেব।'

সারদার মন কেঁদে উঠল। ভাবল যদি পারি তো পাখি হয়ে উড়ে যাই।

লক্ষ্মণ পান আরো বললে। বললে, ঠাকুর ভাব-টাব হয়ে পড়ে থাকেন, সেদিকে রামলালের খোঁজ নেই। তার মনের ভাবখানা হচ্ছে, কালীঘরের থাকিয়ে পুজোরী হয়েছি, আর আমাকে পায় কে। এদিকে মা-কালীর প্রসাদ শুকনো হয়ে রয়েছে, দেখেও দেখছে না।

যেমন চালাও তেমনি চলি। যদি দূরে রাখো, দূরে থাকি; যদি কাছে ডাকো, ডাক শোনবার জন্যে কান খাড়া করে থাকি তোমার কাছে-কাছে।

ছোট তক্তপোশে তাকিয়া ঠেসান দিয়ে বসে আছেন ঠাকুর। মেঝেতে ভক্তদল। হেসে-হেসে ঠাকুর বলছেন ভক্তদের, 'হাজার বিচার করো, আর যাই কেননা বলো, তবু তাঁর অন্ডারে আমরা আছি।'

মাস্টার মশাই বলেন, 'সেই দিন থেকে অন্ডার কথাটি শিখলাম—'

'তিনি তো আর আমাদের হাতে পড়েননি, আমরাই তাঁর হাতে পড়েছি।' বললেন ঠাকুর।

তেমনি আমি পড়েছি তোমার হাতে। আমি আমার বাঁশি শূন্য করে রেখেছি, তুমি যেমন বাজাও তেমনি বাজব।

সারদা চলে এল দক্ষিণেশ্বর। ঢুকল নবতে।

ছোট্ট এই একটুখানি ঘর। ঢোকবার দরজাটিও ছোট। ঢুকতে প্রায়ই মাথা ঠুকে যায় সারদার। এক দিন তো কেটেই গেল রীতিমত। ক্রমশ অভ্যেস হয়ে এল। দরজার সামনে আপনা হতেই নুয়ে পড়ে মাথা। হে প্রবেশপথের দারুদেবতা, ভক্তিমতীর প্রণাম নাও।

সামনে একটু বারান্দা, দরমার বেড়া দেওয়া। ঐ তো ঘর, তার মধ্যেই সমস্ত সংসার। রাজ্যের জিনিসপত্র। রাঁধবার সাজ-সরঞ্জাম, হাঁড়ি-কুড়ি, বাসন-কোশন। জলের জালা, রামকৃষ্ণের জন্যে হাঁড়িতে মাছ জিয়োনো। শিকেতে ভক্তদের জন্যে খাবার-দাবার।

আবার লক্ষ্মী এসেছে সঙ্গে। সেও থাকে এই নবতের ঘরে। রাত্রে মাথার উপর মাছের হাঁড়ি কলকল করে, লক্ষ্মীর ঘুম আসে না।
শুধুই কি লক্ষ্মী? কলকাতা থেকে স্ত্রী-ভক্ত যদি কেউ আসে সেই ঘরেই রাত কাটিয়ে যায়। গৌরদাসীর তো কথাই নেই। তার আবার সেই ঘরেই ভাব হয়। থেকে-থেকে 'নিত্য কোথায়' 'নিত্যগোপাল কোথায়' বলে নৃত্য করতে থাকে।
'কে জানে তোমার নিত্য কোথায়?' সারদার কণ্ঠস্বরে হয়তো ঈষৎ ঝাঁজ ফোটে : 'দেখ গে, গঙ্গার ধারে-টারে ভাব হয়ে রয়েছে হয়তো।'
কলকাতা থেকে স্ত্রী-ভক্তরা যারা দেখতে আসে, দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে বলে, 'আহা, কি ঘরেই আমাদের সীতা লক্ষ্মী আছেন গো! যেন বনবাস গো!'
সত্যিই সীতা-লক্ষ্মী। পরনে কস্তা পেড়ে শাড়ি, সিঁথে-ভরা সিঁদুর। কালো ভরাট মাথার চুল প্রায় পা পর্যন্ত পড়েছে। গলায় সোনার কণ্ঠীহার। কানে মাকড়ি। হাতে চুড়ি, যে চুড়ি রামকৃষ্ণের মধুর ভাবের সময় গড়িয়ে দিয়েছিলেন মথুরবাবু।
তার উপরে আবার নাকে নথ। নিজের নাকের কাছে আঙুল ঘুরিয়ে গোল চিহ্ন দেখিয়ে সারদাকে রামকৃষ্ণ বোঝায় ইশারায়।
নবতকে বলে খাঁচা। লক্ষ্মী আর সারদাকে শুকসারী। কালীঘরের প্রসাদ এলে রামলালকে বলে, 'ওরে খাঁচায় শুকসারী আছে, ফলমূল ছোলাটোলা কিছু দিয়ে আয়।'
বাইরের লোক যারা শোনে, ভাবে, খাঁচায় বুঝি সত্যি-সত্যি পাখি আছে রামকৃষ্ণের।
রাত্রে তো বেশি ঘুম নেই, অন্ধকার থাকতে-থাকতেই উঠে পড়ে রামকৃষ্ণ। বেড়াতে-বেড়াতে নবতের দিকে চলে আসে। হাঁক পাড়ে: 'ও লক্ষ্মী, ওঠরে ওঠ। তোর খুড়িকে তোল রে। আর কত ঘুমুবি? রাত পোহাতে চলল। মা'র নাম কর।'
শীতের রাত। এক-এক দিন বিছানা ছাড়তে মন ওঠে না। লেপের ভিতরে কুঁকড়ি-সুকড়ি হয়ে সারদা আস্তে-আস্তে লক্ষ্মীকে বলে, 'চুপ কর, সাড়া দিসনি। নিজের চোখে তো ঘুম নেই! এখনো সময় হয়নি ওঠবার। কাক-কোকিল ডাকেনি এখনো—'
সাড়া না পেয়ে সরে যাবার লোক নয় রামকৃষ্ণ। দরজার ফাঁক দিয়ে জল ছিটোয় বিছানায়।
নইলে এমনিতে রাত চারটের সময় উঠে সারদা স্নান করে নেয় গঙ্গায়। বিকেলে নবতের সিঁড়িতে যেটুকু রোদ পড়ে তাইতে চুল শুকোয়। যোগেনের চুল-বাঁধাটি ভারি পছন্দ। যোগেন এলেই বলে বেঁধে দিতে।
যোগেনকে বলতে হয় না। সে নিজের থেকে বসে সেই চুলের কাঁড়ি নিয়ে। পাঁচ আঙুলে চুলের গোছা সামলাতে পারে না।
মা যে আমার আলুলায়িতকুন্তলা। থাকেন ক্ষুদ্র নবতে, কিন্তু আসলে ভুবনেশ্বরী। সর্বানন্দকরী, প্রসন্নাস্যা। ক্ষিতীশমুকুটলক্ষ্মী।
'কার ধ্যান করছিস রে লেটো?'

যার ধ্যান করছে সে তো চোখের সামনে। লাটু আসন ছেড়ে উঠে পড়ল।
'শোন, ঐ নবত-ঘরে সাক্ষাৎ ভগবতী আছেন, তাঁর রুটি বেলে দে গে।'
বিবেকানন্দের ভাষায়, জ্যান্ত দুর্গা। আমেরিকা থেকে শিবানন্দকে চিঠি লিখছেন স্বামীজী : 'দাদা, বিশ্বাস বড় ধন। দাদা, জ্যান্ত দুর্গা পূজা দেখাব, তবে আমার নাম। তুমি জমি কিনে জ্যান্ত দুর্গামাকে যেদিন বসিয়ে দেবে সেই দিন আমি একবার হাঁপ ছাড়ব। তার আগে আর আমি দেশে ফিরছি না।'
ফল-মিষ্টি দেদার বিলোচ্ছে সারদা। লোকদের বিলিয়ে দিতে পারলে আর তার কথা নেই। তার এই সদাব্রত দেখে রামকৃষ্ণ ঈষৎ বিরক্ত হল বোধ হয়। বললে, 'অত খরচ করলে কি চলবে?'
একটু বুঝি অভিমান হল সারদার। তার সমুখ থেকে চলে যাবার ভঙ্গিটিতে বুঝি সেই ভাবই ফুটে উঠেছে।
ব্যস্তসমস্ত হয়ে উঠল রামকৃষ্ণ। রামলালকে ডেকে পাঠাল।
'ওরে তোর খুড়িকে গিয়ে শান্ত কর।'
'কি হয়েছে?'
'বোধ হয় রেগে গেছে।' একটু থামল রামকৃষ্ণ। বললে, 'ও রাগলে আমার সব নষ্ট হয়ে যাবে।'
রামকৃষ্ণ অগ্নি, সারদা দাহিকা। রামকৃষ্ণ জল, সারদা শীতলতা। রামকৃষ্ণ ব্রহ্ম, সারদা কালী।
রাখালের বালিকা-বউকে নিয়ে এসেছে মনোমোহনের মা। মনোমোহনের মা মানে রাখালের শাশুড়ি। রাখালের শ্বশুরবাড়ি রামকৃষ্ণের ভক্ত-পরিবার। কিন্তু তাই বলে রাখালের বউকে নিয়ে আসার মানে কি? রামকৃষ্ণের বুকের ভিতরটা ধক করে উঠল। রাখালকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার অভিসন্ধি নয় তো?
না, ব্যস্ত কি, রাখালই ফিরে-ফিরে যাবে সংসারে। তার ভোগের এখনো একটু বাকি আছে।
কিন্তু স্ত্রীর সংস্পর্শে রাখালের ঈশ্বরভক্তির হানি হবে না তো?
আয় তো মা, আয় তো এদিকে, তোকে একবারটি দেখি।
বিশ্বেশ্বরী এগিয়ে এল রামকৃষ্ণের কাছে। রামকৃষ্ণ তাকে দেখতে লাগল খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে। সুলক্ষণা, সুভূষণা মেয়ে।
সর্বঅঙ্গে দেবীশক্তি। ভয় নেই এতটুকু, স্বামীর ইষ্টপথে বিঘ্ন হবে না।
বললে, 'নবতে যাও, তোমার শাশুড়িকে প্রণাম করে এস।'
সারদাকে নবতে বলে পাঠাল রামকৃষ্ণ: 'টাকা দিয়ে যেন পুত্রবধূর মুখ দেখো।'
সিঁতিতে বেণী পালের বাগানে রাখালকে সঙ্গে করে বেড়াতে গিয়েছে রামকৃষ্ণ। কথা আছে, রাতটা থাকবে সেখানে।
সন্ধ্যের পর বাগানে একা-একা বেড়াচ্ছে রামকৃষ্ণ। সেখানে কতগুলো ভূতের সঙ্গে দেখা।
'তুমি এখানে এসেছ কেন?' ভূতগুলো কাৎরাতে লাগল : 'তোমার হাওয়া

'আমাদের সহ্য হচ্ছে না। আমরা জ্বলে গেলুম, জ্বলে গেলুম। তুমি চলে যাও এখান থেকে।'

খাওয়া-দাওয়ার পরেই গাড়ি আনতে বললে রামকৃষ্ণ।

সে কি কথা, আপনি না রাত্রে এখানে থাকবেন বলেছিলেন?

তা থাকা হল না। শুধু জীবিতের নয়, মৃতেরও আর্তি আছে।

'কিন্তু এত রাতে গাড়ি পাব কোথায়?'

'তা পাবে, দেখ গে।'

গাড়ি পাওয়া গেল সহজেই। সেই রাতেই ফিরে এল দক্ষিণেশ্বর।

জাগ-প্রদীপটির মতই জেগে আছে সারদা। গাড়ির শব্দ পেয়ে চমকে উঠল। কান পেতে শুনল রাখালের সঙ্গে কি কথা বলছে রামকৃষ্ণ। ওমা, কি হবে, যদি না খেয়ে এসে থাকেন, কি খেতে দেব এত রাতে? অন্য দিন কিছু না কিছু ঘরে থাকে, অন্তত একটু সুজি। কখন কি খেয়ালে খেতে চেয়ে বসেন ঠিক কি। কিন্তু আজ কী হবে? যদি বলেন, খিদে পেয়েছে?

রাত একটা, মন্দিরের ফটক বন্ধ হয়ে গেছে কখন। কি করে কে জানে ফটক খুলিয়ে নিল রামকৃষ্ণ। হাততালি দিয়ে ঠাকুর-দেবতার নাম করতে-করতে এগুতে লাগল। সঙ্গে-সঙ্গে তালি দিয়ে-দিয়ে রাখালও নাম করছে।

ঝি যদুর মাকে তোলাল সারদা। ও যদুর মা, কি হবে, উনি যে ফিরে এলেন! যদি বলেন, খাইনি কিছু, খেতে দাও?

মনের আকুলতাটি বুঝতে পেরেছে মনোহারী। নিজের ঘর থেকেই ডেকে বললে, 'তোমরা ভেবো না গো, আমরা খেয়ে এসেছি।'

পরদিন সকালে রাখালকে বললে সেই ভূতের গল্প।

'ও বাবা, ভাগ্যিস তখন বলোনি সেই রাত্তির বেলা, তাহলে আমার দাঁত-কপাটি লেগে যেত। শুনে এখুনি বুক কাঁপছে—'

স্ত্রী-ভক্তদের কাছে সেই গল্পটাই সেদিন বলছেন শ্রীমা, আর রাখালের ভয়ের কথা ভেবে হাসছেন মৃদু-মৃদু। 'ভূতগুলো তো বড় বোকা।' বললে একজন স্ত্রী-ভক্ত। 'ঠাকুরের কাছে কোথায় মুক্তি চাইবে, তা নয়, চলে যেতে বললে।'

'ঠাকুরের যখন একবার দর্শন পেলে তখন মুক্তির আর বাকি রইল কি মা!' শ্রীমা'র চোখ দুটি প্রসন্নতায় ভরে উঠল : 'জানো না বুঝি আমার নরেনের কাণ্ড? সেবার মাদ্রাজে গিয়ে ভূতের পিণ্ড দিলে! পিণ্ড দিয়ে মুক্ত করে দিলে প্রেতাত্মাদের।'

কলকাতার রাস্তায় লাটুর সঙ্গে নরেনের দেখা।

'তোদের ওখানকার খবর কি?' জিগগেস করলে নরেন।

'কাল উখানে কত উৎসব হল, আপুনি যান নাই কেন? হামার সঙ্গে আজ উখানে চলুন—'

'আমার বয়ে গেছে! সামনে একজামিন। এখন এক পাগলা বামুনের সঙ্গে বসে আড্ডা দেবার আমার সময় নেই।'

'পাগলা বামুন!' হতবুদ্ধির মত তাকিয়ে রইল লাটু। 'পাগলা বামুন আপনি কাকে বলছেন?'

'আর কাকে! কোমরে কাপড় থাকে না, হাত-পা তেউরে যায়, নাম শুনলেই ধেই-ধেই করে নাচে, মান-ইজ্জত নেই, যেখানে-সেখানে খালি গায়ে যাওয়া-আসা করে! তার পর আবার ভেলকি দেখানো আছে—'

'ভেলকি!'

তা ছাড়া আবার কি! সেই গান আছে না? নিতাই কি ভেলকি জানে, নিতাই কি যাদু জানে! শুকনো কাঠে ফল ধরালো, ফুল ফোটালো পাষাণে!

'হ্যাঁ রে, রাখাল ওখানে যায়?'

'যায় বই কি। শুধু যায় না, কখনো দু-তিন রাত্তির থেকেও যায়। ঠাকুর তাকে ছেলে বলেন। মাকে বললেন, এই নাও গো তোমার ছেলে এসেছে।'

'রাখালকে তাঁর ছেলে বললেন?'

'সাচ বলছি, তাই শুনেছি।'

রাখাল যদি ঠাকুরের ছেলে, নরেন শ্রীমা'র।

'মা, এই একশো আট বিল্বপত্র ঠাকুরকে আহুতি দিয়ে এলুম, যাতে মঠের জমি হয়। তা কর্ম কখনো বিফলে যাবে না। ও হবেই এক দিন।' নরেনের কণ্ঠে বজ্রের ঘোষণা।

তার পর মঠের জমি কেনা হলে চতুঃসীমা ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে দেখাল শ্রীমাকে। বললে, 'মা, তুমি তোমার আপন জায়গায় আপন মনে হাঁপ ছেড়ে বেড়াও।'

একদিন খুব ব্যস্ত-ত্রস্ত হয়ে এসেছে নরেন। বললে, 'মা আমার আজকাল সব উড়ে যাচ্ছে। সবই দেখছি উড়ে যায়।'

শ্রীমা হাসলেন। বললেন, 'দেখো, আমাকে কিন্তু উড়িয়ে দিও না।'

নরেন বললে, 'মা, তোমাকে উড়িয়ে দিলে থাকি কোথায়? যে জ্ঞানে গুরুপাদপদ্ম উড়িয়ে দেয় সে তো অজ্ঞান। গুরুপাদপদ্ম উড়িয়ে দিলে জ্ঞান দাঁড়ায় কোথায়?'

কৃষ্ণ নাম বিষ্ণু নাম দু-অক্ষর হলেও কঠিন। বানানেও কঠিন উচ্চারণেও কঠিন। শিব বলতে তিনটে 'স'-এর মধ্যে একটাকে বাছতে হয়। তার চেয়ে হরি আর রাম সোজা। বর্ণপরিচয়ের সময় যখন জল-খল অজ-আম শিখেছিলি সে সময়েই শেখা যেত হরি নাম। তেমনি সরল, শিশুবোধ্য। কিন্তু তা-ও দু-অক্ষর। তোকে একাক্ষর মন্ত্র দিচ্ছি। সব চেয়ে কম, সব চেয়ে ছোট, সব চেয়ে সোজা—সেই একাক্ষর। ওঁ নয়, হ্রীং-ক্লীং নয়। একেবারে জলের মত তরল, শিশিরের মত ঠাণ্ডা। সেই শব্দটি শিখেছিস সকলের আগে, ভুঁয়ে পড়ে মাটি পাবার সঙ্গে-সঙ্গেই। কান্নার স্বর, আনন্দের স্বর, আর্তির স্বর, আকুলতার স্বর। সেই একাক্ষর মন্ত্রটির নাম হচ্ছে মা।

মা আমার জগৎ জুড়ে। আর আমিও তো জগৎ ছাড়া নই। তাহলেই তো মা আমাকে ধরে আছেন, ঘিরে আছেন। তাহলে আর আমার ভয় কি।

মা-ই আমার অভয় মন্ত্র।
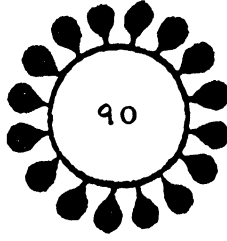
সুরেশ মিত্তির 'কারণ' করে জপ করে। তার পর ছাদের পাঁচিলের পাশে বসে নিচু গলায় শ্যামার গান গায়। আস্তে-আস্তে গলা চড়তে থাকে। ক্রমে-ক্রমে সে-গলা কান্নায় গলে পড়ে।

আর সে কী কান্না! আর্তনাদের মত কানে লাগে। আশে-পাশের বাড়িগুলি সচকিত হয়ে ওঠে।

'সুরেশ মিত্তির মদ খায়।' এক দিন রাম দত্ত এসে নালিশ করল রামকৃষ্ণের কাছে। 'ওকে বারণ করুন।'

'তাতে তোর কি?' রামকৃষ্ণ ঝলসে উঠল : 'ওর ধাত আলাদা, ও নিজের পথে যাবে। তাতে তোর কী মাথাব্যথা?'

'কারণ' করে কোনো দিন যদি আনন্দে পায় সুরেশকে, তখন আর কথা নেই, সর্বক্ষণ তার মুখে শুধু রামকৃষ্ণের কথা।

'তুই কত্তামো করিস নে।' রাম দত্তকে বললে এক দিন সুরেশ। 'চল্ প্রভুর কাছে যাই। তিনি যেমন আদেশ করেন তেমনি করব।'

নবতখানার পাশে বকুলতলায় দাঁড়িয়ে আছে রামকৃষ্ণ। প্রণাম করে দাঁড়াল দুজনে। মনোবাসী টের পেয়েছে মনের কথা। বললে, 'ও সুরেন্দর, মদ খাবি তো খা না। কিন্তু দেখিস পা যেন না টলে, মা'র পাদপদ্ম হতে মন যেন না টলে।'

এখানেও আশ্বাস, এখানেও প্রশ্রয়! মন যদি মুক্ত থাকে, পায়ের বন্ধনে কি এসে যাবে!

জানিস না সেই দুই বন্ধুর গল্প? দুই বন্ধু—এক জন গেল বেশ্যালয়ে, আরেক জন গেল ভাগবত শুনতে। প্রথম জন ভাবছে, ধিক আমাকে! বন্ধু হরিকথা শুনছে, আর আমি এ কোথায় পড়ে আছি!. দ্বিতীয় জন ভাবছে, ধিক আমাকে! বন্ধু কেমন ফুর্তি করছে, আর আমি শালা কী বেকুব! দুজনেই মলো। প্রথম জনকে বিষ্ণুদূতে নিয়ে গেল—বৈকুণ্ঠে। দ্বিতীয় জনকে নিয়ে গেল যমদূতে—নরকে।

শুধু মন নিয়ে কথা। মনেতেই বদ্ধ মনেতেই মুক্ত। মনেতেই শুদ্ধ মনেতেই অশুদ্ধ।

মন ধোপাঘরের কাপড়। লালে ছোপাও লাল নীলে ছোপাও নীল। গেরুয়ায় ছোপাও গেরুয়া। যে রঙে ছোপাও সেই রঙে ছুপবে।

'ওরে মদে বিষও আছে মধুও আছে।' সুরেশ মিত্তিরকে বললে রামকৃষ্ণ। 'মদ খাস কেন? ঐ মধুর জন্যেই তো? কিন্তু ঐ বিষ তুই ধারণ করতে পারবি? না, তুই চাস তাই ধারণ করতে?'

সুরেশ মিত্তির চুপ।

'শোন, মদ খাবার আগে ঐ বিষটুকু তুই মাকে নিবেদন করে দে। বল, মা তুমি এর বিষটুকু খাও আর সুধাটুকু আমাকে দাও।'

তাই ভালো। ঝামেলা গেল! মা-ই বিষ খাক। আমার সুধাপানের কথা, সুধাই খাব পুরোপুরি।

খাবার আগে মদের গ্লাশ মাকে নিবেদন করে দেয় সুরেশ। বলে, বিষটুকু টেনে নে মা, সুধাটুকু আমার জন্যে রেখে যা। বলে গান ধরে মুক্তকণ্ঠে :

জয় কালী জয় কালী বলো,
লোকে বলে বলবে পাগল হলো;
ভালো মন্দ দুটো কথা
ভালোটা না করাই ভালো।

কিন্তু সন্তান হয়ে মাকে কত দিন সে বিষ দিতে পারবে হাতে ধরে? সুরেশের মনে খটকা লাগল। ঠাকুর তাকে ধোঁকায় ফেলেছেন। নিজে মধুটুকু খেয়ে মাকে কি ছেলে বিষ দিতে পারে? কতটুকু পারে? কত দিন পারে? মদের গ্লাশ নামিয়ে রাখল সুরেশ।

অচলানন্দ এসে রামকৃষ্ণকে বলে, একটু কারণ খাও।

সে সব কী দিনই গেছে! যে দলের সাধকই হও না কেন আমাকে দেখাও তোমার ঈশ্বরসাধন। তোমার রীত-নীত। তোমার আকার-প্রকার। আমি শুধু দেখব আর আনন্দ করব। কত রকম ভোগ্য, কত রকম ভজনা!

মথুরবাবুকে বললে, 'সব সাজপাট যোগাড় করে দাও।'

ভাঁড়ারী মথুর কান্ডারী হল। বললে, 'সব যোগাড় করে দিচ্ছি। কার কি লাগবে বলো। তোমার যাকে যা খুশি তাই দিয়ে দাও স্বচ্ছন্দে।'

সাধুদের জন্যে শুধু চাল ডাল ঘি আটা নয়—যোগাড় হল কম্বল-আসন লোটা-কমণ্ডলু—যার যা নেশার সরঞ্জাম। সিদ্ধি গাঁজা কারণ চরস। আদা পেঁয়াজ মুড়ি কড়াই-ভাজা।

তান্ত্রিক অচলানন্দের দারুণ জেদ। বলে, কারণ খেতেই হবে তোমাকে।

রামকৃষ্ণকে চক্রে নিয়ে বসে। কখনো বা চক্রেশ্বর সাজায়। বলে, 'খাও না একটু কারণ।' রামকৃষ্ণ বলে, 'ওগো, আমার নাম করলেই নেশা হয়ে যায়।'

আমার নেশা জিভে মেশা। বাইরের কোনো পৃথক বস্তুর দরকার হয় না। যেমনি একটু নাম করব অমনি সমস্ত সত্তা পীযূষে স্নান করে উঠবে। আমার হচ্ছে নাম-সুধার নেশা।

অচলানন্দ ছেড়ে দিল। শেষকালে শুধু বললে, 'চক্রে বসলে কারণ গ্রহণ করতে হয়—নইলে সাধনার অঙ্গহানি ঘটে।'
রামকৃষ্ণ তখন কারণ নিয়ে কপালে ফোঁটা কাটে বা ঘ্রাণ নেয়। বড় জোর আঙুলে করে ছিটে দেয় মুখের উপর। পাত্রে-পাত্রে ঢেলে সবাইকে পরিবেশন করে।
একেক দিন ভীষণ তর্জন করে অচলানন্দ। বলে, 'স্ত্রীলোক নিয়ে বীরভাবে সাধন তুমি কেন মানবে না? শিবের কলম মানবে না? তন্ত্র লিখে গেছেন শিব, তাতে সব ভাবের সাধন আছে। বীরভাবের সাধনও বাদ পড়েনি—'
'কে জানে বাপু,' রামকৃষ্ণের মুখে সরল সমর্থন : 'আমার শুধু সন্তানভাব।'
মধু রায়ের গলিতে গাড়ি ঢোকে না, দাঁড়ায় পুবের বা পশ্চিমের বড় রাস্তায়। সভা-শেষে হেঁটে চলেছে রামকৃষ্ণ—গলিটুকু পেরিয়েই গাড়িতে গিয়ে উঠবে। কিন্তু ঈশ্বরানন্দে এমনি মাতোয়ারা হয়ে আছে, মেপেমেপে পা ফেলতে পারছে না। টলমল করছে, এখানকার পা ওখানে গিয়ে পড়ছে—
রাখাল বুঝি এখন সঙ্গে নেই। তার কাজই হচ্ছে ঈশ্বরবিভোর রামকৃষ্ণকে ধরে-ধরে ঠিকমতো পথ দেখানো। এইখানে সিঁড়ি, এইখানে উঁচু, এইখানে গর্ত, এমনি বলে-বলে নিজের জায়গায় টেনে নিয়ে যাওয়া। যখন রাখাল না থাকে তখন বাবুরাম আছে।
ভক্তরা দু দিক থেকে ধরে রামকৃষ্ণকে নিয়ে যাচ্ছে গাড়ির দিকে। আস্তে-আস্তে নিয়ে যাচ্ছে। রামকৃষ্ণ টলছে, হেলছে-দুলছে, পা রাখতে পারছে না স্থির হয়ে। গলির মোড়ে দাঁড়িয়েছিল কারা। বলে উঠল, 'কী দারুণ টেনেছে হে!'
'বাবাঃ, একেই বলে পাঁড় মাতাল! একেবারে বেহুঁস।'
লোকে তাই দেখে চর্মচক্ষে। একেই বলে দর্শনেন্দ্রিয়ের প্রমাণ! দড়িকে সাপ দেখে, ছায়াকে ভূত! আবার তেমনি ঈশ্বররসময়কে বলে কি না সুরাপানে জ্ঞানশূন্য!
ওরে সুরাপান করি না আমি, সুধা খাই জয় কালী বলে। আমার মন-মাতালে মাতাল করে মদ-মাতালে মাতাল বলে।
আহাহা, চেয়ে দ্যাখ, ঈশ্বর যেন ঊর্ণনাভ। মাকড়সা কি করে? নিজের শরীর থেকেই লতাতন্তু সৃষ্টি করে নিজের আনন্দে জাল বোনে। আবার সেই জালের আশ্রয়েই নিজের আনন্দে বাস করে। তেমনি আমাদের ঈশ্বর। সমস্ত জগতের উপাদান তিনি, তিনিই আবার সমস্ত জগতের উপলক্ষ্য। আবার এই জগতের মধ্যেই তাঁর বাসা। এই জগৎই আবার তাঁর লীলাগৃহ।
রামকৃষ্ণ গেছে কালীঘরে ভবতারিণীকে দর্শন করতে। সারদা তার ঘরখানি ঝাঁটপাট দিয়ে রাখছে। পেতে রাখছে বিছানা। তার পর পান সাজতে বসেছে এক কোণে।
ঘরের কাজ চটপট সেরে চুপিচুপি বেরিয়ে যাবে সারদা, দরজার মুখে রামকৃষ্ণের সঙ্গে দেখা।
কিন্তু এ তাঁর কী চেহারা! যেন পুরোদস্তুর মাতাল! চোখ দুটো লাল,

এখানকার পা ওখানে পড়ছে, কথা এড়িয়ে গেছে, কী সব যেন বলছেন জড়িয়ে-জড়িয়ে!

ভয় পেয়ে পালিয়ে যাবে কিনা এক মুহূর্ত ভাবল সারদা।

এক মুহূর্ত।

মাতালের মত সারদার গা ঠেলে দিল রামকৃষ্ণ। বললে, 'ওগো, আমি কি মদ খেয়েছি?'

সারদা আনন্দে লহর দিয়ে উঠল। বললে, 'না, না, মদ খাবে কেন?'

'তবে কেন এমনি টলছি? তবে কেন কথা কইতে পাচ্ছি না? আমি কি মাতাল?'

সারদা একবার দেখল বুঝি পরিপূর্ণ চোখে। বললে, 'না, না, তুমি মদ কেন খাবে? তুমি মা-কালীর ভাবামৃত খেয়েছ।'
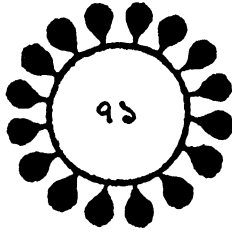
'তোদের বংশের কেউ সন্নেসী হয়েছে?' নতুন কোনো ছাত্র ইস্কুলে ভর্তি হতে এলেই নরেনের এই প্রথম জিজ্ঞাসা : 'ধন-মান স্ত্রী-পুত্র ঘর-বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছে বিবাগী হয়ে?'

মেট্রোপলিটান ইস্কুলের সব চেয়ে নিচু ক্লাশের ছাত্র। মাত্র সাত বছর বয়েস।

নতুন ছাত্র অবাক হয়ে চেয়ে থাকে। রাজারাজড়ার খবর নয়, কে কবে কোথায় ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে পথে বেরিয়েছে, এ নিয়ে এত জাঁক। সন্নেসী হওয়া মানে যেন কত বড় এক দিকপাল হওয়া।

জান্তা ছেলেরা কেউ-কেউ টিপ্পনি কাটে। তোর বাবা তো মস্ত এটর্নি, আছিস সবাই রাজার হালে, সুখের পায়রা সেজে। তোদের বংশে আবার সন্নেসী!

'ছাই জানিস।' গর্জে ওঠে নরেন : 'আমার ঠাকুরদা দুর্গাচরণ দত্ত সন্নেসী হয়েছিলেন—'

মাত্র পঁচিশ বছর বয়েস, স্ত্রী ও তিন বছরের শিশুপুত্র বিশ্বনাথকে ত্যাগ করে দুর্গাচরণ চলে গেলেন প্রব্রজ্যা নিয়ে।

বিশ্বনাথ তখন আট বছরের, তাকে নিয়ে তার মা কাশী চললেন। উদ্দেশ্য বিশ্বনাথ-দর্শন। নৌকোয় যেতে দেড় মাস লাগল। যিনি স্বামী হয়ে ত্যাগ করেছেন ও পুত্র হয়ে পূর্ণ করেছেন তাঁকে একবার দেখে আসবেন স্বচক্ষে।

বৃষ্টি হয়ে বিশ্বনাথের মন্দিরের সম্মুখটা পিছল হয়েছে। সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে পড়ে গেলেন। 'মায়ি গির গিয়া—' বলে এক সাধু ছুটে এসে তাঁকে তুলে ধরল।

কে এ সন্নেসী? সিঁড়িতে সযত্নে শুইয়ে দিতে যাবে চোখে-চোখে চকিত সংস্পর্শ হয়ে গেল! এ যে দুর্গাচরণ!

'মায়া হ্যায়, এ মায়া হ্যায়—' বলে উঠল সন্নেসী। দ্রুত পায়ে অন্তর্ধান করলে।

সেই সন্নেসীরই নাতি নরেন্দ্রনাথ।

বলে, 'এই, দেখি, তোর হাত দেখি।'

যেন কতই পণ্ডিত, এমনি ভাবে সহপাঠীদের হাত দেখে। বলে, 'ছাই, কিচ্ছু নেই। তোর কিচ্ছু হবে না—সন্নেসী হওয়া নেই তোর অদৃষ্টে।'

সন্ন্যাসী হওয়া মানে নরপতি হওয়া। আর, নরপতির আরেক নামই নরেন্দ্র।

'এই দ্যাখ, আমার হাতে কত বড় চিহ্ন। আমি নিঘঘাত সন্নেসী হব।'

এ যেন প্রায় বিলেত যাওয়ার মত। আর সব ছেলেরা আবিষ্টের মতন চেয়ে থাকে।

সন্নেসী হবার কি মজা, তাই তখন সবাইকে গল্প করে। তোরা কিছুই জানিস নে, বড়-বড় সাধুরা সব হিমালয়ে থাকে, গভীর জঙ্গলের মধ্যে। কৈলাস পাহাড়ের উপর রোজ মহাদেবের সঙ্গে তাদের দেখা হয়। যদি সন্নেসী হতে চাস, তবে প্রথম যেতে হবে সেই জঙ্গলে, সাধুদের পায়ে মাথা খুঁড়তে হবে। যদি তাঁদের দয়া হয়, যদি তাঁদের পরীক্ষায় পাশ করতে পারিস, তবেই চেলা বনতে পারবি, পরতে পাবি গেরুয়া।

কিসের পরীক্ষা? কেমনতরো পরীক্ষা?

পরীক্ষা খুব কঠিন। প্রত্যেককে একখানা করে বাঁশ দেবে। আর, সেই একখানা বাঁশের উপর শুয়ে ঘুমুতে হবে সারা রাত। পড়ে গেলেই ফেল। যদি না পড়ে রাত কাটাতে পারিস তবেই সন্নেসী। তারপরেই একদিন কৈলাসে শিবদর্শন।

মা ভুবনেশ্বরী প্রত্যহ শিবপূজা করেন। চারচারটি মেয়ে, দুটি আবার গত হয়েছে, একটিও ছেলে নেই। বীরেশ্বর শিব কি তাঁর মনের ইচ্ছাটি পূর্ণ করবেন না?

ইচ্ছা হয়ে যিনি মনের মধ্যে ছিলেন তিনিই আবির্ভূত হলেন। অপূর্ব স্বপ্ন দেখলেন ভুবনেশ্বরী। যেন যোগীশ্বর শিব যোগনিদ্রা ছেড়ে পুত্ররূপে তাঁর দুয়ারে দাঁড়িয়ে।

বারো শো উনশত্তর সালের পৌষসংক্রান্তির দিন বিশ্বনাথের ছেলে হল। মা নাম রাখলেন বীরেশ্বর। সেই থেকে দাঁড়াল 'বিলে'।

এ তো হল ডাক-নাম। ভালো নামের তলব পড়ল অন্নপ্রাশনের সময়।

নাম দাও নরেন্দ্র। নরের মধ্যে যে ইন্দ্র, তার নাম আবার কী হবে? এ হচ্ছে নরেশ্বর, নরোত্তম। এ হচ্ছে নরসিংহ।

দুর্দান্ত ছেলে। অষ্টপ্রহর তার সঙ্গে-সঙ্গে ঘোরবার জন্যে দু-দুটো ঝি রেখে দিয়েছে বিশ্বনাথ। যদি একবার রাগ হয় জিনিসপত্র সব ভেঙে-চুরে ছারখার করে

দেবে। তাকে শান্ত করা তখন এক বিষম সমস্যা। কিন্তু অভিনব এক উপায় বের করেছেন ভুবনেশ্বরী! 'শিব' বলে মাথায় একটু জল ছিটিয়ে দিলেই নিশ্চিন্ত।.। ফুসমন্তরে ঠাণ্ডা।

এক টুকরো গেরুয়া কাপড় কৌপীনের মত করে পরেছে নরেন।

'এ কি?' চমকে উঠলেন ভুবনেশ্বরী।

'আমি শিব হয়েছি।'

চোখ বুজে ধ্যান করলেই মাথায় জটা গজায়, আর সেই জটা বটের শেকড়ের মত মাটির ভেতরে গিয়ে সেঁধোয়। এমনি চমৎকার একটা কাহিনী কে বলেছে নরেনকে। তাই সে শিরদাঁড়া টান করে চোখ বুজে বসে খানিকক্ষণ আর থেকে-থেকে চোখ মেলে দেখে, জটা কত দূর নামল পিঠ বেয়ে।

'মা, এত ধ্যান করছি, জটা হচ্ছে কই?'

মা বলেন, 'জটা হয়ে কাজ নেই।'

বাবা জিগগেস করেন, 'বড় হয়ে কি হবি রে বিলে?'

নির্বিতর্ক উত্তর নরেনের : 'কোচোয়ান হব।'

চাবুক মেরে ঘোড়া ছুটিয়ে গাড়ি চালাব। চেতনার চাবুক। কর্ম আর ধর্ম দুই ঘোড়া। আর, জাড্য আর তামসিকতার গাড়ি।

'ত্যাগী না হলে তেজ হবে না।' ব্রহ্মানন্দকে লিখছে বিবেকানন্দ : 'আমরা অনন্তবলশালী আত্মা—দেখ দিকি কি বল বেরোয়। কিসের দীনা-হীনা? আমি ব্রহ্মময়ীর বেটা। কিসের রোগ, কিসের ভয়, কিসের অভাব? দীনা-হীনা ভাবকে কুলোর বাতাস দিয়ে বিদেয় করো দিকি।...বীর্যমসি বীর্যং, বলমসি বলম্, ওজোঽসি ওজঃ, সহোঽসি সহো, ময়ি ধেহি। তুমি বীর্যস্বরূপ, আমাকে বীর্যবান করো। তুমি বলস্বরূপ, আমাকে বলবান করো। তুমি ওজঃস্বরূপ, আমাকে ওজস্বী করো। তুমি সহ্যশক্তি, আমাকে সহনশীল করো। রোজ ঠাকুর পুজোর সময় যে আসন প্রতিষ্ঠা—আত্মানং অচ্ছিদ্রং ভাবয়েৎ—আত্মাকে অচ্ছিদ্র ভাবনা করবে—ওর মানে কি? ওর মানে, আমার ভেতরই সব আছে—আমার ইচ্ছা হলেই সমস্ত প্রকাশিত হবে।'

ইচ্ছাটিকে চাবুক করে মারো তোমার গতিহীন জড়ত্বের স্থূল পিণ্ডে। বেগবান ঘোড়া ছুটিয়ে দাও! রজোগুণের ঘোড়া।

আস্তাবলের সহিসের সঙ্গে ভাব করল নরেন। কিন্তু বিয়ে করে সহিসের বড় কষ্ট। বিয়ের মত ঝকমারি আর কিছু নেই। সারা জীবন সে ঝকমারির মাশুল যোগাতেই প্রাণান্ত। বালক নরেনের কানে মন্ত্র দিলে সহিস। আর, নরেনের কাছে সহিসই সর্বজ্ঞ।

মনের মধ্যে ধাক্কা খেল আচমকা। এ বলে কী! যে রামসীতাকে নরেন এত ভক্তি করে তারা যে বিয়ে করেছে! রামসীতার ভালোবাসার কত গল্প শুনেছে সে মা'র কাছে! তবে সহিস যখন বলছে, বিয়ে খারাপ, তখন রামসীতাকে কি করে আর ভক্তি করা যায়? রামসীতার দুঃখে কাঁদতে লাগল নরেন। মা কাছে আসতে

তাঁর বুকের মধ্যে মুখ লুকিয়ে আরো ফুঁপিয়ে উঠল। মা বললেন, 'তাতে কি! তুই শিবপুজো কর।'
বুকটা হালকা হয়ে গেল। ছাদের ঘরে উঠে রামসীতার মূর্তি সে তুলে নিয়ে এল। ছুঁড়ে ফেলে দিল রাস্তায়। রামসীতার আসনে বসাল শিবমূর্তি।
শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশ চন্দ্রশেখর। আদিমধ্যান্তশূন্য শ্বেতশিখা।
নরেন নিজে কী!
'ও হচ্ছে পাতালফোঁড়া শিব। ও বসানো শিব নয়।' বললেন ঠাকুর : 'কারু পদ্ম দশদল, কারু ষোড়শদল, কারু বা শতদল। কিন্তু পদ্ম মধ্যে নরেন্দ্র সহস্রদল।'
আর নরেন্দ্র কী বলছে?
'দাদা, না হয় রামকৃষ্ণ পরমহংস একটা মিছে বস্তুই ছিল, না হয় তাঁর আশ্রিত হওয়া একটা বড় ভুল কর্মই হয়েছে, কিন্তু এখন উপায় কি? একটা জন্ম নয় বাজেই গেল, মরদের বাত কি ফেরে? দশ স্বামী কি হয়? তোমরা যে যার দলে যাও, আমার কোনো আপত্তি নেই, কিছুমাত্রও নেই, তবে এ দুনিয়া ঘুরে দেখছি যে, তাঁর ঘর ছাড়া আর সকল ঘরেই "ভাবের ঘরে চুরি।" তাঁর জনের উপর আমার একান্ত ভালবাসা, একান্ত বিশ্বাস। কি করব? একঘেয়ে বলো বলবে, কিন্তু ঐটি আমার আসল কথা। যে তাঁকে আত্মসমর্পণ করেছে, তার পায়ে কাঁটা বিঁধলে আমার হাড়ে লাগে।...তাঁর দোহাই ছাড়া কার দোহাই দেব? আসছে জন্মে না হয় বড় গুরু দেখা যাবে, এ জন্ম এ শরীর সেই মূর্খ বামুন কিনে নিয়েছে।'
জাত কাকে বলে—বালক নরেন বড় ফাঁপরে পড়েছে। জাত না মানলে কী হয়? ছাদ-দেয়াল কি ভেঙে পড়ে? জাত যে যায়, কি করে যায়, কোন পথে? ও কি টাকা-কড়ি যে চুরি যায়? না, জামা-কাপড় ছিঁড়ে যায়? একবার দেখলে হয় পরীক্ষা করে।
নানারকম মক্কেল আসে বিশ্বনাথের বৈঠকখানায়। জাত মেনে আলাদা-আলাদা হুঁকো। বৈঠকের উপর সার-সার বসানো। এটা শুদ্দুর এটা বামুন এটা মুসলমান। মুসলমানের হুঁকোতেই আগে টান দিল নরেন।
'ও কি হচ্ছে রে?' বাবা কখন হঠাৎ এসে পড়েছে ঘরের মধ্যে।
'দেখছি কোনখান দিয়ে জাত যায়? যাকে ছোট করে রেখেছি তাকে ছুঁলে কী হয়?'
কী হয়? সে হাতে হাত দিয়ে পাশে এসে দাঁড়ায়। জাতটা নিমেষে বড় হয়ে ওঠে। দেশ দুশো কদম এগিয়ে যায়।
'বলি, শশীবাবুকে মালাবারে যেতে বোলো।' রাখালকে চিঠি লিখছে নরেন : 'সেখানকার রাজা সমস্ত প্রজার জমি ছিনিয়ে নিয়ে ব্রাহ্মণগণের চরণার্পণ করেছেন, গ্রামে-গ্রামে বড়-বড় মঠ, চর্বচোষ্য খানা, আবার নগদ।...ভোগের সময় ব্রাহ্মণেতর জাতের স্পর্শে দোষ নেই—ভোগ সাঙ্গ হলেই স্নান।...পয়সা নেবে, সর্বনাশ করবে, আবার বলে ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না। আর কাজ তো ভারি—আলুতে-বেগুনে যদি

নরেন্দ্রনাথ

ঠোকাঠুকি হয়, তা হলে কতক্ষণে ব্রহ্মাণ্ড রসাতলে যাবে!...মহা দ'ক সামনে— সাবধান, ঐ দ'কে সকলে পড়ে মারা যাবে—ঐ দ'ক হচ্ছে যে হিঁদুর ধর্ম বেদে নাই, পুরাণে নাই, ভক্তিতে নাই, মুক্তিতে নাই—ধর্ম ঢুকেছেন ভাতের হাঁড়িতে। হিঁদুর ধর্ম বিচারমার্গেও নয়, জ্ঞানমার্গেও নয়, ছুঁৎমার্গে। আমায় ছুঁয়ো না, আমায় ছুঁয়ো না। এই ঘোর বামাচার ছুঁৎমার্গে পড়ে প্রাণ খুইও না। "আত্মবৎ সর্বভূতেষু" কি পুঁথিতে থাকবে নাকি? যারা এক টুকরা রুটি গরিবের মুখে দিতে পারে না তারা আবার মুক্তি কি দিবে!'

'নরেন্দ্র সভায় থাকলে আমার বল।' বললেন তাই ঠাকুর : 'ও বড় ফুটোওলা বাঁশ। খুব আধার—অনেক জিনিস ধরে।'

তৃণগুল্মের দেশে মাঝে-মাঝে বিস্ময়কর বনস্পতির দেখা মেলে। নরেন্দ্রনাথ বনস্পতির দেশে দেবতাত্মা নগাধিরাজ।

আর সেই যে হিমালয় তার ঊর্ধ্বে বিরাজিত যে মানস-সরোবর—নিবাত-নিষ্কম্প নীলকান্ত প্রশান্ত অমৃত-হ্রদ, তিনিই শ্রীরামকৃষ্ণ।
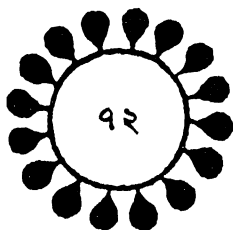
ছ'টি সৈন্য সঙ্গে নিয়ে পথ চলে নরেন। তারা হচ্ছে—কি আর কে, কবে আর কোথায়, কেন আর কেমন করে? সব সঙিন-ওঁচানো সান্ত্রী।

কেউ একটা কিছু বলবে আর তখুনি ঘাড় কাৎ করে মেনে নেবে এমনটি কখনো হবার নয়। যদি থাকে তো দেখাও। বেশ তো, কোথায়? চলো আমার সঙ্গে। কেন ঈশ্বরকে ডাকবো? কেন মানবো তোমাকে? তুমি কে? ঈশ্বরই বা কি? যদি উঠবোই উপরে, কেমন করে উঠবো?

শিব চাঁপাফুল ভালোবাসে। তাই নরেনও ভালোবাসে চাঁপাফুল।

পাড়ার কোন এক ছেলের বাড়িতে চাঁপা গাছ আছে, যখন-তখন তার ডালে বসে দোল খায় নরেন। গাছ তো ভাঙবেই, ডানপিটে ছেলেটাও জখম হবে।

'ও গাছটায় উঠো না।' বাড়ির বুড়ো মালিক ভারিক্কি গলায় বারণ করলে।

'কি হয় উঠলে?'

প্রশ্ন শুনে মালিক চমকে উঠল। ভাবলে শান্ত কথায় হবে না, ভয় দেখাতে হবে। বললে, 'ও গাছে ব্রহ্মদত্যি থাকে।'

'কি রকম দেখতে ব্রহ্মদত্যি?'
'ওরে বাবাঃ, ভয়ঙ্কর দেখতে। নিশুতি রাতে শাদা চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুরে বেড়ায়।'
'ঘুরে বেড়াক না।' নরেনের মুখে নিটোল নির্লিপ্ত : 'তাতে আমার কি!'
'তোমার কি মানে? যারা ঐ গাছে চড়ে তাদের সে ঘাড় মটকে দেয়।'
রাত করে চুপি-চুপি চলে এসেছে নরেন। বড় ইচ্ছে শাদা চাদর-পরা ব্রহ্মদৈত্যর সঙ্গে দেখা হয়। সহপাঠী ছেলে বাধা দিতে এল নরেনকে। বললে, 'না ভাই অমন কাজ করিস নে। নিঘ্‌ঘাত তবে তোর ঘাড় মটকাবে।'
নরেন হেসে উঠল উচ্চরোলে। 'লোকে একটা কিছু বললেই বিশ্বাস করতে হবে? পরীক্ষা করে দেখব না নিজে?' বলেই সে গাছের ডালে চড়ে বসল।
নিজে যাচাই করে দেখব। যাচাই করে দেখব বুদ্ধির কষ্টিপাথরে যুক্তির সোনা ঘষে-ঘষে। বইয়ে লেখা আছে বলেই সত্য, ভালোমানুষের মত তা মানতে পারব না। নিজে পরীক্ষা করব। সত্য কি এতই সোজা? বিলেত আছে, এ বললেই হবে? যেতে হবে বিলেতে। পরের মুখে ঝাল খেতে পারব না। ঝালের প্রমাণ চাই।
'ঈশ্বর মানুষ হয়ে আসেন এ বললেই হবে?' নরেন্দ্র গর্জে উঠল : 'প্রমাণ চাই।'
গিরিশ ঘোষ বললে, 'বিশ্বাসই প্রমাণ। এই জিনিসটা যে এখানে আছে তার প্রমাণ কি? বিশ্বাসই প্রমাণ।'
'আমি ট্রুথ চাই—প্রুফ চাই।' নরেন্দ্র আবার হুঙ্কার ছাড়ল। 'শাস্ত্রই বা বিশ্বাস করি কেমন করে? একেক জন একেক বলছে। যার যা মনে এসেছে তাই—'
ঠাকুর বললেন, 'গীতা সব শাস্ত্রের সার। সন্নেসীর কাছে আর কিছু থাক না থাক, ছোট একখানি গীতা অন্তত থাকবে।'
একজন ভক্ত গদ্‌গদ হয়ে উঠল : 'আহা, গীতা—শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—'
'শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, না ইয়ে বলেছেন—' ঝাঁজিয়ে উঠল নরেন।
'হাতি যখন দেখিনি, তখন সে ছুঁচের ভেতর দিয়ে যেতে পারে কিনা কেমন করে জানব?' বললে ভবনাথ। 'ঈশ্বরকে যখন জানি না তখন তিনি মানুষ হয়ে অবতার হতে পারেন কিনা কেমন করে বুঝব বিচার করে?'
নরেন বললে, 'আমি বিচার চাই। ঈশ্বর আছেন, বেশ; কিন্তু তিনি কোথাও ঝুলছেন এ আমি মানতে পারব না।'
'সবই সম্ভব।' বিস্ময়-সুস্মিত মুখে বললেন ঠাকুর, 'তিনি ভেলকি লাগিয়ে দেন। বাজিকর গলার ভেতর ছুরি চালায়, আবার বার করে। ইট-পাটকেল খেয়ে ফেলে।'
তবু বাজিকরই সত্য। আর সব ভেলকি।
বাজিকর আর তার বাজি। ভগবান আর তার ঐশ্বর্য। বাবু আর তার বাগান। বাজি দেখে লোকে অবাক, কিন্তু বাজি ক্ষণিকের, এই আছে এই নেই—বাজিকরই সত্য। ঐশ্বর্য দুদিনের, ভগবানই সত্য। বাগান দেখেই ফিরে যেও না, বাগানের মালিক-বাবুর সন্ধান করো।

নরেনের বয়স তখন এগারো, গঙ্গার ঘাটে ইংরেজের মানোয়ারী জাহাজ এসেছে। চল্, দেখে আসি।

কিন্তু ঘাটের বড় সাহেবের দস্তখতী ছাড় চাই। ওরে বাবা, গিয়ে কাজ নেই। কে দাঁড়াবে ওই লালমুখো জাঁদরেলের কাছে? কথা কইবে কে? ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে চল্।

সামনের সিঁড়িতে প্রত্যক্ষ বাধা। পিছনের দিকে লোহার আরেকটা সরু সিঁড়ি। সেই সিঁড়ি দিয়েই সটান উঠে গেল নরেন। একবার উঠি তো উপরে, তারপরে ঠিক ধরে ফেলব সাহেবকে। যা ভেবেছিল নরেন। পর্দা-ফেলা ঘরে সাহেব বসে আছে। পর্দা সরিয়ে সটান ঢুকলো নরেন। সাহেব তো অবাক। অবাক যখন হয়েছ তখন অবাক থেকেই আলগোছে সই করে দাও একটা।

পাশ নিয়ে সামনের সিঁড়ি দিয়েই বুক ফুলিয়ে নেমে এল নরেন। প্রহরী তো অবাক। জিগগেস করলে, 'তুম ক্যায়সে উপরমে গিয়া?'

নরেন শুধু বললে, 'হাম জাদু জানতা।'

বাবার সঙ্গে রায়পুর যাচ্ছে নরেন—নাগপুর পর্যন্ত ট্রেনে গিয়ে, সেখান থেকে গরুর গাড়ি। গরুর গাড়ির রাস্তা প্রায় পনেরো দিন। তাই চলেছে নরেন। চলেছে বিন্ধ্যাচলের গা ঘেঁষে। ঘন অরণ্যের পথ বেয়ে। একখানা গরুর গাড়িতে নরেন একা। অন্য গাড়িতে তার মা আর ছোট ভাইয়েরা।

চার দিকে বিরাটের রূপ। যে দিকে তাকাও সেই দিকেই বিরাট আসন পেতে বসেছেন। বসেছেন পর্বতশৃঙ্গে, বসেছেন গহন অরণ্যানীতে। তা ছাড়া সেই মহাশিল্পীর সূক্ষ্ম কারুকাজও ছড়িয়ে রয়েছে এখানে-সেখানে। পত্রে-পুষ্পে, কঠিনের গায়ে কোমলের আলিম্পনে। হঠাৎ একটা মৌচাক নরেনের চোখে পড়ল। পাহাড়ের চূড়া থেকে শুরু করে প্রায় মাটি পর্যন্ত দীর্ঘ এক ফাটল জুড়ে বিরাট মৌচাক। কত তিল-তিল পরিশ্রম, কত বিন্দু-বিন্দু মধু—আদি-অন্তের ইয়ত্তা করা যায় না। অনন্তের ভাবে তলিয়ে গেল নরেন।

তাকাও তেমনি একবার ঐ অন্তরীক্ষে। রাত্রির তারকাময় আকাশে। সমুদ্র-তটের বালুকণার মত জ্যোতির কণিকা। একেকটা কণিকা দেদীপ্যমান সূর্যের চেয়ে বড়। এমনি কত যে স্ফুলিঙ্গ, বিজ্ঞানের কোনো ল্যাবরোট্যারিতেই গণনা করা যায়নি। তার মধ্যে এক কণা ধূলির মতো এই পৃথিবী। এ সবের মানে কি! তাও কি সবাই স্থির হয়ে আছে? ছুটেছে দুর্দান্ত বেগে। সে যে কত বড় মহাশূন্য কে তার সীমাসীমান্ত খুঁজে পায়! কেন এই জ্যোতিরিঙ্গন? কেন এই সর্বতশ্চক্ষু আকাশ? রাত্রির পৃষ্ঠায় কিসের ইঙ্গিতটি সে লিখে রেখেছে স্পষ্টাক্ষরে? কেন? কার জন্যে?

সেই মৌচাক দেখে প্রথম ধ্যানাবিষ্ট হল নরেন।

এন্ট্রান্স পাশ করে ঢুকল এসে কলেজে। নড়ে-ভোলা ছেলে নয়, দুঃসাহসী, জাহাঁবাজ ছেলে। এদিকে আবার স্ফূর্তিবাজ, রঙ্গপ্রিয়। অপরিমিত জীবনের উজ্জ্বল উচ্ছ্বাস। সব মিলে আবার নির্মলতা আর পবিত্রতার দীপ্ত বিগ্রহ।

শুধু তাই? গান গায় নরেন। মৃদঙ্গ বাজায়। নৃত্য হচ্ছে বীরোচিত কলা। নাচে তাই স্বচ্ছন্দে। স্বভাবসৌন্দর্যে। তাণ্ডবপ্রিয় শিব যেন মেতেছেন উদ্ধত নৃত্যে।

ফার্স্ট আর্টস পাশ করে বি-এ পড়তে লাগল নরেন। কিন্তু পড়ার উদ্দেশ্য কি? শুধু পরীক্ষা পাশ করা? না, জ্ঞানার্জন? কিন্তু জ্ঞানই বা বলে কাকে?

'আহাম্মক, তোমরা বই হাতে করে সমুদ্রের ধারে পাইচারি করছ! ইউরোপীয় মস্তিষ্ক-প্রসূত কোনো তত্ত্বের এক কণামাত্র—তাও খাঁটি জিনিস নয়—সেই চিন্তার বদহজম খানিকটা ক্রমাগত আওড়াচ্ছ, আর তোমাদের প্রাণমন সেই তিরিশ টাকার কেরাণীগিরির দিকে পড়ে রয়েছে। না হয় খুব জোর একটা দুষ্ট উকিল হবার মতলব করছ। এই ভারতীয়গণের সর্বোচ্চ দুরাকাঙ্ক্ষা। আবার প্রত্যেক ছাত্রের আশে-পাশে একপাল ছেলে—তাঁর বংশধরগণ—বাবা খাবার দাও, খাবার দাও করে উচ্চ চীৎকার তুলেছে। বলি, সমুদ্রে কি জলের অভাব হয়েছে যে তোমাদের বই গাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপ্লোমা প্রভৃতি সমেত তোমাদের ডুবিয়ে ফেলতে পারে না?'

বি-এ-তে দর্শন ছিল নরেনের। এক দিকে হার্বার্ট স্পেনসার, কাণ্ট আর মিল, অন্য দিকে ভারতবর্ষ—হিন্দুদর্শন। তত্ত্ব আর তর্ক, যুক্তি আর কল্পনা। কি হবে দর্শনে? দর্শন পড়ে কী দর্শন করব? সত্য-দর্শন চাই।

সত্যমেব জয়তে নানৃতং, সত্যেনৈব পন্থা বিততো দেবযানঃ।

'যৌবন ও সৌন্দর্য নশ্বর, জীবন ও ধনসম্পত্তি নশ্বর, নাম-যশ নশ্বর, এমন কি পর্বতও চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া ধূলিকণায় পরিণত হয়, বন্ধুত্ব ও প্রেমও অচিরস্থায়ী, একমাত্র সত্যই চিরস্থায়ী। হে সত্যরূপী ঈশ্বর, তুমিই আমার একমাত্র নিয়ন্তা হও।...এই মুহূর্ত হইতে আমি ইহামুত্রফলভোগবিবাগী হইলাম—ইহলোক এবং পরলোকের যাবতীয় অসার ভোগনিচয়কে পরিত্যাগ করিলাম। হে সত্য, একমাত্র তুমিই আমার পথপ্রদর্শক হও। আমার ধনের কামনা নাই, নাম-যশের কামনা নাই, ভোগের কামনা নাই। ভগিনি, এ সকল আমার নিকট খড়-কুটা—'

শুধু গুণ-বিচার করে চলেছি। শুধু বর্ণনা আর অনুমান। শুধু কীর্তন আর কল্পনা। আগে দেখি, পরে গুণ-বিচার করব। আগে দর্শনধারী পিছে গুণ-বিচারি।

দেবেন ঠাকুরের কাছে উপস্থিত হল নরেন। বললে, 'আপনি ঈশ্বর দেখেছেন?'

চোখ বুজে ধ্যান করছিলেন মহর্ষি। এক উত্তেজিত উন্মাদ কণ্ঠে তাঁর ধ্যান ভাঙল। চেয়ে দেখলেন, নরেন। যে ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করছে, নাম লিখিয়েছে খাতায়, যোগ-ধ্যানের ক্লাশে ভর্তি হয়েছে ক' দিন।

'দেখেছেন আপনি ঈশ্বর?'

তন্ময় হয়ে তাকিয়ে রইলেন মহর্ষি। নরেনের স্থিরনিবদ্ধ বিস্ফারিত দুই চক্ষু যেন ভাগবতী দীপ্তিতে জ্বলছে। হাঁ-না উত্তর দিতে পারলেন না মহর্ষি। শুধু বললেন, 'তোমার চোখ দুটি কী উজ্জ্বল! যেন যোগীচক্ষু।'

তা দিয়ে আমার কী হবে! যে অন্ধকারে আমি তাঁকে খুঁজছি সেখানে কী করবে

চর্মচক্ষু? আলোয় আলোকময় করে কি তিনি দেখা দেবেন যে চোখ মেলেই তাঁকে দেখব? দেখব তাঁকে পাতায়-ফুলে ঘাসে-শিশিরে আকাশে-তারায়, প্রতিটি মানুষের মুখে!

কেশব সেনকে প্রকাশিত করেছেন মহর্ষি, উদ্ভাসিত করেছেন। যে ছিল মৃৎপ্রদীপ তাকে করেছেন ভাস্বতী শিখা। মহাকবি প্রকৃতিকে মানবায়িত করে, মহর্ষি মানুষকে ঈশ্বরায়িত করেছেন। কেশব যাঁর কীর্তি, তিনিও দেখেননি ঈশ্বরকে?

বড় হতাশ হল নরেন। মনের আকাশে যে ঝড় উঠেছে তাতে মুছে যাচ্ছে আকাশের শাশ্বতী স্থিতি। তবে কি তিনি নেই? তবে কি তিনি দর্শনের অগোচর? কেন এসেছিল সে দর্শনের সংস্পর্শে? ধর্মের অনুসন্ধানে? সে কি এই মেঘজালের মধ্য থেকে পথ পাবে না? সে কি জ্যোতির তনয় নয়?

'বিশ্বাস, বিশ্বাস, সহানুভূতি—অগ্নিময় বিশ্বাস, অগ্নিময় সহানুভূতি।' পাবে না কি সে সেই তপ্ত তাড়িত স্পর্শ? এমন কি কেউ নেই যিনি তাকে বলবেন সরল সত্যের সহজ স্ফূর্তিতে : 'তাঁকে দেখেছি বই কি। তোকে যেমন দেখছি চোখের উপর, তেমনি। স্পষ্ট, স্থূল, সাবয়ব।'

'দেখেছ?' চমকে উঠবে নরেন, কিন্তু এমন প্রাণময় সারল্যের সঙ্গে তিনি বলবেন যে নরেন তাঁকে বিশ্বাস করবে। সে অগ্নিময় আন্তরিকতার কাছে তার সংশয়ের ফণা সে নত করবে।

'শুধু দেখেছি? তাঁর সঙ্গে খেয়েছি, কথা কয়েছি, শুয়েছি একসঙ্গে।'

'বলো কি, দেখাতে পারো আমাকে?' লাফিয়ে উঠবে নরেন।

'আমাকে দেখাতে হবে না। তুই নিজেই দেখতে পারবি।' বলবেন সেই সর্বানুভূ : 'তোর এমন চক্ষু তুই দেখবি নে?'

কোথায়, কোথায় তিনি?
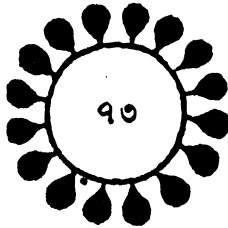
ওরে অন্তরে আয়, ঘুচে যাবে সব অন্তরায়।

রাম দত্তের বাড়িতে রামকৃষ্ণের বসবার জন্যে একখানা বিলিতি গালচে হয়েছে। হয়েছে তাকিয়া। ডান হাতের কাছে কাঁচের গেলাশে জল। এড়ানী পাখা দিয়ে বাতাস করছে কেউ।

কোঁচার কাপড় ফেটি করে কোমরে বাঁধা। জামাটি কখনো গায়ে আছে, কখনো বা কতক্ষণ পরেই খুলে ফেলছে। কখনো বা কোঁচাটি খুলে লম্বা চাদরের মত করে কাঁধের উপর ফেলা।
রাম দত্ত আর মনোমোহন প্রথম আরম্ভ করল কীর্তন। খোল-করতাল নেই। মাঝে-মাঝে শুধু রামকৃষ্ণ হাততালি দেয়। সেই হাততালিই যেন সূর্য-চন্দ্রের করতাল।

'মন একবার হরি বল হরি বল,
জলে হরি থলে হরি, অনলে-অনিলে হরি—'

ভাবাবেশে কখনো দাঁড়িয়ে পড়ে রামকৃষ্ণ। নৃত্য করে। সে নরনৃত্য নয়, অমর-নৃত্য। স্পন্দনের সঙ্গে স্থৈর্য। যাকে বলে 'সাম্যস্পন্দন'। কতক্ষণ পরে একেবারে সমাধি। শরীর থেকে শক্তি বেরুচ্ছে, সূর্যের যেমন বিভা। সমস্ত ঘর-দালান ভেসে যাচ্ছে। জানলা দিয়ে বেরিয়ে ঢেউ খেলছে গলিতে ।
একবার বিজয় গোস্বামীকে বলেছিল নাগ-মশাই : 'এখানে এসে চোখ বুজে বসেছ কেন? দেখতে এসেছ, চোখ খুলে দেখ প্রাণ ভরে। এখানে জপধ্যানও বন্ধন। শুধু উন্মীলনই মুক্তি।'
চোখ খুলল বিজয়।
'ঈশ্বরকে লাভ করতে হলে, তাঁকে দর্শন করতে হলে, শুধু ভক্তি হলেই হয়?' জিগগেস করল বিজয়।
'হ্যাঁ, পাকা-ভক্তি, প্রেমা-ভক্তি, রাগ-ভক্তি।' বললেন ঠাকুর, 'সোজা কথা, ভালোবাসা। যেমন ছেলের মা'র উপর ভালোবাসা। যতক্ষণ না এই ভালোবাসা জন্মায় ততক্ষণ ফটোগ্রাফের কাঁচে কালি মাখানো হয় না। ফটোগ্রাফের কাঁচে কালি মাখানো থাকলেই যা ছবি পড়ে তা রয়ে যায়। কিন্তু শুধু-কাঁচের উপর হাজার ছবি পড়ুক, একটাও থাকে না—একটু সরে গেলেই যেমন কাঁচ তেমনি কাঁচ।'
'ভালোবাসা এলে কী হয়?'
'ভালোবাসা এলে স্ত্রী-পুত্র আত্মীয়-স্বজনের উপর সে মায়ার টান থাকে না, দয়া থাকে। সংসারকে বিদেশ বোধ হয়, শুধু একটা কর্মভূমি, রঙ্গভূমি ছাড়া কিছু নয়। দেশলায়ের কাঠি যদি ভিজে থাকে, হাজার ঘষো, কোনো রকমেই জ্বলবে না—কেবল একরাশ কাঠিই লোকসান হবে। বিষয়াসক্ত মনই ভিজে দেশলাই—'
তাই শ্রীমতী যখন বললেন, জগৎ-সংসার আমি কৃষ্ণময় দেখছি, তখন সখীরা বললে, তুমি এ কী প্রলাপ বকছ! কই আমরা তো তাকে দেখতে পাচ্ছি না। শ্রীমতী বললেন, সখি, নয়নে অনুরাগ-অঞ্জন মাখো, তাকে দেখতে পাবে।
অনুরাগের ঐশ্বর্য কি কি?
অনুরাগের ঐশ্বর্য বিবেক, বৈরাগ্য, জীবে দয়া, সাধু সেবা, সাধু সঙ্গ, ঈশ্বরের নাম-গুণকীর্তন, সত্য কথা—এই সব।

'এই সব লক্ষণ দেখলে ঠিক বলতে পারা যায়, ঈশ্বরদর্শনের আর দেরি নেই। বাবু কোনো খানসামার বাড়ি যাবেন এরূপ যদি ঠিক হয়ে থাকে, তাহলে সেই খানসামার বাড়ির অবস্থা দেখেই ঠিক ঠিক বুঝতে পারা যায়। প্রথমে বন-জঙ্গল কাটা হয়, ঝুলঝাড়া হয়, ঝাঁটপাট দেওয়া হয়। বাবু নিজেই সতরঞ্চি গুড়গুড়ি এই সব পাঁচ রকম জিনিস পাঠিয়ে দেন। এই সব আসতে দেখলেই লোকের বুঝতে বাকি থাকে না, বাবু এই এসে পড়লেন বলে।'

কিন্তু হাজার চেষ্টা করো, তাঁর কৃপা না হলে কিছু হবার নয়। তিনি কৃপা না করলে তাঁকে দেখা তোমার সাধ্য কি।

'সার্জন সাহেব রাত্রে আঁধারে লণ্ঠন হাতে করে বেড়ায়—তার মুখ কেউ দেখতে পায় না। কিন্তু ঐ আলোতে সে সকলের মুখ দেখে, আর-সকলেও পরস্পরের মুখ দেখে। যদি কেউ সার্জনকে দেখতে চায়, তাহলে তাকে প্রার্থনা করতে হয়। বলতে হয়, সাহেব, কৃপা করে একবার আলোটি নিজের মুখের উপর ফেরাও, তোমাকে একবার দেখি।'

একটা মাতাল এসেছে রাম দত্তের বাড়িতে। নাম বিহারী ঘোষ।

'রাম দাদা, বলতে কি, চাটের পয়সা জোটে না, শুধু মদ খেয়ে বেড়াই—'

'আজ সন্ধ্যের সময় আসিস। তোকে লুচি আলুরদমের চাট খাওয়াবো।'

সেই সন্ধ্যের সময় এসেছে বিহারী। দেখলে বৈঠকখানায় ভিড়, কাকে ঘিরে উত্তেজিত স্তব্ধতা।

ও সব বুঝি না। আমাকে আমার লুচি আলুরদমের চাট কখন দেবে? বকতে লাগল বিহারী।

কে একজন বললে 'যা, পরমহংসদেবকে প্রণাম কর্ গিয়ে—'

মাতালের কি খেয়াল হল ঘরে ঢুকে প্রণাম করলে।

সেই হল তার চরম চাট খাওয়া।

এখন শুধু অঝোরে কাঁদে আর বলে, 'ভাই, শুধু তাঁর কথা বলো। আর কিছু ভালো লাগে না। মাতাল ছিলুম, লুচি আলুরদমের চাট খেতে চেয়েছিলুম, কিন্তু তিনি কী করে দিলেন? তাঁকে ছাড়া আর কিছু মনে আসে না। হায়, এমন অমূল্য রতন হাতে পেয়ে তখন কিছু বুঝিনি—লুচি আলুরদমের চাটকেই জীবনের সার ভেবেছিলুম—'

সে সব দিনের নিমন্ত্রণে তরকারিতে নুন দেওয়া হত না। আলুনি তরকারির পাশে আলাদা করে নুন থাকত পাতে। রামকৃষ্ণকে নিয়ে সকলে যখন পঙ্ক্তি ভোজনে বসছে, তখন চলবে নুন-দেওয়া তরকারি। রাম দত্তের বাড়িতেই প্রথম নিয়মভঙ্গ হল। একসঙ্গেই আহার চলল সকল শ্রেণীর। রামকৃষ্ণ এক ফুঁয়ে উড়িয়ে দিল জাতাজাতি। বললে, 'ভক্তির মধ্যে আবার জাত কি? সব একাকার।'

বন্যার জল যখন এসে পড়েছে তখন কে আর আল-পথ খুঁজে বেড়ায়?

মেয়েরাও আসছে দলে-দলে। এ এক অভিনব ব্যাপার। মুক্ত অঙ্গনে জ্যোতির্ময়কে দেখবার পিপাসায় বেরিয়ে আসছে পর্দার ঘেরাটোপ থেকে। আরো আশ্চর্য, কেবা

পুরুষ কেবা স্ত্রী—কারুই কোনো দেহজ্ঞান নেই। সবাই একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকছে মুখের দিকে। রামকৃষ্ণের সঙ্গে-সঙ্গে আর সবাইও যেন বিদেহ হয়ে গিয়েছে। হাঁটু দুটি উঁচু করে আসনখানির উপর বসে আহার করে রামকৃষ্ণ। স্ত্রী-পুরুষ কাতার দিয়ে দাঁড়িয়ে তাই দেখে।

'আগে কাপড় ঠিক থাকত না, বেভুল বে-এক্তিয়ার হয়ে থাকতাম। এখন সে ভাবটা প্রায় গেছে—' বলতে-বলতেই কখন দিগ্‌বসন হয়ে গেল রামকৃষ্ণ। বিরক্ত হয়ে বললে, 'আরে ছ্যাঃ, আমার ওটা আর গেল না—'

কিন্তু যারা দাঁড়িয়ে আছে সামনে, সবাইর অতীন্দ্রিয় ভাব। মেয়েরা পর্যন্ত নিঃসঙ্কোচ। একটি ছোট শিশু যদি উলঙ্গ হয়ে যায় তবে মা কি কুণ্ঠিত হন?

'আমি মাঝে-মাঝে কাপড় ফেলে আনন্দময় হয়ে বেড়াতাম।' বললেন ঠাকুর।

শম্ভু এক দিন বলছে, 'ওহে তুমি তাই ন্যাংটো হয়ে বেড়াও—বেশ আরাম! আমি এক দিন দেখলাম।'

কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল সুরেশ মিত্তির। বললে, 'আফিস থেকে এসে জামা চাপকান খোলবার সময় বলি—মা, তুমি কত বাঁধাই বেঁধেছ।'

'অষ্ট পাশ আর তিন গুণ দিয়ে বেঁধেছে।'

রামকৃষ্ণ শিশু।

'মাইরি, কোন শালা ভাঁড়ায়—' বালকের মতই শপথ করে মাঝে-মাঝে।

'বিষয়ী লোকদের সঙ্গে কথা বলতে কষ্ট বোধ হত বলে হৃদেকে দিয়ে পাড়ার ছোট-ছোট ছেলেদের ধরে আনতুম। খাবার-খেলনা দিয়ে ভুলিয়ে খেলা করতুম তাদের সঙ্গে। বেশ খেলছে, যাই একবার বললে, মা যাব, শালার ছেলেকে আর কে ধরে রাখে! তখন আবার হৃদেকে দিয়ে তার মা'র কাছে পাঠিয়ে দিই। মানুষের যদি এমনি টান হয় ভগবানের উপর, তাহলে কেউ আর তাকে রুখতে পারে না।'

কটির বসনখানি কখন বগলের নিচে চলে এসেছে। যুবক ভক্তদের লক্ষ্য করে বলছেন ঠাকুর, 'তোরা সব ইয়ং বেঙ্গল আসা অবধি আমি এত সভ্য হয়েছি যে সব সময়েই কাপড় পরে থাকি।'

'এই আপনার কাপড় পরা?'

'মাইরি আমি সভ্য হয়েছি—'

তখন তাঁর গা ছুঁয়ে দেখানো হল তিনি সত্যিই দিগবসন।

করুণ স্বরে বললেন ঠাকুর, 'মনে তো করি সভ্য হব কিন্তু মহামায়া যে অঙ্গে বসন রাখতে দেন না। সে কি আমার অপরাধ?'

প্রলয়পয়োধিতে বটপত্রের উপর শিশু নারায়ণ শুয়েছেন। তেমনি শুয়েছে রামকৃষ্ণ। দু পায়ের দু বুড়ো আঙুল মুখের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে শিশুর মত আনন্দ করছে। বালক-ভাবের চরম।

আবার কখনো শ্রীমতীর ভাব ধরে। অল্প পথ হেঁটেই ক্লান্তিতে ঢলে পড়ে। রাখালের কাঁধে ভর দিয়ে আস্তে-আস্তে যেতে-যেতে গান ধরে রামকৃষ্ণ। 'আর

চলিতে নারি, চরণ বেদন যে হল সখি! সে মথুরা কত দূর!'
সে মথুরা কত দূর! কোথায় সে প্রেমের অমরাবতী!
সুবল একটা বাছুর বুকে নিয়ে জটিলার কাছে উপস্থিত। বললে, 'মা একটু জল খাব।'
গোষ্ঠ-মিলন গান হচ্ছে। গাইছে নরোত্তম কীর্তনে।
জটিলা বললে—গানের সুরে—'সুবল রে, তোর সবই গুণ।'
অমনি রামকৃষ্ণ আখর দিল : 'তবে কালার সঙ্গে বেড়াস, ওই যা দোষ—'
'পাকশালায় যাও, বধূর কাছে জল পান করবে।' বললে জটিলা।
'সুবল তাই তো চায়—' আখর দিল রামকৃষ্ণ।
রান্নাঘরে সুবল গিয়ে দেখে উনুনের ধোঁয়ার ছলে শ্রীমতী কৃষ্ণ বিরহে কাঁদছে। সুবলকে দেখে চকিতে ব্যাপারটা বুঝতে পারল শ্রীমতী। সমরূপী সুবলের সঙ্গে তাড়াতাড়ি বেশ পরিবর্তন করল। বললে, গানের সুরে—'সুবল, সবই হলো, আমি যে নারী, কিরূপে বক্ষ ঢাকি বলো।'
রামকৃষ্ণ আখর দিচ্ছে, 'চিন্তা নাই, উপায় করে এসেছি—বাছুয়াকে বুকে এনেছি—ঐ দেখ দ্বারে বেঁধে রেখেছি—এরে বুকে করে তুমি চলে যাও—'
ওরে, তোরা আর কিছু না নিস, কৃষ্ণের প্রতি শ্রীমতীর এই টানটুকু নে—
সুরেশ মিত্তির এসে বললে, 'এক দিন আমার ওখানে চলুন।'
'তোর ওখানে যে যাব, গাইবার লোক আছে?' জিগগেস করলে রামকৃষ্ণ।
'কত! গাইয়ের আবার ভাবনা!' কথাটা উড়িয়ে দিল সুরেশ।
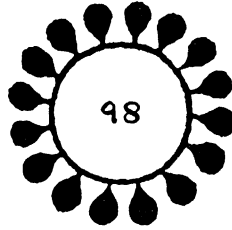
এ কে?
পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম, নাগ-যজ্ঞ-উপবীতী। সর্বাঙ্গে বিভূতি, নাগালঙ্কার। ধূম্র, পীত, শ্বেত, রক্ত আর অরুণ—পঞ্চ বর্ণের পঞ্চ মুখ। ত্রিনয়ন, জটাজূটধারী। শিরে গঙ্গা, ললাটে চন্দ্রকলা। বামকরে কপাল, পাবক, পাশ, পিনাক আর পরশু। দক্ষিণ করে শূল, বজ্র, অঙ্কুশ, শর আর বরমুদ্রা। লোচন আনন্দসন্দোহে উল্লসিত। কান্তি হিমকুন্দেন্দুসদৃশ। কোটিচন্দ্রসমপ্রভ। বৃষাসনে বিরাজিত। এ কে? এ তো সেই শিব-শান্ত উমাকান্তকে দেখছি।

সিমলে স্ট্রিটে সুরেশ মিত্তিরের বাড়িতে এসেছে রামকৃষ্ণ।

বেলফুলের গোড়ে মালা এনেছে সুরেশ। নিচের দিকে তোড়ার মত করা ফুলের থোপনা, মাঝে-মাঝে রঙিন ফুল আর জরির তবক। রামকৃষ্ণের গলায় মালাটি পরিয়ে দিয়ে পায়ের কাছে প্রণাম করল সুরেশ। কিন্তু সহসা রামকৃষ্ণের এ কী হল? মালা গলা থেকে খুলে দূরে ফেলে দিল রামকৃষ্ণ।

নিমেষে ম্লান হয়ে গেল সুরেশ। কী না-জানি সে সেবাপরাধ করে বসেছে। কিন্তু জলের গ্লাশে শশীর যখন পা ঠেকে গিয়েছিল তখন তো এত বিমুখ হয়নি রামকৃষ্ণ। সে-জল খেয়েছিল শান্ত মুখে।

সমাধি ভাঙবার পর এক ঢোঁক জল খায় রামকৃষ্ণ। যন্ত্রচালিতের মত হাত বাড়িয়ে দেয়, আর তক্ষুনি জল-ভরা গ্লাশটি এগিয়ে দেয় শশী। শশী মানে শশিভূষণ ভটচাজ, উত্তরকালের রামকৃষ্ণানন্দ। সে দিন রাম দত্তের বাড়িতে কি হল, তাড়াতাড়িতে জলের গ্লাশে পা ঠেকে গেল শশীর। জল বদলাবার আর সময় নেই, রামকৃষ্ণ হাত বাড়িয়ে দিয়েছে।

সেই জলের গ্লাশই এগিয়ে ধরল শশী। রামকৃষ্ণ তাই খেল নিশ্চিন্ত হয়ে।

শশীর অপরাধ তো জানিত অপরাধ। সুরেশ তো বুঝতেই পাচ্ছে না কোনখানে তার বিচ্যুতি হয়েছে। শশীর যদি ক্ষমা হয়, তবে তার কেন হবে না?

এই জলের গ্লাশে পা ঠেকে যাওয়া নিয়ে চিরকাল আক্ষেপ করেছে শশী। কিন্তু ঠাকুর তো জানতেন তার অন্তরের স্বচ্ছতা। তাই তো তাকে ক্ষমা করলেন অনায়াসে। সুরেশের মন কি তেমনি পরিষ্কার নয়?

জ্যৈষ্ঠ মাসের দুপুরে কাট-ফাটা রোদ্দুরে শশী এসে হাজির। মুখ-চোখ লাল, এক হাঁটু ধুলো। ঘাম ঝরছে গা বেয়ে। 'এ কি করেছিস তুই?' ঠাকুর ক্ষিপ্র হাতে তাকে পাখা করতে লাগলেন। 'এই রোদ্দুরে কেউ আসে?' শশী নিবৃত্ত করতে চায় ঠাকুরকে, ঠাকুর কোনো-কিছুই শুনতে রাজী নন। বোস একটু চুপ করে, আগে খানিক ঠাণ্ডা হ। গায়ের ঘাম মরেছে এতক্ষণে। বল এইবার কি বলবি।

বলবার কিছু নেই। এই দেখুন বরানগরের বাজার থেকে আপনার জন্যে কিছু বরফ কিনে এনেছি। চাদরের খুঁট খুলে এক টুকরো বরফ বের করল শশী।

ঠাকুরের আনন্দ তখন দেখে কে। বললেন, 'দেখ, দেখ। এই গরমে মানুষ গলে যায়, কিন্তু শশীর বরফ গলেনি। কি করে গলবে? শশীর ভক্তিহিমে বরফ জমাট হয়ে রয়েছে।'

ভক্তি-হিমে জল জমে যখন বরফ হয় তখনই ঈশ্বর সাকার। যখন জ্ঞান-সূর্যে গলে যায় বরফ, তখন আবার যে-জল সে-ই জল, তখন আবার তিনি নিরাকার। ভক্তের জন্যে তাঁর রূপ, জ্ঞানীর জন্যে অরূপ। কিন্তু দুয়ের জন্যেই সমান অপরূপ।

তবে কি সুরেশের ভক্তি নেই?

ভক্তমাল থেকে একটি গল্প বলল রামকৃষ্ণ। যে ভক্ত সে কী মনোভাব নিয়ে দান করবে। তার মধ্যে অভিমানের এতটুকু আঁশ থাকবে না। অহংকার ত্যাগ করলেই তবে ঈশ্বর ভার নেন। মালা যে দিলি মালার মধ্যে যে তোর একটু অহংকারের

জ্বালা আছে। মালার মধ্যে যে অনেক চেকনাই। অনেক কেরামতি। তারই জন্যে তোর মনের মধ্যে একটু অহংকারের জ্বর।

অহংকার হচ্ছে উঁচু ঢিপি। সেখানে কি জল জমে? জল জমে নিচু জমিতে, খাল জমিতে। সেই ঢিপিকে খাল করে দাও। তবেই জমবে ভক্তির জল।

সুরেশ কাঁদতে লাগল।

লাটু ছিল উপস্থিত। সে তাজ্জব বনে গেল। ঠাকুরের রসদদারদের মধ্যে একজন এই সুরেশ মিত্তির, তবু তার দান তিনি গ্রহণ করলেন না! আর, চেয়ে দেখ, তারই জন্যে কাঁদছে সুরেশ মিত্তির।

না কাঁদলে হবে কেন? কান্না দিয়ে পথের ধুলো ধুয়ে দিলেই তো তিনি আসবেন। ভক্তি-প্রদীপের তেলটিই তো অশ্রুজল।

এই যে বিশ্ব এ হচ্ছে বিস্তীর্ণ ব্যথার পত্রপট। ভক্তকে পাচ্ছেন না বলে ভগবানের কান্না। তাঁর অসীম শক্তির শুকনো রঙগুলি তিনি প্রেমের অশ্রুতে গুলে-গুলে এই বিচিত্র বর্ণবেদনার ছবি এঁকেছেন। মনের মধ্যে যদি সেই কান্না না থাকে তবে এ চিঠির মর্মোদ্ধার করব কি করে? এই চিঠির মধ্যেই তো আনন্দের সংবাদ।

কীর্তনে নিয়ে এসেছে সুরেশ। নিজে গান গেয়ে রামকৃষ্ণ তাকে উচ্চভাবে উদ্দীপ্ত করে তুলল। অর্ধবাহ্যদশায় এসে হঠাৎ সেই ত্যক্ত মালা গলায় পরে উঠে দাঁড়াল। গান ধরল গলা ছেড়ে :

'আর কী সাজাবি আমায়—
জগৎ-চন্দ্র-হার আমি পরেছি গলায়—'

ফের আখর দিতে লাগল : 'আমি জগৎ-চন্দ্র-হার পরেছি। অশ্রুজলে সিক্ত-করা জগৎ-চন্দ্র-হার পরেছি। প্রেমরসের ভাবন দেওয়া জগৎ-চন্দ্র-হার পরেছি—'

চোখের কান্না মুছে ফেলে চেয়ে দ্যাখ আমাকে। আমি দূরে আছি যে বলে, সেই নিজে দূরে রয়েছে। আমাকে দেখতে আবার নতুন কী আয়োজন হবে! দেখব বলে তাকালেই দেখতে পাবি চোখের উপর। 'ত্বমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং।' ইট কাঠ মাটি পাথর সব আমি। আকাশ বাতাস আগুন জল পাখি পতঙ্গ। একটা গাছ দেখছিস সামনে? ঐ বৃক্ষরূপে তো আমিই দাঁড়িয়ে। সমস্ত কান্নার পারে আমিই তো আনন্দ-তীর।

কিন্তু সে দিন সুরেশের বাড়িতে গাইয়ের যোগাড় নেই।

রামকৃষ্ণ শুধোলো : 'ভজন গাইতে পারে এমন কেউ নেই তোমাদের পাড়ায়?'

আছে বৈ কি। সুরেশ ব্যস্ত হয়ে খুঁজতে বেরুল। গৌর মুখুজ্জে লেনের বিশ্বনাথ দত্তের ছেলে নরেন।

নরেন তখন গানের স্রোতে ভাসছে। ভগবান আছে কি নেই জানি না, কিন্তু দেহ-ভরা প্রাণ আছে, কণ্ঠ-ভরা গান আছে। আর, এই প্রাণ আর গান এ যেন আর

কার দানোচ্ছ্বাস। তাই নরেন গায়, 'অচল ঘন গহন গুণ গাও তাঁহারি।' কখনো বা :

'মহাসিংহাসনে বসি শুনিছ হে বিশ্বপিতঃ,
তোমারি রচিত ছন্দ মহান বিশ্বের গীত।
মর্তের মৃত্তিকা হয়ে ক্ষুদ্র এই কণ্ঠ লয়ে
আমিও দুয়ারে তব হয়েছি হে উপনীত॥'

'ওরে বিলে, বাড়ি আছিস?' দরজায় সুরেশ মিত্তির দাঁড়িয়ে। ত্রস্ত-ব্যস্ত হয়ে কাছে এল নরেন। 'চল আমার বাড়ি চল। গান গাইবি।'

একবার গানের নাম শুনলেই হল, নরেন উচ্ছ্বলিত। ক'দিন বাদে একজামিন, দুপুর বেলা হয়তো পড়ছে নরেন, বন্ধু এসে বললে, রাত্তিরে পড়িস, এখন দুটো গান গা। তবে বাঁয়াটা নে—বলেই বই-টই ঠেলে ফেলে নরেন তানপুরা নিয়ে বসল। ইস্কুল-কলেজে টেবিল চাপড়ে বাজিয়েছে বলেই কি আর এখন বাঁয়া বাজাতে পারবে—গান শুনতে চেয়ে বন্ধু পড়ল মুশকিলে। মোটেই শক্ত নয়, এমনি করে শুধু ঠেকা দিয়ে যা—বাজনার বোল বলে দিল নরেন। ঠেকার অভাবে ঠেকবে না, নরেন তানে-লয়ে তন্ময় হয়ে গান ধরল উদার গলায়। কখন দুপুর গড়িয়ে গেল আস্তে-আস্তে, কিছু খেয়াল নেই—একটার পর একটা গান গেয়ে চলেছে অনবরত। সন্ধ্যায় আলো দিয়ে গেল চাকর, তবু আসর ভাঙছে না। রাত দশটায় এল খাবার তাড়া, তখনই বুঝি প্রথম হুঁস হল। দিব্য ভূমি থেকে নেমে এল স্থূল ভূমিতে।

গানই হচ্ছে একমাত্র জ্ঞান যে জ্ঞানের ওপারে একজন আছেন। জ্ঞানের ওপারে যিনি আছেন তাঁকে একমাত্র গান দিয়েই স্পর্শ করা।

অন্তরের কান্নাটিও একটি গান। আকুলতাটিও একটি সুর।

গানের নাম শুনেই কোমর বাঁধল নরেন। চলল সুরেশ মিত্তিরের বাড়িতে।

রামকৃষ্ণের সঙ্গে নরেন্দ্রের প্রথম দর্শন হল—সূর্যের সঙ্গে সমুদ্রের।

এ কে! চমকে উঠল রামকৃষ্ণ। এ যে তার সেই স্বপ্নে-দেখা সপ্তর্ষি মণ্ডলের ঋষি!

সে এক অপূর্ব দর্শন হয়েছিল রামকৃষ্ণের।

সমাধি অবস্থায় জ্যোতির্ময় পথ ধরে ঊর্ধ্বে নভোমণ্ডলে উঠে যাচ্ছে রামকৃষ্ণ। পার হল পৃথিবী, পার হল জ্যোতিষ্কলোক। ক্রমে-ক্রমে চলে এল সূক্ষ্মতর ভাবলোকে। যতই উপরে উঠছে, পথের দুপাশে দেখতে লাগল দেব-দেবীরা বসে আছেন। সেখানেও ঊর্ধ্বগতি ক্ষান্ত হল না। উঠে এল ভাবরাজ্যের চরম চূড়ায়। সেখানে দেখল একটি জ্যোতির রেখা দিয়ে দুটি বিশাল রাজ্যকে আলাদা করা হয়েছে। খণ্ড আর অখণ্ডের রাজ্য, দ্বৈত আর অদ্বৈতের দেশ। রামকৃষ্ণ অখণ্ডের রাজ্যে এসে ঢুকল। সেখানে আর দেব-দেবী নেই—দিব্য দেহের

অধিকারী হয়েও এখানে আসবার অধিকার নেই তাদের। অনেক নিচে ভাবলোকে তাদের বাসা। সেই অখণ্ডলোকে সাতটি ঋষি বসে আছে ধ্যানলীন হয়ে। প্রজ্ঞ, প্রবীণ ঋষি। আশ্চর্য হল রামকৃষ্ণ। যেখানে দেব-দেবী আসতে পারে না সেখানে এই ঋষিরা এল কি করে? বুঝল জ্ঞানে প্রেমে পুণ্যে পবিত্রতায় এরা দেবদেবীকেও হার মানিয়েছে। এদের মহত্ত্বচিন্তায় অভিভূত হল রামকৃষ্ণ। সহসা দেখতে পেল সেই অখণ্ডলোকের পরিব্যাপ্ত জ্যোতিপুঞ্জের কিয়দংশ ঘনীভূত হয়ে একটি দেব-শিশুর আকার নিলে। একটি অমলকান্তি দেবশিশু। দেবশিশুটি তার মৃদুল-কোমল বাহু দুটি দিয়ে একজন ঋষির গলা জড়িয়ে ধরল, তার ধ্যান ভাঙাবার জন্যে ডাকতে লাগল কলভাষে। ধ্যান ভাঙল ঋষির, আনন্দময় অনিমেষ চোখে দেখতে লাগল শিশুকে। এ যেন তার কত কালের প্রিয়ধন, তার হৃদয়রতন। কি যেন বলবে বলে এসেছে! প্রসন্ন-প্রভাত চোখ দুটি তুলে শিশু বললে ঋষিকে, 'আমি চললুম তুমি এস।' কোথায় চললে? পৃথিবীতে। তুমিও এস আমার পিছু-পিছু। স্নেহস্নাত চোখে চেয়ে থাকতে-থাকতে ঋষি আবার ধ্যানস্থ হল। রামকৃষ্ণ দেখল, ঋষির সেই দেহ থেকে একটি অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে জ্যোতির্বর্তিকা-রূপে নেমে গেল পৃথিবীতে।

নরেন্দ্রকে দেখেই চমকে উঠল রামকৃষ্ণ। এ যে সেই ঋষি!

তবে ঐ শিশুটি কে? শিশুটি স্বয়ং রামকৃষ্ণ।

বিবেকানন্দ ঋষি, রামকৃষ্ণ শিশু। তার মানে কি? বিবেকানন্দ পরিপূর্ণ জ্ঞান, রামকৃষ্ণ পরিপূর্ণ প্রেম। বিবেকানন্দ সংহত তেজ, রামকৃষ্ণ বিগলিত সারল্য। বিবেকানন্দ তাই হিমালয়, রামকৃষ্ণ মানস-সরোবর।
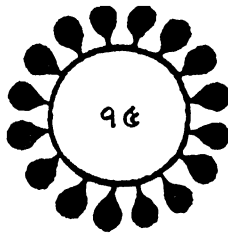
একটি ভজন গাইল নরেন। উন্মনা হয়ে গেল রামকৃষ্ণ। কাদের বাড়ির ছেলে? কোথায় থাকে? কোথা থেকে এসেছে? কি করে পথ চিনল এ গলির?

আরো একখানা গান হল।

এগিয়ে এল রামকৃষ্ণ। কাছে এসে নরেনের অঙ্গলক্ষণ দেখতে লাগল। বলল, কথার সুরে মিনতি মাখিয়ে বলল, 'একবারটি দক্ষিণেশ্বরে এসো আমার কাছে। কেমন, আসবে?'

উন্মনা হয়েই ফিরল দক্ষিণেশ্বরে। তার নিঃসঙ্গতার অন্ধকারে।
কে যেন নেই। কে যেন আসবে বলে আসেনি। দেখা দিয়েই চক্ষের পলকে পালিয়ে গেছে।
প্রতিক্ষণ উচাটন। প্রতিক্ষণ তার পায়ের শব্দ শুনছে উৎকর্ণ হয়ে। সে যে আসে আসে আসে। পৃথিবীর সমস্ত সুরে-ছন্দে তার আগমনী বাজছে। কিন্তু সে আসছে কই? দেখা দিচ্ছে কই চোখের সামনে! কোথায় সেই চারু-হারী-রুচির-মনোহর? রুচ্য রম্য কান্ত কাম্য? তাকে না দেখে কেমন করে থাকব?
অন্ধকারে তার গন্ধ টের পাচ্ছি, কিন্তু সে কি অন্ধকারে আমার কান্না শুনতে পাচ্ছে না? বিশ্ববীণায় সে এত সুর বুনছে, সেখানে কি বাজছে না এই গীতহারা নীরবতা?
'ওরে, তুই কে জানি না। কী হবে জেনে? তবু তুই একবার আয়। তোকে না দেখে যে থাকতে পারছি না। তোকে ছাড়া সব অন্ধকার। একেবারে একা।'
নির্জনে গিয়ে ডাক ছেড়ে কাঁদে রামকৃষ্ণ। যেমন ভিজে গামছা নিংড়োয় তেমনি করে বুকের ভিতরটা কে জোর করে নিষ্পীড়ন করছে। চোখে ঘুম নেই, মুখে রুচি নেই, সব সময়ে কেবল ইতি-উতি তাকায়, ঘন-ঘন নিশ্বাস ফেলে, কিন্তু সে আসে না।
সে শুধু আসে আসে আসে।
শেষকালে মা'র কাছে কেঁদে পড়ে রামকৃষ্ণ। মা, একবারটি তাকে এনে দে। ওকে না পেলে কেমন করে থাকব! কার সঙ্গে কইব আমার প্রাণের কথা? আমি রাজ্য চাই না, স্বর্গ চাই না, মোক্ষ চাই না, তুই শুধু ওকে এখানে নিয়ে আয়। আমি ওর কনককাঞ্চনছবি আর একবার দেখি।
রাত্রে শুয়ে আছে রামকৃষ্ণ, কে যেন তাকে তার গা ঠেলে তুলে দিল। বললে, 'আমি এসেছি।' রামকৃষ্ণ চেয়ে দেখল, নরেন।
ধড়মড় করে উঠে বসল। এসেছিস? এত রাত্রে, মধ্যরাত্রে? তাতে কি? তাই তো আমি আসি, যখন চরাচর সান্দ্র-স্তব্ধ, সুষুপ্তিগত। কিন্তু কই, কই তুই? কেউ নেই।
এই তুই সাকার, আবার তুই নিরাকার। এই তুই সমুপস্থিত গান, আবার তুই পলায়মান সুর! আর কত তোর পথ চেয়ে বসে থাকব? আমার ঘর নেই আমি পথই সার করেছি। তুই এসে আমাকে পথের খবর দিয়ে যা। কোন পথে মিলবে সেই পথপতিকে?
বয়ে গেছে নরেনের আসতে! তার এফ-এ পরীক্ষা হয়ে গিয়েছে, বাবা তার জন্যে এখন পাত্রী খুঁজছেন। তার খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই, সে চলেছে দক্ষিণেশ্বর! ধাপ-ধাড়া গোবিন্দপুর এর চেয়ে অনেক ভালো জায়গা।
কিন্তু বাবা শুধু পাত্রীই দেখছেন না, দেখছেন তার টাকার ওজনটা। মেয়েটি শামলা, তাই তার দশ হাজার টাকা জরিমানা। তা ছাড়া ছেলে দেখুন। ছেলে আমার সোনা-বাঁধানো হাতির দাঁত।

কিন্তু নরেন ঘাড়ে এক ঝাঁকরানি দিয়ে সব নস্যাৎ করে দিলে।
মেয়ে কালো বলে নয়, নয় বা বাবা পণ নিচ্ছেন বলে। সে বিয়ে করবে না কেননা সে ঈশ্বরসন্ধানে হবে দুর্গমের যাত্রী, দুরারোহ ও দুরবগাহের। সে-পথ ক্ষুর-ধারের মত নিশিত-দুস্তর।
বিশ্বনাথের সংসারেই প্রতিপালিত রাম দত্ত, তাকে তাই ধরলেন বিশ্বনাথ। বললেন, "বিলের ঘাড়ে একটু ঘি ডলো, কি এক গোঁ ধরেছে, বলছে বিয়ে করবে না—'
রাম দত্ত লাগল ঘটকালিতে। কিন্তু নরেন তো ঘট নয় যে কালি মাখাবে, নরেন আকাশ, তাতে লাগে না কিছু কামনার কালিমা।
'যদি সত্যি ধর্ম লাভ করতেই চাও তবে মিছে ব্রাহ্মসমাজে না ঘুরে দক্ষিণেশ্বরে যাও। মূর্তিমান ধর্মকে দেখে এসো।'
যেতে হয়তো যাব, তুমি বলবার কে! এমনিই ভাব নরেনের। তুমি বলবে বললেই যাব? তুমি কি আমার অভিভাবক? তুমি কি আমার বিবেক? আমার খুশি আমি যাব না।
নতুন গাড়ি হয়েছে সুরেশের। দুশো টাকা মাইনে হয়েছে রাম দত্তের। হাসি পায়, সব নাকি ঠাকুরের কৃপায়। এতই যখন কৃপা, নরেন ভাবল মনে-মনে, জগৎ-সংসারের সমস্ত দুঃখ-দারিদ্র্য এক দিনে দূর করে দিক না। তবে বুঝি কেমন ঠাকুর!
নতুন গাড়ি কিনে রামকৃষ্ণকে একদিন চড়াল সুরেশ।
সুরেশের বাড়ি এলে রামকৃষ্ণকে ঘিরে আজকাল ছেলে-ছোকরারা ভিড় করে। 'ছোট ছেলেগুলোকে আপনি বকাচ্ছেন—' সুরেশেরই বাড়িতে থাকে এক উচ্চপদস্থ কর্মচারী, সে একদিন হঠাৎ রামকৃষ্ণকে আক্রমণ করলে।
'তুমি কী করো?' শান্ত বয়ানে প্রশ্ন করল রামকৃষ্ণ।
'আমি আপনার মতো ছেলে বকাই না, আমি জগতের হিত করি।'
'যিনি এই বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করেছেন পালন করছেন তিনি কিছু বোঝেন না আর তুমি সামান্য মানুষ, তুমি জগতের হিত করছ? ঈশ্বরের চেয়ে তুমি বেশি বুদ্ধিমান?' চুপ করে গেল সরকারী চাকুরে।
সেই সরকারী চাকুরের পিছনে লেগে গেল পাড়ার ছেলেরা। কি হে, জগতের হিত করছ নাকি? কতটা হিত আজ করলে জগতের?
কৃষ্ণদাস পালকে জিগগেস করলে রামকৃষ্ণ, 'মানুষের কি কর্তব্য?'
কৃষ্ণদাস বললে, 'জগতের উপকার করব।'
'হ্যাঁ গা, তুমি কে?' বললে রামকৃষ্ণ, 'আর, কী উপকার করবে? আর, জগৎ কতটুকু গা, যে তুমি উপকার করবে?'
ঈশ্বরকে ভালোবাসাই জীবনের উদ্দেশ্য। ঈশ্বরে ভাব-ভক্তি মানেই ঈশ্বরে ভালোবাসা। নিষ্কাম কর্ম করতে-করতেই ঈশ্বরে ভক্তি-ভালোবাসা আসে। আর এই ভক্তি-ভালোবাসা থেকেই ঈশ্বরলাভ। এই ঈশ্বরলাভই মানুষের কর্তব্য। জগতের উপকার মানুষে করে না, তিনিই করছেন। যিনি চন্দ্র-সূর্য করেছেন,

যিনি মা-বাপের বুকে স্নেহ দিয়েছেন, মহতের চিত্তে দয়া দিয়েছেন, ভক্তের প্রাণে ভক্তি দিয়েছেন—তিনিই। বাপ-মা'র মধ্যে যে স্নেহ দেখ সে তাঁরই স্নেহ। দয়ালুর মধ্যে যে দয়া দেখ সে তাঁরই দয়া। তুমি কাজ করো আর না করো, তিনি কোনো না কোনো সূত্রে তাঁর কাজ করবেনই করবেন। তাঁর কাজ আটকে থাকবে না। জগতের দুঃখ দূর করবে তোমার স্পর্ধা কি? জগৎ কি এতটুকু? বর্ষাকালে গঙ্গায় কাঁকড়া হয় দেখেছ? তেমনি অসংখ্য জগৎ আছে—অফুরন্ত। যিনি জগতের পতি তিনিই সকলের খবর নিচ্ছেন। তোমার মিথ্যে মাথা ঘামাতে হবে না। তোমার কাজ হচ্ছে তাঁকে আগে জানা। তাঁর জন্যে ব্যাকুল হওয়া। শরণাগত হওয়া। ঈশ্বরদর্শনই জীবনের উদ্দেশ্য!

এমন নরদেহ ধারণ করেছ একবার ঈশ্বরদর্শন করবে না? এত কিছু দেখলে, এত কিছু ধরলে, দেখবে-না-ধরবে-না শুধু ঈশ্বরকে? জীবনে এত রোমাঞ্চ খুঁজছ, নেবে না একবার ঈশ্বর-শিহরণ?

গঙ্গার দিকে পশ্চিমের দরজায় কার ছায়া পড়ল।

কে? চঞ্চল হয়ে উঠল রামকৃষ্ণ। এ কার ছায়া? কার আভাতি?

আর কার! চোখের সামনে নরেন। সপ্ত ঋষির একজন।

সুরেশ মিত্তিরের গাড়িতে করে এসেছে। সঙ্গে সুরেশ, আরো ক'জন সমবয়সী ছোকরা। কিন্তু সকলের চেয়ে স্বতন্ত্র এই নরেন্দ্রনাথ। সকলের থেকে বিচ্ছিন্ন-বিযুক্ত। শরীরের দিকে লক্ষ্য নেই, বেশেবাসে উদাসীন, গায়ে ময়লা একখানা চাদর, বাইরের কোনো কিছুতে কৌতূহল নেই, সমস্ত কিছুর সঙ্গে অবন্ধন, সমস্ত কিছুই যেন তার শিথিল। শুধু ধ্যানের আবেশে চোখের তারা উপর দিকে উঠে আছে। ঘুমুলেও হয়তো সম্পূর্ণ বোজে না তার চোখ। চোখ সুমুখ-ঠেলা। দেখলেই মনে হয় ভিতরে কিছু আছে।

বিষয়ীর আবাস কলকাতায় এত বড় সত্ত্বগুণী আধার এল কোত্থেকে? সত্ত্বগুণই তো সিঁড়ির শেষ ধাপ। তার পরেই ছাদ।

এসেছিস? আয়—

মনের ব্যাকুলতা চেপে রাখল রামকৃষ্ণ। মেঝেতে মাদুর পাতা, বসতে বলল নরেনকে। যেখানে জলের জালা, তার কাছেই বসল নরেন। তার সহচর বন্ধুরাও বসল আশে-পাশে। কিন্তু তারা সব ডোবা-পুষ্করিণী। ডোবা-পুষ্করিণীর মধ্যে নরেন বড় দীঘি—যেন ঠিক হালদার পুকুর!

চুম্বকের টানে লোহা আসে, না, লোহার টানে চুম্বক ছোটে—কে করবে এ রহস্যের সমাধান? প্রিয়তন্ময় দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে রামকৃষ্ণ। বলে, 'একটা গান ধর।'

গান তো নয়, মানস-যাত্রী হংস। নরেনের সমস্ত শরীর যেন সুরে-বাঁধা সমস্ত প্রাণ-মন ঢেলে ধ্যানারূঢ় হয়ে সে গান ধরলে:

'মন চল নিজ নিকেতনে।
সংসার বিদেশে বিদেশীর বেশে
ভ্রম কেন অকারণে॥'

'আহা, কি গান' ভাবে উঠে গিয়েছিল রামকৃষ্ণ, নেমে এসে বললে, 'আরেকখানা গা।'
'যাবে কি হে দিন বিফলে চলিয়ে'—সুধা-ঢালা কণ্ঠে গান ধরল নরেন : 'আছি নাথ, দিবানিশি আশা পথ নিরখিয়ে॥'
পাখির ওড়াই যেমন বিশ্রাম, নরেনের গানই যেন ধ্যান। ও স্বতঃসিদ্ধ। নিত্যসিদ্ধ।
নিত্যসিদ্ধ হচ্ছে মৌমাছি। শুধু ফুলের উপর বসে মধু পান করে। তার মানে হরিরস পান করে, বিষয়-রসের দিকে যায় না।
মা, তোর কী কৃপা! তুই এত দিন পরে নিয়ে এসেছিস আমার মন-ঠাণ্ডা-করা আপন জন!
কালীঘরের খাজাঞ্চি ভোলানাথ মুখুজ্জেকে জিগগেস করেছিল রামকৃষ্ণ : 'নরেন্দ্র বলে একটি কায়েতের ছেলে, তার জন্যে আমার মন এমন হচ্ছে কেন? সে আমার কে!'
ভোলানাথ বললে, 'এর মানে ভারতে আছে। সমাধিস্থ লোকের মন যখন নিচে আসে, তখন সত্ত্বগুণী লোকের সঙ্গে বিলাস করে। সত্ত্বগুণী লোক দেখলে তবে তার মন ঠাণ্ডা হয়।'
আমি বিলাস করব। আমি শুঁটকে সাধু হব না।
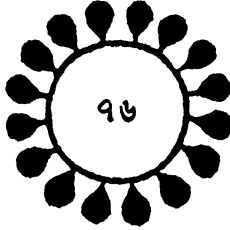
গান শেষ হওয়া মাত্র নরেনের হাত ধরল রামকৃষ্ণ। হাত ধরে টেনে আনল উত্তরের বারান্দায়। বাইরে থেকে বন্ধ করে দিলে ঘরের দরজা।
শীতকাল। উত্তুরে হাওয়া আটকাবার জন্যে থামের ফাঁকগুলো ঝাঁপ দিয়ে ঘেরা। নিশ্চিন্ত, নিরিবিলি জায়গা। ঘরের দরজা বন্ধ করে দেবার পর কারু সাধ্য নেই এখানে উঁকি মারে।
নিরিবিলিতে কিছু উপদেশ দেবে বোধ হয় রামকৃষ্ণ, নরেন তাই কৌতূহলী হয়ে রইল। কিন্তু এ কি, রামকৃষ্ণের মুখে কোনো কথা নেই। রামকৃষ্ণ কাঁদছে। আকুল হয়ে কাঁদছে। যেন কত দিনের গভীর পরিচয়, বলছে তেমনি স্নেহস্বরে, 'এত দিন কোথায় ছিলি?'
নিঃশব্দ বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে রইল নরেন।

'তোর কি মায়া-দয়া নেই? এত দিন পরে আসতে হয়! কত ক্ষণ থেকে দিন, দিন থেকে মাস, মাস থেকে বছর আমি তোর জন্যে বসে আছি—তোর তা খেয়াল নেই। তোর মনে পড়ল না আমাকে?' নরেনের হাত ধরে বিলাপের মত করে বলছে, কিন্তু আসলে এ আনন্দ-প্রলাপ। এ দুঃখ প্রীতিকণ্টকিত দুঃখ। এ অশ্রু স্নেহার্দ্রগাঢ় সুধাধারা।

এ বাণী নবনীসমানা অমিয় বাণী।

'বিষয়ী লোকের কথা শুনে-শুনে আমার কান পুড়ে গেল। প্রাণের কথা আর কাউকে বলা হল না। বলতে না পেয়ে এই দ্যাখ আমার পেট ফুলে রয়েছে। এইবার তুই এসেছিস, এবার বাহির দুয়ারে কপাট লেগে ভিতর দুয়ার খুলে যাবে। হরিকথারতিতে কেটে যাবে দিন-রাত। তুই এসেছিস, তার মানে ভক্তের হৃদয়ে ভগবান বিশ্রাম করতে এসেছে। ভক্তের হৃদয়েই তো ভগবানের বিশ্রাম।'

নরেন চিত্রলিখিতের মত দাঁড়িয়ে রইল। নিস্পন্দ, নিঃসাড়।

'মাকে সে দিন অনেক করে বললাম। কামিনী-কাঞ্চনত্যাগী শুদ্ধ ভক্ত না পেলে কেমন করে থাকব পৃথিবীতে? কার সঙ্গে কথা কইব? কাঁদতে-কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়লাম। তারপর কী হল জানিস না বুঝি?'

নরেন তাকিয়ে রইল উৎসুক হয়ে।

'মাঝ রাতে তুই এলি আমার ঘরে। আমায় তুললি গা ঠেলে। বললি, আমি এসেছি।'

'কই আমি তো কিছু জানি না।' নরেনের মুখে হাসির একটি রেখা ফুটল। বললে, 'আমি তো আমার কলকাতার বাড়িতে তখন তোফা ঘুম মারছি।'

'তুমি জানো না বৈ কি। তুমি যদি না জানো, তবে আর কে জানে!' রামকৃষ্ণ সহসা হাত জোড় করল। দেববন্দনার ভঙ্গিতে বলতে লাগল, 'কিন্তু আমি জানি প্রভু, তুমি সেই পুরাণ পুরুষ, তুমি মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি, তুমি নররূপী নারায়ণ। তুমি আমার জন্য রূপধারণ করে এসেছ। শুধু আমার জন্য নয়, সমস্ত জীবের জন্য এসেছ। এসেছ সমস্ত ভুবনের দৈন্যদুঃখদুরিত দূর করতে—প্রণতজনের ক্লেশহরণ করতে—'

কে এ উন্মাদ! নইলে আমি সামান্য বিশ্বনাথ দত্তের ছেলে, আমাকে এ সব কথা বলছে! কে এ বচনরচনপটু! এ সব কি আমি প্রহেলিকা শুনছি? আমি আছি তো আমার মধ্যে? নরেন স্থান-কাল একবার যাচাই করে নিল। সব ঠিক আছে। শুধু পাত্রই অপ্রকৃতিস্থ। লোকে যে বলে দক্ষিণেশ্বরে এক পাগলা বামুন আছে, ঠিকই বলে।

পাগল নয় তো কি! পাগল না হলে কি মানুষের মধ্যে ঈশ্বর দেখে! যাকে দেখা যায় না শোনা যায় না তার জন্যে অশ্রুবর্ষণ করে কেউ? এমন কাণ্ডজ্ঞান-শূন্যের মত কথা বলে?

কিন্তু পাগল বলে এক কথায় উড়িয়ে দেবার মত সায় পায় না মনের মধ্যে। পাগল কি এমন হিরণ্ময় হয়? হয় কি এমন পুলকোদ্ভিন্নসর্বাঙ্গ? বচনে কি এত

মধু থাকে? কথা কি হয় শ্রবণমঙ্গল? এমন লোকার্তিহর হাসি কি তার মুখে থাকে? কণ্ঠে ও চাহনিতে, স্পর্শে ও কাতরতায় থাকে কি এমন মেদুরমেঘের মমতা, অমৃতবর্ষণ স্নেহ?

কে জানে! কী হবে বিচার-বিতর্ক করে? এ যেন এক তর্কাতীত, তত্ত্বাতীত অনুভূতি। শুধু দেখা যাক। শুধু শোনা যাক। নিরুদ্ধ নিশ্বাসে থাকি শুধু নিশ্চল হয়ে।

'তুই একটু বোস। তোর জন্যে খাবার নিয়ে আসি।' দরজা ঠেলে ঘরের মধ্যে ঢুকল রামকৃষ্ণ।

চকিতে ফিরে এল খাবারের থালা নিয়ে। প্রায় পাগলের ব্যাকুলতায়। যদি এই ফাঁকে পালিয়ে যায় ননীচোর! যদি অন্ধকারে অন্তর্ধান করে!

না, চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে নরেন। বর্তমান-ভবিষ্যৎ কিছুই নির্ণয় করতে পারছে না। শুধু ভাবছে, আমি কি সার্ধ-ত্রিহস্ত পরিমিত মাংসপিণ্ডময় সামান্য একটা দেহ? না, কি আমি বিরাট, আমি মহান, আমি অনন্তবলশালী পরমাত্মা?

থালায় কতগুলি সন্দেশ, মাখন আর মিছরি। হাতে করে নরেনের মুখের কাছে খাবার তুলে ধরল রামকৃষ্ণ। বললে, 'খা, হাঁ কর।'

'সে কি, আমার বন্ধুরা যে রয়েছে সঙ্গে।' মুখ সরিয়ে নিতে চাইল নরেন। 'দিন, আমার হাতে দিন, ওদের সঙ্গে ভাগ করে খাই।'

কে শোনে কার কথা।

'হবে'খন, ওরা খাবে'খন পরে—আগে তুমি খাও।' জোর করে মুখে পুরে দিতে লাগল রামকৃষ্ণ।

কৌশল্যা হয়ে রামকে খাইয়েছি, যশোদা হয়ে ননীগোপালকে। খা, এই নে আমার হৃদয়বেদ্য নৈবেদ্য। তুই জানিস না তুই কে? তুই সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্তী নারায়ণ।

জোর করে সবগুলি খাবার খাইয়ে দিলে।

'বল, আবার আসবি। দেরি করবি না একেবারে! ঠিক তো?' রামকৃষ্ণ মিনতি জানাল। বললে, স্বর নামিয়ে বললে, 'কিন্তু দেখিস, একা-একা আসবি।'

পাগল? কিন্তু এমন দরদী-মরমী হয় কি করে? কথা কি করে হয় এমন অমিয়জড়িত?

'আসব।'

'আর শোন, একটু বেশি-বেশি আসবি। প্রথম আলাপের পর বরং একটু ঘন-ঘনই আসে। কেমন, আসবি তো?'

'চেষ্টা করব।'

ঘরের মধ্যে ফের চলে এল দুজনে। একদৃষ্টে নরেন দেখতে লাগল রামকৃষ্ণকে। পাগল কি এমন সদালাপ করে, পাগলের কি ভাবসমাধি হয়? পাগল কি ঈশ্বরের জন্যে পাগল হয়?

'লোকে স্ত্রী-পুত্রের জন্যে ঘটি-ঘটি চোখের জল ফেলে,' বলতে লাগল রামকৃষ্ণ,

'কিন্তু ঈশ্বরের জন্যে কাঁদে কে? কাশী যাওয়া কী দরকার যদি ব্যাকুলতা না থাকে। ব্যাকুলতা থাকলে এইখানেই কাশী। এত তীর্থ, এত জপ, হয় না কেন? যেন আঠারো মাসে বৎসর। হয় না তার কারণ, ব্যাকুলতা নেই। যাত্রার গোড়ায় অনেক খচমচ-খচমচ করে, তখন শ্রীকৃষ্ণকে দেখা যায় না। তারপর নারদ ঋষি যখন ব্যাকুল হয়ে বৃন্দাবনে এসে বীণা বাজাতে-বাজাতে ডাকে আর বলে, প্রাণ হে গোবিন্দ মম জীবন! তখন কৃষ্ণ আর থাকতে পারেন না। রাখালদের সঙ্গে সামনে আসেন আর বলেন, ধবলী রও! ধবলী রও!'

'দেখা যায় ঈশ্বরকে?' কে একজন জিগগেস করলে।

'তিনি আছেন, আর তাঁকে দেখা যাবে না? যেকালে তিনি আছেন সেকালে দ্রষ্টব্য হয়েই আছেন।'

'আছেন?'

'জগৎ দেখলেই বোঝা যায় তিনি আছেন। কিন্তু তাঁর বিষয়ে শোনা এক, তাঁকে দেখা আর-এক। কিন্তু দেখার উপরেও বড় কথা আছে, তাঁর সঙ্গে আলাপ করা। কেউ দুধের কথা শুনেছে, কেউ দেখেছে, কেউ খেয়েছে। দেখলেই আনন্দ, খেলেই বল-পুষ্টি।'

সমস্ত যেন প্রত্যক্ষ করেছে এমনি প্রজ্বলন্ত অনুভূতি। পাগল বলতে চাও বলো কিন্তু তার ঊর্জস্বান ত্যাগ দেখ। ঈশ্বরের জন্যে সর্বস্বত্যাগ। দেখ তার আয়সী-কঠিন পবিত্রতা। তার অমল-ধবল আনন্দ। তার অতল-গভীর শান্তি। এ যদি পাগল হয় তবে পাগলের আরেক নাম সচ্চিদানন্দ।

নরেনের মনে হল পরম তীর্থে বসে আছি। যার দ্বারা মানুষ দুঃখ থেকে পার হয় তার নাম তীর্থ। জল ত্রাণ করে না, উলটে ডুবিয়ে মারে। নৌকোই তীর্থ, সেই উত্তীর্ণ করে দেয় নদ-নদী। রামকৃষ্ণ সেই ভবসাগরতারণি। সকল তীর্থের সার।

এবার উঠতে হয় নরেনের।

প্রণাম করল। প্রেমস্মিতস্নিগ্ধহাস্যে তাকিয়ে রইল রামকৃষ্ণ।

কোথায় আর যাবি, কত দূর? তোকে এই তীর্থপ্রদ পাদসরোজপীঠে আসতেই হবে বারে-বারে। তোকে নির্বিতর্ক হতে হবে, নিঃসংশয় হতে হবে। অবগাহন করতে হবে এই করুণাঘন অগাধ সমুদ্রে। বেরুতে হবে জগজ্জয়ের মশাল নিয়ে। আজ যা।

'আর কোনো মিঞার কাছে যাইব না।' গাজীপুর থেকে লিখছে বিবেকানন্দ: 'এখন সিদ্ধান্ত এই যে—রামকৃষ্ণের জুড়ি আর নাই, সে অপূর্ব সিদ্ধি আর সে অপূর্ব অহেতুকী দয়া, সে ইণ্টেন্স সিম্প্যাথি বদ্ধজীবনের জন্য—এ জগতে আর নাই।...তাঁহার জীবদ্দশায় তিনি কখনো আমার প্রার্থনা গরমঞ্জুর করেন নাই—আমার লক্ষ অপরাধ ক্ষমা করিয়াছেন—এত ভালোবাসা আমার পিতা-মাতায় কখনো বাসে নাই। ইহা কবিত্ব নহে, অতিরঞ্জিত নহে, ইহা কঠোর সত্য এবং তাঁহার শিষ্যমাত্রেই জানে। বিপদে, প্রলোভনে, ভগবান রক্ষা করো, বলিয়া কাঁদিয়া সারা

হইয়াছি—কেহই উত্তর দেয় নাই—কিন্তু এই অদ্ভুত মহাপুরুষ বা অবতার বা যাই হউন, নিজে অন্তর্য্যামিত্বগুণে আমার সকল বেদনা জানিয়া নিজে ডাকিয়া জোর করিয়া সকল অপহৃত করিয়াছেন। যদি আত্মা অবিনাশী হয়—যদি এখনো তিনি থাকেন, আমি বারংবার প্রার্থনা করি, হে অপারদয়ানিধে, হে মমৈক-শরণদাতা রামকৃষ্ণ ভগবন, কৃপা করিয়া আমার এই নরশ্রেষ্ঠ বন্ধুবরের সকল মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করো। আপনার সকল মঙ্গল, এ জগতে কেবল যাঁহাকে অহেতুক দয়াসিন্ধু দেখিয়াছি, তিনিই করুন।'

আজ যা। আবার আসিস। দেখিস দেরি করিস নে যেন।

'মনের কথা কইবো কি সই কইতে মানা
দরদি নইলে প্রাণ বাঁচে না।
মনের মানুষ হয় যে জনা
নয়নে তারে যায় গো চেনা
সে দু-এক জনা।
সে যে রঙে ভাসে প্রেমে ডোবে
করছে রসের বেচাকেনা॥
মনের মানুষ মিলবে কোথা
বগলে তার ছেঁড়া কাঁথা,
ও সে কয় না কথা।
মনের মানুষ উজান পথে করে আনাগোনা॥'

কেশব সেনকে বললে রামকৃষ্ণ : 'জগদম্বা তোমাকে একটা শক্তি, মানে বক্তৃতা-শক্তি, দিয়েছেন বলে তুমি জগৎমান্য হয়েছ, কিন্তু মা দেখাচ্ছেন নরেন্দ্রের ভিতর আঠারোটা শক্তি আছে। নরেন্দ্র খানদানি চাষা, বারো বছর অনাবৃষ্টি হলেও চাষ ছাড়ে না।'

নরেন্দ্র খাপখোলা তরোয়াল।

মাছের মধ্যে নরেন্দ্র রাঙাচক্ষু বড় রুই—আর সব পোনা, কাঠিবাটা। অন্যেরা কলসী-ঘটি, নরেন্দ্র জালা।

'ওর মদ্দের ভাব—পুরুষভাব; আর আমার মেদি ভাব—প্রকৃতিভাব।'

ওরে, আয়, দেখা দে। সেই যে আসবি বলে গেলি, আর এলি না। আমি যে তোর জন্যে পথ চেয়ে বসে আছি। তুই এলে আমি বিহ্বল হই, বিবশ হয়ে পড়ি; জানি, সব জানি, তবু তুই আয়।
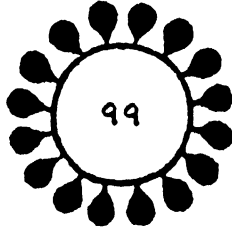
বাড়ি ফিরে এল নরেন। ফিরে এল তার নিভৃত ঘরের অন্ধকারে।

চক্ষু মেলে কী দেখে এল সে দক্ষিণেশ্বরে! বৈরস্য ও নৈরাশ্যের মরুভূমিতে এ কে সজলতা ও সরসতার অভিষেক! দৈন্য ও মালিন্যের মাঝে এ কে প্রসাদপবিত্র আনন্দ! ধূলি ও গ্লানির রাজ্যে নির্মলশ্যামল নির্মুক্তি! নিত্য অভাবের দেশে অমৃতপুঞ্জিত পরিপূর্ণতা! স্বপ্ন দেখে এল না কি নরেন? না কি রঙ্গমঞ্চের অভিনয়?

যাই বলো, পাগল ছাড়া কিছু নয়। পাগল না হলে বলে কি না ঈশ্বরকে দেখা যায় স্বচক্ষে? কি করে দেখবে? যে নির্বিকার নিরাধার গুণাতীত লোকাতীত, যে অবাঙমনসগোচর, সে কখনো ধরা দেয় চোখের সমুখে? তুমি দাঁড়াও, আমি দেখি—বললেই সে কি আকারিত হয়? যে অকায়, তার আবার আকার কি! যে অসঙ্গ তার আবার সীমা কোথায়! যে অরূপ সে তো দিগদেশ-কালশূন্য।

নরেন পড়েছে, যা আত্মা তাই ঈশ্বর। আত্মা অজ, তার জন্ম নেই। অমর, তার মৃত্যুও নেই। নিরবয়ব বলেই অজ। নির্বিকার বলেই অবিনাশী। এ হেন যে আত্মা সে আবার মূর্তি ধরবে কি? মূর্তি ধরলে কোন মূর্তি ধরবে? যে ব্যাপী তার পরিচ্ছেদ কোথায়, পৃথকত্ব কোথায়?

কিন্তু এমন ভাবে বললেন, উড়িয়ে দেওয়া যায় না। সেই স্থির-স্নিগ্ধ উজ্জ্বল দুই চক্ষের আলোয় কোথাও যেন এতটুকু ছায়া থাকে না সন্দেহের। দেখা যায় ঈশ্বরকে—এ যেন চোখের সামনে এই দেয়াল দেখার মত। ভোরে উঠে সূর্য দেখার মত। রাত্রে উঠে অন্ধকার দেখার মত। কথার মধ্যে এতটুকু গায়ের জোর নেই, এ যেন সরল জল-ভাত। এ যেন বিশ্বাসের পাষাণে আন্তরিকতার শিলালিপি। সত্যের কষ্টিপাথরে সারল্যের স্বর্ণাক্ষর।

কিন্তু কি হলে, কি করলে দেখা দেবেন ঈশ্বর? খুব করে বিনতি-মিনতি করব? স্তুতি-চাটুক্তি করব? তা হলেই কি ঈশ্বর কান পাতবেন? মিথ্যে কথা। আমাকে যদি কেউ খোশামোদ করে, আমি তো বেজায় চটে যাই। যা আমার কাছে বিরক্তিকর, তাই ঈশ্বরের কাছে সুখকর হবে? আর, নিজেকে যে অত্যন্ত ছোট বলে ভাবব সেটাও তো মিথ্যে ভাবা হবে। আমিই তো দীনের দীন হীনের হীন নই—আমার চেয়েও তুচ্ছ, আমার চেয়েও অধম লোক আছে অনেক সংসারে। তাই মিথ্যে কথায় বাজে কথায় ঈশ্বর মুগ্ধ হবেন এ ক্ষুদ্রতা যেন আমার না হয়!

তা ছাড়া আমার চেয়ে অনেক যিনি বেশি বোঝেন, তিনি আমারই আদেশ-অনুরোধের অপেক্ষা করছেন, এ বুদ্ধি স্পর্ধার নামান্তর। তিনি কি করবেন না-করবেন তা আমার বলা না-বলায় ঠিক হবে না। তাই যতই কেননা 'দেখা দাও' 'দেখা দাও' বলে দেয়ালে মাথা ঠুকি, মাথাই ভাঙবে, দেয়াল নড়বে না একচুল।

ঈশ্বর কি একটা বস্তু? একটা দ্যুতি? একটা দ্যোতনা? তাঁকে কি করে দেখা যাবে?

তাঁকে দেখা যায় না। তিনি কি শিলা, না দারু, না ভূমি? তিনি কি কাঠ-খড়, না তাম্র-পিত্তল?

আর, তাঁকে দেখেই বা আমার কী লাভ! তাঁকে দেখলেই কি আমার তাপ-ত্রয় ঘুচে যাবে? তাই যদি হত, তবে এত যাঁর করুণা আর ঐশ্বর্য, তিনি দর্শন দিয়ে সমস্ত জীব-জগৎকে একযোগে মুক্ত করে দিতেন। লোকের শোক-ক্রন্দন দৈন্য-অনুনয়ের জন্যে বসে থাকতেন না।

কে বলে তিনি প্রত্যক্ষীভূত নন? 'বল দেখি রে তরুলতা, আমার জগজ্জীবন আছেন কোথা?'—এ কান্নার প্রয়োজন কি! তিনি তো হাতের কাছেই আছেন, এই আমার চোখের কাছে। তাঁকে আবার দেখব কি, পাব কি! তাঁকে তো প্রতিক্ষণেই দেখছি, প্রতিক্ষণেই তো ডুবে রয়েছি, মিশে রয়েছি তাঁতে। যিনি সর্বত্রস্থ, তাঁর আবার দূর-নিকট কি—যিনি সর্বব্যাপী, তিনি তো অন্তরে-বাহিরে সমান বর্তমান। তিনি তো আমার মধ্যেও আছেন। চমকে উঠল নরেন। মনে পড়ল দক্ষিণেশ্বরের সেই স্তববাণী : 'তুমিই সেই পুরাণ পুরুষ, তুমিই সেই নররূপী নারায়ণ—'

আমিই সেই?

'চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহং?' আমিই কি সেই ওঙ্কারগম্য সঙ্গহীন শিব? মনোবাগতীত প্রকাশস্বরূপ? নিরাকার, অত্যুজ্জ্বল, মৃত্যুহীন?

কে বলে?

উন্মাদ! যে বলে সে উন্মাদ ছাড়া আর কিছু নয়! কিন্তু যদি সে উন্মাদ তবে সে এত ভালোবাসে কেন? চেনে-না-শোনে-না, নিজেকে লুকিয়ে-রাখে-সরিয়ে-রাখে, অথচ আলো-বাতাসের মত আপ্রাণ ভালোবাসে, সে কি উন্মাদ?

দূর ছাই, ভাবব না তার কথা। কিন্তু না ভেবে থাকো তোমার সাধ্য কি। থেকে-থেকেই সে লোক কেবল উঁকিঝুঁকি মারে। বলে, যদি তুমি আছ তা হলে আমিও আছি।

যদি আমি আছি তা হলে তুমিও আছ! এই 'তুমি'টির কি কোনো মানস মূর্তি নেই? নেই কোনো মানুষ মূর্তি? থেকে-থেকেই ঠাকুরের মোহন মূর্তি দেখা দেয় চোখের সামনে। দয়াঘন আনন্দকন্দ জগদ্বন্ধু।

দূর ছাই, যাই আরেকবার দক্ষিণেশ্বর। তাঁকে আরেকবার দেখে আসি।

এ কি শুধু অলস কৌতূহল, না, আর কোনো অনিবার্য আকর্ষণ? যদি আকর্ষণই

হয় তবে এর পেছনে যুক্তি কি? চুম্বক লোহাকে টানে, সূর্যে-চন্দ্রে জোয়ার-ভাটা খেলে এর মধ্যে সংগত ব্যাখ্যা কোথায়? আর যারই উদ্দেশ্য-উপলক্ষ থাক, ভালোবাসা অহেতুক। তিনি যে ভালোবাসেন। তাঁর ভালোবাসায় যে হিসেব নেই, জিজ্ঞাসা নেই।
সূর্যের আলোতেই যেমন সূর্যকে দেখি তেমনি তাঁর করুণাতেই তাঁকে দেখব।
মাস খানেক পরে আবার এক দিন হাজির হল দক্ষিণেশ্বরে। পথ যেন আর শেষ হতে চায় না। কে জানত এত দূরের রাস্তা আর এত কণ্টকর! সেদিন সুরেশ মিত্তিরের গাড়িতে করে এসেছিল বলে বুঝতে পারেনি। যাই, ফিরে যাই। বৃথা এই সন্ধান-ক্লান্তি। পথশ্রমের হয়তো শেষ আছে কিন্তু পণ্ডশ্রমের শেষ কই। কিন্তু, যাই বলো, নেই আর ফিরে যাওয়া। চুম্বকের টানের কাছে লোহা নিরুপায়, সূর্য-চন্দ্রের কাছে নদী ইচ্ছাশূন্য। এ গতি নিরঙ্কুশা। এ গতি কৃষ্ণাকর্ষী।
দক্ষিণেশ্বর কোন দিকে যাব বলতে পারেন?
আরো উত্তরে যাবে। সেখানেই আছেন সেই লোকোত্তর। উত্তর দেবেন সুদক্ষিণ বলে।
সেদিনের মতই ছোট তক্তপোশটিতে বসে আছে রামকৃষ্ণ। যেন কার জন্যে অপেক্ষা করে বসে আছে। ঘরে লোক-জন নেই। যেন কথা কইবার লোক নেই সংসারে। উদাস, নিরালম্বের মত চেয়ে আছে শূন্য চোখে। যেন উৎকর্ণ হয়ে শুনছে কার পদধ্বনি।
তুই এসেছিস? নরেনকে দেখে আহ্লাদে ফেটে পড়ল রামকৃষ্ণ। আয়, আয়, বোস আমার পাশটিতে। মুখখানি শুকিয়ে গেছে দেখছি। কিছু খাবি?
একটু দূরে কুণ্ঠিত হয়ে বসল নরেন। রামকৃষ্ণ সরে আসতে লাগল। তোর কুণ্ঠা, কিন্তু আমার অজস্রতা। তুই দূরে বসিস আর আমি সরে-সরে আসি। চুম্বকই শুধু লোহাকে টানে না, লোহাও ডাকে চুম্বককে।
পাগল না-জানি অদ্ভুত কি করে বসে তারই ভয়ে সঙ্কুচিত হল নরেন। ঠিক তাই, রামকৃষ্ণ তার ডান পা নরেনের গায়ের উপর তুলে দিলে। মুহূর্তে কী যে হয়ে গেল বোঝা গেল না। মনে হল দেয়াল-দালান সব যেন মহাবেগে উড়ে চলেছে, বিরাট আকাশের ব্যাপ্তির মধ্যে মিশে যাচ্ছে এই ক্ষুদ্র আমিত্বের অস্তিত্ব। আতঙ্কে বিহ্বল হয়ে পড়ল নরেন। আমিত্বের নাশই তো মৃত্যু। সেই মৃত্যুই বুঝি এখন উপস্থিত।
চেঁচিয়ে উঠল নরেন : 'ওগো, তুমি আমার এ কী করলে? আমার যে মা-বাপ আছেন।'
খল-খল করে হেসে উঠল রামকৃষ্ণ। তাই আছে না কি? যখন তোর সঙ্গে প্রথম দেখা হয়েছিল, জিজ্ঞাসাও করিনি, তোর বাপের নাম কি? তোর বাপের কখানা বাড়ি? আয়-আদায় কত?
আমার মদ খাওয়া নিয়ে কথা। যেখানে আমার এক বোতলেই কাজ হয়ে যায়, সেখানে শুঁড়ির দোকানে কত মণ মদ আছে সে হিসেবে আমার দরকার কী!

নরেনের আর্তস্বর কি রকম যেন লাগল বুকের মধ্যে। তার বুকে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল রামকৃষ্ণ। স্নেহস্নাত করুণাকোমল হাত।
'তবে থাক, এখন থাক, একেবারে কাজ নেই। কালে হবে। আস্তে-আস্তে হবে।'
অমনি নিমেষে আবার সব স্বাভাবিক হয়ে গেল। সেই ঘর সেই দেয়াল—সেই সব এখানে-ওখানে। তবে এটা কী হয়ে গেল চকিতের মধ্যে? ভোজবাজি? এই কি যন্ত্র-তন্ত্র-ইন্দ্রজাল?
না, কি এই জীবনেই জন্মান্তর ঘটে গেল নরেনের?
কিছু না, কিছু না। হিপ্‌নটিজম জানে লোকটা, তারই প্রভাবে সহসা সম্মোহিত করে ফেলেছে।
তাই বা মেনে নিতে মন সায় দিচ্ছে কই? আমি এমন একজন দৃঢ়কায় লোক, এত আমার মনের জোর, আমিই এত সহজে অভিভূত হয়ে পড়ব? যাকে পাগল বলে ঠাউরেছি, হব তারই হাতের পুতুল? কে জানে কি শক্তি ধরে লোকটা, দরকার নেই তার কাছে এসে, ভেলকি লাগিয়ে কি অঘটন ঘটায় তার ঠিক কি!
অমনি পরমুহূর্তেই মন আবার রুখে দাঁড়াল। পালিয়ে যাবার কোনো মানে হয় না। লোকটা যদি পাগলই হয় তবে প্রমাণ করতে হবে সেই পাগলামি। কঠিন-কঠোর পাথরকে যে এক নিমেষে এক তাল কাদা বানাতে পারে এক কথায় তাকে পাগল বললেই তার ব্যাখ্যা হয় না। শিশুর অধিক সারল্য, মা'র অধিক ভালোবাসা আর ফুলের অধিক শুচিতা—এদের সমাহারে পাগলামির জন্ম হয় এ কখনো শুনিনি। না, বিচার-বিশ্লেষণ করে একটা শান্ত সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছুতেই হবে। দাঁড়াতে হবে এ প্রশ্নের মুখোমুখি, করতে হবে এ রহস্যের উন্মোচন। প্রহেলিকা বলে পালিয়ে যাব না। কুহেলিকা বলে আচ্ছন্ন হতে দেব না নিজেকে। আয়ত্তাতীতকে আনতে হবে ইয়ত্তার মধ্যে। সংশয় থেকে আসতে হবে সংকল্পে। হয় এসপার নয় ওসপার। হয় প্রত্যাখ্যান নয় সমর্পণ।
তাই ঠাকুর যখন এক দিন বললেন, 'নরেন্দ্র, তুই কি বলিস! সংসারী লোকেরা কত কি বলে! কিন্তু দ্যাখ, হাতি যখন চলে যায়, পেছনে কত জানোয়ার কত রকম চীৎকার করে, কিন্তু হাতি ফিরেও চায় না। তোকে যদি কেউ নিন্দা করে, তখন তুই কী মনে করবি?'
নরেন্দ্র বললে, 'আমি মনে করব কুকুর ঘেউ-ঘেউ করছে।'
না, পালিয়ে যাব না। যে যাই বলুক, একটা হয়-নয় করে যাব। এই পরম-অদ্ভুতের স্বরূপ বুঝব ঠিক-ঠিক। হটে যাব না, ছেড়ে দেব না, শানের উপর আছড়ে-আছড়ে টাকা বাজিয়ে নেব। দেখব এতে কতটা খাদ, কতটা ভেজাল, কতটা মেকি।
সব আবার সহজ হয়ে গেল। দুজনে যেন সৌভাগ্যের দিনের আত্মীয়, নিঃসঙ্গ-বাসের বন্ধু।
কত অন্তরঙ্গ কথা, কত রঙ্গ-রস, কত হাস্য-পরিহাস। তার পর আবার কাছে

বসে খাওয়ানো। গায়ে হাত বুলিয়ে দেওয়া। ছেড়ে দিতে মন-কেমন-করা। আসন্ন সন্ধ্যা তো নয়, ঘনায়মান বিষণ্ণতা। ও এবার চলে যাবে। ওর আবার বাড়ি আছে, বাপ-মা আছে—

রামকৃষ্ণের চোখ ছলছল করে এল।

আর-সব কিছুরই হয়তো সমাধান মেলে, মেলে না শুধু ভালোবাসার। সূর্যের আলোর হয়তো ব্যাখ্যা হয় কিন্তু চন্দ্রে কেন এত ভুবনপ্লাবন জ্যোৎস্না?

এবারে তবে উঠি।

'কিন্তু আবার শিগগির আসবি বল—যেমন নতুন পতি ঘন-ঘন আসে তেমনিই আসবি বেশি-বেশি। ওরে, তোকে যখন দেখি, তখন আমি সব ভুলে যাই।'

আসব।

প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিল রামকৃষ্ণ।

হাজরা বললে, 'তুমি ছোকরাদের কথা এত ভাবো কেন? যদি নরেন-রাখাল নিয়েই ব্যস্ত থাকো তবে ঈশ্বরকে ভাববে কখন?'

বলরাম বোসের বাড়ি যাচ্ছে রামকৃষ্ণ, মহা ভাবনা ধরলো। সত্যি, কথা তো ভুল বলেনি। ওর পাটোয়ারি বুদ্ধি, ওর চুল-চেরা হিসেব। সত্যিই তো, যখন থেকে রাখাল-নরেন এসেছে তখন থেকে ওদের কথাই তো বুক জুড়ে রয়েছে। মায়ের কথা ভুলে আছি।

মাকে তাই বললে রামকৃষ্ণ। মা, এ কেমনতরো হল? তোমাকে ছেড়ে এখন যে কেবল ছোকরাদেরই চিন্তা করছি। হাজরা মুখের উপর কথা শুনিয়ে দিলে।

মা বুঝিয়ে দিলেন। বুঝিয়ে দিলেন তিনিই মানুষ হয়েছেন। শুদ্ধ আধারে তাঁরই বিশদ বিকাশ। ঘোল ছেড়ে মাখন পেয়ে তখন বোধ হয় ঘোলেরই মাখন, মাখনেরই ঘোল।

সমাধি-দর্শনের পর হাজরার উপর রাগ হল। শালা আমার মন খারাপ করে দিয়েছিল।

তার পর আবার ভাবলে, হাজরার দোষ কি। সে জানবে কেমন করে?

তাঁকে দেখার পর সবতাতেই তাঁকে দেখা যায়। মানুষে তাঁর বেশি প্রকাশ। তার মধ্যে যারা আবার শুদ্ধসত্ত্ব তাদের মধ্যে তিনি আরো উচ্চারিত। সমাধিস্থ ব্যক্তি যখন নেমে আসে তখন কিসে সে মন দাঁড় করাবে? তাই তো সত্ত্বগুণী ভক্তের দরকার। ভারতের এই নজির পেয়ে তবে বাঁচল রামকৃষ্ণ।

ভাবসমুদ্র উথলালেই ডাঙায় এক বাঁশ জল। নদী দিয়ে সমুদ্রে আসতে হলে এঁকে-বেঁকে আসতে হয়। বন্যা এলে আর ঘুরে যেতে হয় না। তখন নদীতে-সমুদ্রে একাকার। তখন ডাঙার উপর দিয়েই সোজা চলে যাবে নৌকো।

ভগবানের লীলা যে আধারে বেশি প্রকাশ সেখানেই তাঁর বিশেষ শক্তি। জমিদার সব জায়গায় থাকেন, কিন্তু অমুক বৈঠকখানায়ই তাঁর বিশেষ গতিবিধি। তেমনি ভক্তই ভগবানের বৈঠকখানা। ভক্তের হৃদয়েই তাঁর বিশেষ শক্তির উদ্ভাসন। যেখানে কার্য বেশি সেখানেই বিশেষ শক্তির রূপচ্ছটা।

'বুঝলে হে,' কেশব সেনকে বলছে রামকৃষ্ণ : 'যিনি ব্রহ্ম তিনিই শক্তি। যখন নিষ্ক্রিয় তখন ব্রহ্ম, পুরুষ। যখন কর্মময়ী তখন শক্তি, প্রকৃতি। যিনিই পুরুষ তিনিই প্রকৃতি। আনন্দময় আর আনন্দময়ী।'
একটু থেমে আবার বললে, 'যার পুরুষ-জ্ঞান আছে তার মেয়ে-জ্ঞানও আছে। যার বাপ-জ্ঞান আছে তার মা-জ্ঞানও আছে।'
কেশব একটু হাসল।
'যার সুখ-জ্ঞান আছে তার দুঃখ-জ্ঞানও আছে। যদি রাত বুঝি তবে দিনও বুঝেছি। যদি বলি আলো তবে আবার বলব অন্ধকার। তুমি এটা বুঝেছ?'
'হ্যাঁ, বুঝেছি।'
'মা মানে কি? মা মানে জগতের মা। যিনি জগৎ সৃষ্টি করেছেন, পালন করছেন, তিনি। যিনি সর্বদা রক্ষা করছেন তাঁর ছেলেদের। আর যে যা চায়, ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ, সব দিচ্ছেন দু হাতে। ঠিক যে ছেলে সে মা ছাড়া থাকতে পারে না। তার মা-ই সব জানে। ছেলে খায়-দায় বেড়ায়—অত-শত জানে না। কি, বুঝেছ?'
কেশব ঘাড় নাড়ল। আজ্ঞে হ্যাঁ, বুঝেছি।
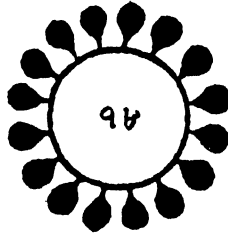
ব্রাহ্ম ভক্তদের সঙ্গে স্টিমারে করে বেড়াতে গিয়েছে রামকৃষ্ণ।
ব্রহ্মরূপ সমুদ্রে যখন বান ডাকে তখন তার অনাশ্রয় আত্মাকে তা ভাসিয়ে নিয়ে যায়। সমুদ্র হচ্ছে নিরাকার ঈশ্বর আর তার লহরী হচ্ছে সাকার।
ভাবমগ্ন হয়ে বসে আছে রামকৃষ্ণ, একজন একটি দূরবীন নিয়ে তার কাছে এল। বললে, 'এর ভিতর দিয়ে একবার দেখুন।'
এর ভিতর দিয়ে তাকালে কী এমন আর দেখা যাবে, যিনি অণু হতে অণীয়ান তাঁকে বিশালতম করে দেখছি। যিনি দবিষ্ঠ তাঁকে দেখছি অন্তিকতম করে। ব্রহ্মকে দেখতে দূরবীন লাগে না। তাঁর তো দূরের বীণা নয়, তাঁর হচ্ছে অন্তরের বীণা।
সেদিন আবার এক স্টিমার এসেছে দক্ষিণেশ্বরে। স্টিমারে রেভারেন্ড কুক আর মিস পিগট। ব্রাহ্মভক্তরা নিয়ে এসেছে তাদের। ধর্ম বিষয়ে বড় একজন বক্তা

এই কুক সাহেব—রামকৃষ্ণকে দেখতে বড় সাধ। রামকৃষ্ণকে দেখতে মানে মূর্তিমান ভারতবর্ষকে দেখতে। ভারতবর্ষের সনাতন ধর্মকে দেখতে।

খবর পেয়ে রামকৃষ্ণ নিজেই এল নদীর ঘাটে।

সকলের পীড়াপীড়িতে উঠে গেল স্টিমারে। উঠে গেল গভীর ভাবাবেশের মধ্যে। পশ্চিমের জ্ঞান বিমুগ্ধ চোখে দেখল এই ভারতীয় ভক্তি। ভক্তির পায়ের কাছে জ্ঞান মাথা নোয়ালো। উপলব্ধির কাছে স্তব্ধ হল বক্তৃতা।

তোমাদের কেবল লেকচার দেওয়া আর বুঝিয়ে দেওয়া। তোমাকে কে বোঝায় তার ঠিক নেই। তুমি বোঝাবার কে হে? যাঁর জগৎ তিনি বোঝাবেন। তিনি এত উপায় করেছেন, আর এ উপায় করবেন না? বেশ করছি, আমি মাটির প্রতিমা পূজো করছি। এতে যদি কিছু ভুল হয়ে থাকে, তা তিনি কি জানেন না যে তাতে তাঁকেই ডাকা হচ্ছে?

নিশ্চয়ই হচ্ছে। যে মাকে লক্ষ্য করে গান বা প্রার্থনা করছে রামকৃষ্ণ সে মা যেন চোখের সামনে জলজীয়ন্ত দাঁড়িয়ে। কথা বা গানের ভাষাও প্রাণতপ্ত। কে বলে সে শুধু মৃৎমূর্তি, কে বা বলে সে শুধু শূন্যরূপা? সে মা সর্বসাম্রাজ্য-দায়িনী মহামায়া। অতিবিস্তীর্ণকান্তি কাননকুন্তলা পৃথিবী।

আপনি শুতে জায়গা পায় না, শঙ্করাকে ডাকে। নিজে জানি না, পরকে বোঝাই। এ কি অঙ্ক না ইতিহাস না সাহিত্য যে পরকে বোঝাব? এ যে ঈশ্বরতত্ত্ব। নুনের পুতুল হয়ে যেই গেছে সমুদ্র মাপতে সেই গলে গেছে। যে গলে যায় সে আবার ফিরে এসে বলবে কি!

আবার জাহাজ এসেছে দক্ষিণেশ্বরে। ঘরে বসে বিজয় গোস্বামী আর হরলালের সঙ্গে কথা কইছে রামকৃষ্ণ। জাহাজে কেশব এসেছে—ব্রাহ্মভক্তরা এসে বললে। চলুন একটু বেড়িয়ে আসবেন আমাদের সঙ্গে।

এক কথায় রাজী! কেশব যখন আছে তখন আবার কথা কি! বিজয়কে নিয়ে নৌকোয় উঠল রামকৃষ্ণ। নৌকোয় উঠেই সমাধিস্থ।

নৌকো থেকে জাহাজে তোলাই মুশকিল। কেশব ব্যস্তসমস্ত হয়ে সব তদারক করছে। অনেক কষ্টে বাহ্যজ্ঞান আনতে পারলেও ঠিক-ঠিক পা ফেলতে পারছে না রামকৃষ্ণ। ভক্তের গায়ের উপর ভর দিয়ে আসছে।

ক্যাবিনে আনা হল। বসানো হল চেয়ারে। কেশব লুটিয়ে পড়ে প্রণাম করলে। সঙ্গে-সঙ্গে অন্যান্য ভক্তরা। যে যেখানে পেল বসে পড়ল মেঝেতে। বিস্তর ভিড় চারদিকে। যারা ঢুকতে পায়নি তারা শুধু এখানে-ওখানে উঁকিঝুঁকি মারছে। স্পর্শন না পাই শুধু একটু দর্শন হোক। যদি দর্শনও না জোটে পাই যেন তার একটু অমৃতবর্ষণ।

ঘরের জানলাটা খুলে দিল কেশব। বিজয়কে দেখেই সে অপ্রস্তুত হয়ে গেল। যে একদিন অত্যাগসহন বন্ধু ছিল সেই আজ বিরুদ্ধ-বৈরী। অথচ ছায়াসন্ধানে দুজনেই এক তরুমূলে সমাগত। একই নদীর ঘাটে এসে অঞ্জলিতে করে একই পিপাসার বারি তুলে নিয়েছে।

সমাধি ভেঙেছে রামকৃষ্ণের। তবু এখনো ঘোর রয়েছে ষোলো আনা। মাকে বলছে, 'মা, আমাকে এখানে তুই আনলি কেন? বেড়ার ভিতর থেকে কি পারব এদের রক্ষা করতে?'

এদের যে সব কাম-কাঞ্চনে হাত-পা বাঁধা। বেড়ার মধ্যে সব বেড়ি পরে বসে আছে। ওদের কি পারব আমি মুক্ত করতে?

গাজীপুরের নীলমাধববাবু আছেন। গাজীপুরের সেই সাধু পওহারী বাবার কথা উঠল! পওহারী মানে পও-আহারী, অর্থাৎ কিনা বায়ুভুক সন্ন্যাসী।

মাটিতে বিরাট এক গর্ত খুঁড়ে তার মধ্যে ধ্যান করে পওহারী। উপরে ছোট একটি আশ্রম, সেখানে প্রেমাস্পদ-প্রভু রামচন্দ্রের পূজা আর নিজের হাতে বিরাট ভোগ রান্না করে দরিদ্রের মধ্যে পরিবেশন। এই তার সাধন-ভজন। নিজের খাবার বেলায় এক মুঠো তেতো নিম পাতা নয়তো গোটা কয় কাঁচা লঙ্কা। তার পর গর্তের মধ্যে এক-এক সময় এত দীর্ঘ কাল সমাধিস্থ হয়ে থাকে, লোকে ভেবে পায় না সাধু খায় কি? সাপের মত নিশ্চয়ই শুধু বাতাস খেয়ে থাকে। সেই থেকে তার নাম হয়েছে পওহারী।

এরই আশ্রমে এক দিন চোর এসেছিল। পোঁটলা বেঁধে জিনিস-পত্র নিয়ে গিয়েছিল চুরি করে। পওহারী বাবা দেখতে পেয়ে তার পিছু নিল। ভয় পেয়ে পোঁটলা ফেলে চম্পট দিলে চোর। তবু পওহারী বাবা তার পিছু ছাড়ে না। জিনিস পেয়ে গিয়েছে তবু ছাড়ান-ছোড়ান নেই। চোর কি করে পারবে সাধুর সঙ্গে, জোরে ছুটে চোরকে ধরে ফেললে পওহারী। কোথায় চোর কাকুতি-মিনতি করবে, পওহারী বাবাই স্তুতি-বিনতি করতে লাগল। চোরের পদপ্রান্তে পোঁটলা নামিয়ে রেখে করজোড়ে ক্ষমা চাইলে। বললে, অনেক ব্যাঘাত ঘটিয়েছি প্রভু, তাই নিশ্চিন্ত মনে পোঁটলাটি তোমার নেওয়া হল না। আমাকে ক্ষমা করো। নাও এই সামান্য উপচার। এ পোঁটলা আমার নয়, এ তোমার।

'সেই পওহারী বাবা,' বললে একজন ব্রাহ্মভক্ত, 'নিজের ঘরে আপনার ছবি টাঙিয়ে রেখেছে।'

নিজের দিকে আঙুল দেখালো রামকৃষ্ণ। বললে, 'এই খোলটার!'

বালিশ আর তার খোল—তার মানে দেহী আর দেহ। বাইরেটা দেহ, অন্তরে দেহী, তার মানে অন্তর্যামী। দেহের ছবি নিয়ে কি হবে? ছাপ নাও সেই অন্তরঙ্গের।

তিনি এক, তাঁর নাম আলাদা, রূপ আলাদা। একই ব্রাহ্মণ, যখন পূজা করে তখন তার নাম পূজুরি; যখন রান্না করে তখন রাঁধুনে। একই লোক, যখন মা'র কাছে তখন ছেলে, যখন স্ত্রীর কাছে তখন স্বামী, যখন ছেলের কাছে তখন বাপ। একই জল, কেউ বলে জল, কেউ বলে পানি, কেউ বলে ওয়াটার। একই ভাব, নানান নামের টুকরোয় ফেটে পড়ে। একই শুভ্রতা, রূপ নিয়েছে সাত-রঙা রামধনু।

'কালীর কথা বলুন।' জিগগেস করল কেশব। 'কালী কালো কেন?'

'দূরে আছে বলে কালো দেখায়। জানতে পারলে আর কালো নয়। তখন আলো। আকাশ দূর থেকেই নীল, যদি কাছে যাও দেখবে রঙ নেই—শাদা। সমুদ্রের জলও তাই—দূর থেকেই নীল, কাছে থেকে শাদা।'

'তিনি যদি লীলাময়ী ইচ্ছাময়ী, তবে তিনি তো ইচ্ছে করলেই আমাদের সকলকে মুক্ত করে দিতে পারেন—তাই দেন না কেন?'

'তাও তাঁরই ইচ্ছে। তাঁর ইচ্ছে তিনি এই সংসারের ছকে জীব-জন্তুর ঘুঁটি চেলে-চেলে খেলা করেন। বুড়িকে আগে থাকতেই ছুঁয়ে ফেললে ছুটোছুটি হয় না। ছুটোছুটি না হলে খেলে সুখ কই? খেলা চললেই বুড়ির আহ্লাদ।'

তবে কি আমরা বুড়ির আহ্লাদের জন্যে কেবল ছুটোছুটিই করব?

করলেই বা। মন্দ কি। খেলা চলছে এই তো বেশ। যে ছেলে ছুটোছুটি করে খেলছে আর যে ছেলে বসে আছে মা'র কোলে চেপে, এদের মধ্যে কোন ছেলেকে মা'র বেশি পছন্দ?

'সব ত্যাগ না করলে কি পাওয়া যাবে না ঈশ্বরকে?' জিগগেস করলে এক ব্রাহ্মভক্ত।

'তা যাবে না। কিন্তু ত্যাগ তো মনে। মন নিয়েই কথা। সংসার করছ করো কিন্তু মন রাখো ঈশ্বরের হাতের মুঠোয়।'

'সেই তো কঠিন।'

'মোটেই কঠিন নয়। এক পাশে পরিবার, এক পাশে সন্তান নিয়ে শোওনি? দুজনকে আদর করোনি দুভাবে? দুই জন দুই ভাব, কিন্তু মন এক। মন নিয়েই সব। যদি সাপে কামড়ায়, আর যদি জোর করে বলো, বিষ নেই, বিষ ছেড়ে যায়। যদি বলো আমি মান-হুঁস মানুষ, যদি বলো আমি ঈশ্বরের সন্তান, কে আমাকে বাঁধে, দেখবে তুমি নির্বন্ধন, তুমি নির্মুক্ত। তুমি মহাবীর।'

রামকৃষ্ণ তাকাল কেশবের দিকে। বললে, 'তোমাদের ব্রাহ্মসমাজেও কেবল পাপ আর পাপী। খৃষ্টানদেরও তাই। যে রাত-দিন কেবল পাপী-পাপী করে সে পাপীই হয়ে যায়। যে কেবল বলে আমি বদ্ধ আর বদ্ধ সে বধ্যই হয়ে থাকে। বলো আমি রাজরাজেশ্বরের ছেলে, আকাশজোড়া আমার মুক্তি, আকাশজোড়া আমার নির্মলতা, আমাকে ছোঁয় কে, আমাকে কে আটকায়!'

ভাটা পড়ে এসেছে। এবার ফেরা যাক। অমৃত কথা শুনতে-শুনতে কত দূর চলে এসেছে জল ঠেলে কারু খেয়াল নেই।

কোঁচড়ে করে মুড়ি নারকেল খাচ্ছে সবাই। হঠাৎ বিজয়ের দিকে নজর পড়ল রামকৃষ্ণের। কেমন যেন আড়ষ্ট হয়ে বসে আছে। তার পাশে আরেক চেয়ারে কেশব বসে। সেও তেমনি জড়সড়। মিটে গেছে ঝগড়া তবু যেন মিশ খাচ্ছে না।

রামকৃষ্ণ তাকাল একবার বিজয়ের দিকে, তার পর কেশবের দিকে। বললে, 'তোমাদের ঝগড়াবিবাদ যেন সেই শিব-রামের যুদ্ধ। জানো তো, রামের গুরু শিব। দুজনে যুদ্ধও হলো, আবার সন্ধিও হলো। কিন্তু শিবের চেলা ভূত-প্রেত আর রামের চেলা বানর—ওদের ঝগড়া-কিচকিচ আর মেটে না।'

সবাই হেসে উঠল।

'মায়ে-ঝিয়ে আলাদা মঙ্গলবার করে, এও প্রায় তেমনি। মা'র মঙ্গল আর মেয়ের মঙ্গল এ দুটো যেন আলাদা। এর মঙ্গলেই যে ওর মঙ্গল এ খেয়াল কারুর হয় না। তোমাদের ওর একটি সমাজ আছে এখন আবার এর একটি দরকার।'

আবার হাসির রোল।

'তবে এ সব চাই। যদি বলো ভগবান নিজে লীলা করছেন, সেখানে জটিলে-কুটিলের কী দরকার! জটিলে-কুটিলে না থাকলে যে লীলা পোষ্টাই হয় না।'

বুড়ি-ছোঁয়ার খেলাটিও তাই জটিল-কুটিল। যদি গোলকধাঁধার পথ না হত তবে জমত না খেলা, রগড় হত না। বলতেই বলে, দুশো মজা, পাঁচশো রগড়।

জাহাজ এসে থামল কয়লাঘাটে। গাড়ি আনা হল। কেশবের ভাইপো নন্দলালের সঙ্গে গাড়িতে উঠল রামকৃষ্ণ।

উঠেই মুখ বাড়িয়ে ব্যাকুল স্বরে ডেকে উঠল, কই, কই তিনি কই?

কাকে রামকৃষ্ণ খুঁজছে বুঝতে কারু দেরি হল না। তাঁকে ডেকে আনল। হাসি-হাসি মুখে কেশব এসে দাঁড়াল সামনে। ভূমিষ্ঠ হয়ে রামকৃষ্ণের পায়ের ধুলো নিল।

ইংরেজটোলার মধ্য দিয়ে গাড়ি যাচ্ছে। ঝকমক করছে রাস্তা, ঝকঝক করছে বাড়ি-ঘর। গ্যাসের আলো জ্বলছে অন্দরে-বাইরে। আকাশে আবার পূর্ণিমার প্লাবন। পিয়ানো বাজিয়ে গান করছে মেমসাহেবরা। সর্বত্র যেন আনন্দভাতি। সব দেখে-শুনে রামকৃষ্ণও হাসতে-হাসতে চলেছে। হঠাৎ এক সময় বলে উঠল, আমি জল খাব। তেষ্টা পেয়েছে আমার।

এখন কী হবে! রাস্তার মাঝখানে এখন কী করা যায়!

নন্দলাল নামল গাড়ি থেকে। সামনেই ইণ্ডিয়া ক্লাব। সেখান থেকে কাচের গ্লাশে করে জল নিয়ে এল।

সানন্দে সেই জল খেল রামকৃষ্ণ।

নবাগত শিশু যেমন কলকাতা দেখে তেমনি ভাবে মুখ বাড়িয়ে দেখতে লাগল গাড়ি-ঘোড়া, দোকান-দানি, দেখতে লাগল শহরের ইট-পাথরের উপর জ্যোৎস্নার অকার্পণ্য।

নন্দলাল নেমে গেল কলুটোলায়। গাড়ি এসে থামল সুরেশ মিত্তিরের বাড়ির সামনে।

সুরেশ বাড়ি নেই। এখন গাড়িভাড়া কে দেবে?

'ভাড়াটা মেয়েদের কাছ থেকে চেয়ে নে না—'

দোতলার ঘরে ঠাকুরকে এনে বসাল সকলে। ফরমাস দিয়ে নতুন একখানা ছবি আঁকিয়েছে সুরেশ—ঠাকুর কেশবকে সকল ধর্ম সকল সম্প্রদায়ের সমন্বয় দেখাচ্ছেন। সেই ছবি দেয়ালে টাঙানো। মেঝেতে ফরাস পাতা, তার উপর তাকিয়া। রামকৃষ্ণ বসল সেখানে, বসেই বললে, ওরে তোরা নরেনকে কেউ ডেকে আন।

চাষারা হাটে গরু কিনতে যায়। গরু বাছবার চিহ্ন কি? ল্যাজের নিচে হাত দিয়ে দেখে। ল্যাজে হাত দিলে যে-গরু শুয়ে পড়ে সে-গরু কেনে না। ল্যাজে হাত দিলে যে-গরু তিড়িং-মিড়িং করে লাফিয়ে ওঠে সেই গরু পছন্দ করে। নরেন আমার সেই গরুর জাত—ভিতরে জ্বলন্ত তেজ। সে চিঁড়ের ফলার নয়, সে ভ্যাদ-ভ্যাদ করে না।

আহা, এখানে এক রকম, ওখানে আরেক রকম। দুরন্ত ছেলে বাবার কাছে যখন বসে, যেন জুজুর ভয়ে চুপ করে বসে, আবার যখন চাঁদনিতে এসে খেলে তখন তার আরেক মূর্তি। এরা নিত্যসিদ্ধের থাক, সংসারে বদ্ধ হয় না কখনো। একটু বয়স হলেই চৈতন্য হয়, আর ভগবানের দিকে চলে যায়। ওরে, কই, এখনো তো এল না নরেন্দর।

নরেন এসেছে, নরেন এসেছে, রব উঠল চার দিকে। রামকৃষ্ণের আনন্দের আগুন দ্বিগুণ হয়ে উঠল।

'আজ কেমন জাহাজে করে বেড়াতে গিয়েছিলাম—' বলতে লাগল নরেনকে, 'সঙ্গে বিজয় ছিল কেশব ছিল, এরা সব ছিল। এদেরকে জিগগেস কর্, কত আনন্দ হল আজ। কেমন বিজয়-কেশবকে মায়ে-ঝিয়ে মঙ্গলবার শোনালুম, বললুম সেই জটিলে-কুটিলের কথা।'

নরেন শুনতে লাগল অতৃপ্য কর্ণে।

ওরে আমার আনন্দের ভাগ তোকে কিছু না দিলে আমি যে একা-একা বইতে পারি না।
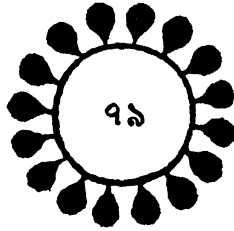
বেড়াতে গিয়ে রাখাল একটি পয়সা কুড়িয়ে পেয়েছে। ভাবলে বাজে লোক যদি পায় নির্ঘাৎ মেরে দেবে। তার চেয়ে কানা-খোঁড়া ভিক্ষুককে দিয়ে দিলে সদ্ব্যয় হবে পয়সাটার।

ঠাকুরের কাছে কথাটা গোপন করলে না। শিশু যেমন তার মাকে সব কথা খুলে বলে রামকৃষ্ণের কাছে রাখালের সেই রকম অনাবৃতি।

'একটা পয়সা কুড়িয়ে পেয়েছি। পথের ভিক্ষুক কাউকে দিয়ে দেব।'

ভেবেছিল ঠাকুর বোধ হয় খুশি হবেন, কিন্তু তিনি জ্বলে উঠলেন। তোর

দানের জন্যে বিশ্ব-ভুবন বসে আছে। পয়সা তো আপনা থেকে তোর মুঠোর মধ্যে চলে আসেনি। তুই কুড়োতে গেলি কেন?
'বা, আমি যে যাচ্ছিলুম ও-পথে। পথের মধ্যে পড়ে রয়েছে।'
'যে মাছ খায় না সে মাছের বাজারেই বা যাবে কেন? তোর যখন নিজের দরকার নেই, তখন কেন তুই ও-পয়সা ছুঁতে গেলি?'
দে ফেলে দে পয়সা।
সেদিন স্নানের আগে ঠাকুরকে তেল মাখাচ্ছে রাখাল। কি খেয়াল হল রাখাল একটা প্রার্থনা করে বসল। প্রার্থনা আর কিছুই নয়, ভাবসমাধি চাই। রাখাল যত চায় রামকৃষ্ণ তত কঠিন হয়।
রাখালও নাছোড়বান্দা। দিতেই হবে আমাকে সেই ঈশ্বরিক অনুভূতির উচ্চতর অবস্থা।
রামকৃষ্ণ তখন কি করে, একটা নিদারুণ কথা বলে রাখালকে আঘাত করে বসল। সেই মর্মান্তিক আঘাতের যন্ত্রণা সইতে পারল না রাখাল। তেলের বাটি হাত থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে হন-হন করে ছুটে চলল। থাকবে না আর সে দক্ষিণেশ্বরে। ফিরে যাবে কলকাতা।
কত দূর আর যাবে! ফটক পার হতে না হতেই পা দুটো তার অবশ হয়ে পড়ল। সাধ্য নেই দাঁড়িয়ে থাকে। বসে পড়ল সেইখানে।
একেবারে নিরুপায়! এখন কি করি কোথায় যাই, যেন জলে পড়ল রাখাল।
নিরুপায়েরই উপায় আছে। জলেরই আছে আবার তীরাশ্রয়। ফটকের কাছে রামলাল। 'ঠাকুর পাঠিয়ে দিলেন নিয়ে যেতে।'
ক্ষমায় একেবারে মাতা বসুন্ধরার মত। দীনপাবনী করুণার মুক্তধারা।
রামলালের পিছু-পিছু রাখাল চলে এল গুটি-সুটি। অধোবদন হয়ে দাঁড়াল ঠাকুরের সামনে।
'কি রে, পারলি? পারলি গণ্ডি ছাড়িয়ে যেতে?'
সন্ধ্যে বেলায় সেই রাখাল আবার বসেছে ঠাকুরের সামনে।
'রাখাল-নরেনও আছে, আবার আছে হাজরা। হাজরা হচ্ছে শুকনো কাঠ। জপ করে, আবার ওরই ভেতর দালালির চেষ্টা করে। সবাই বলে, ও এখানে থাকে কেন? তার মানে আছে। জটিলে-কুটিলে না থাকলে লীলা পোষ্টাই হয় না।'
তার পর হঠাৎ রাখালের দিকে চোখ ফেরাল রামকৃষ্ণ। বললে, 'সকালে তখন তুই রাগ করেছিলি? তাই না? তোকে রাগালুম কেন? তার মানে আছে। ওষুধ ঠিক পড়বে বলে। পিলে মুখ তুললে পরই মনসার পাতা-টাতা দিতে হয়। বুঝলি?'
তার পর আবার ঈশ্বরীয় রূপের কথা বলছেন মাস্টারের দিকে চেয়ে। বলছেন, 'ঈশ্বরীয় রূপ মানতে হয়। জগদ্ধাত্রী রূপের মানে জানো? যিনি জগৎকে ধারণ করে আছেন। তিনি না ধরলে জগৎ পড়ে যায়, নষ্ট হয়ে যায়। মন-করীকে যে বশ করতে পারে তারই হৃদয়ে জগদ্ধাত্রীর উদয়।'

রাখাল বললে, 'মন মত্ত-করী।'
'সিংহবাহিনীর সিংহ তাই হাতিকে জব্দ করে রয়েছে।'
আবার আরেক দিন অভিমান হল রাখালের। আবার ছেড়ে গেল দক্ষিণেশ্বর। আবার ফিরে এল ঠাকুরের পদমূলে।
'তুই রাগ করে দক্ষিণেশ্বর থেকে চলে গেলি, আমি মা'র কাছে গিয়ে কাঁদতে লাগলুম। মা গো, এরা তোর অবোধ সন্তান, এদের অপরাধ নিসনি। তাই আবার ফিরে এলি। না এসে আর যাবি কোথায়?'
অধর সেনকে এক দিন বললেন ঠাকুর, 'এরা শ্রাবণ মাসের জল নয়। শ্রাবণ মাসের জল হুড়-হুড় করে আসে আবার হুড়-হুড় করে বেরিয়ে যায়। এরা থাকিয়ে জল। মাটি ফুঁড়ে এদের আবির্ভাব।'
ঠাকুরের পা টিপছে রাখাল, আর একজন ভাগবতের পণ্ডিত ভাগবতের কথা বলছে কাছে বসে।
কথায় আর স্পর্শে রাখালের সেই প্রথম ভাব। থেকে-থেকে শিউরে উঠতে-উঠতে একেবারে নিশ্চল স্থির।
ভাব তো নয়, ভাব-বিলাসিতা! এই হল নরেনের ধারণা। এ সব ভাব হচ্ছে স্নায়ুদৌর্বল্যের ফল, মানসিক মৃগী রোগ।
ব্রাহ্মসমাজের খাতায় নাম লিখিয়েছে দুই জনে—নরেন আর রাখাল—ব্রাহ্মসমাজের সংকল্প নিয়েছে। অথচ—
এক দিন দক্ষিণেশ্বরে এসে নরেন দেখতে পেল ঠাকুরের পিছু-পিছু রাখালও চলেছে মন্দিরে। বিগ্রহের সামনে ঠাকুর ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করছেন, পিছু-পিছু রাখালও প্রণাম করছে।
দেখে তো পায়ের রক্ত মাথায় উঠল নরেনের। রাখালের এ কী বিশ্বাসভঙ্গ! কথা দিয়ে এসে সেই কথার প্রত্যবায়!
ধরল রাখালকে। অন্তরালে ডেকে নিয়ে গেল। তীব্র ভর্ৎসনার সুরে বললে, 'এ তোমার কী কাণ্ড?'
'কেন, কী হয়েছে?'
'কী হয়েছে মানে? এটা মিথ্যাচার নয়?'
'কোনটা?'
'এই যে মন্দিরে গিয়ে দেবদেবীকে প্রণাম করা?'
রাখাল চোখ নামাল। কথা কইল না।
'তুমি ব্রাহ্মসমাজের অঙ্গীকার-পত্রে সই করে দিয়ে আসোনি? বলে আসোনি, নিরাকার ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছু ভজনা করবে না? মানবে না দেবদেবী?'
তবু চুপ করে রইল রাখাল। কি করে মনের কথা বোঝাবে নরেনকে? ঠাকুরের ছোঁয়ায় সংস্কারের পুরোনো গ্রন্থি সব খুলে গিয়েছে যে। ব্রহ্মের যে ইতি নেই, তাঁর যে লেখাজোখা হয় না। তিনি যদি নিরাকার হয়ে থাকতে পারেন, সাকার হয়েই বা থাকতে পারবেন না কেন? তিনি যদি সর্বব্যাপক সর্বাবরক হন তবে

তিনি শিলা-মৃত্তিকাই বা আশ্রয় করতে পারবেন না কেন? গোঁড়ামির অন্ধকূপ থেকে ঠাকুর তাকে নিয়ে এসেছেন আকাশের নিত্যনির্মল উদারতায়।
কিন্তু কিছুই বলতে পারল না। এত যার তেজ ও দীপ্তি তার সঙ্গে রাখাল পারবে না তর্ক করে।
তাই বলে নরেন ছাড়বার পাত্র নয়। সে গিয়ে ধরল ঠাকুরকে।
'রাখাল এই মিথ্যাচার করবে? গড় হয়ে প্রণাম করবে দেবদেবী?'
'করলেই বা। ভগবান সব জায়গায় আছেন, শুধু মূর্তিতেই থাকবেন না?'
'কিন্তু ও যে সই করে দিয়ে এসেছে।'
'তাই বলে ও মত বদলাতে পারবে না? চিন্তার জগতে থাকবে না ওর স্বাধীনতা?'
চিরস্বাধীন নরেন্দ্রনাথ থমকে গেল। কথা খুঁজে পেল না।
'রাখালের এখন সাকারে বিশ্বাস হয়েছে। তা কি করবে বলো? যার যেমন ধাত। যার যেমন পেটে সয়। তোর নিরাকারের ঘর, রাখালের সাকারের। সকলেই কি আর গোড়া থেকে নিরাকারে মন দিতে পারে? সাকার-নিরাকার যে কোনো একটাতে বিশ্বাস থাকলেই হলো।'
নরেন ফিরে যাচ্ছিল ঠাকুর ডাকলেন। বললেন, 'রাখালকে আর কিছু বলিসনি। সে তোকে দেখলেই ভয়ে জড়সড় হয়।'
সেই রাখালের অসুখ করেছে। সবাইকে উদ্বেগ জানাচ্ছেন ঠাকুর। বলছেন, 'এই দেখ আমার রাখালের অসুখ। সোডা খেলে কি ভালো হয় গা?'
শেষকালে যেন দৈববাণীর মতো বলে উঠলেন, 'যা, রাখাল, তুই জগন্নাথের প্রসাদ খা গে, যা।'
দেখতে পেলেন নারায়ণ বালকের রূপ ধরে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। ঠাকুরের প্রেমানুরঞ্জিত চোখ—গোপালকে দেখে যশোমতীর যেমন স্নেহগদগদ দৃষ্টি। ধীরে-ধীরে সমাধিতে ডুবে গেলেন রামকৃষ্ণ। যে মা এতক্ষণ ব্যস্ত ছিলেন সন্তানের জন্যে, সে মা এখন কোথায়? সাকার ছেড়ে ডুব দিয়েছেন নিরাকারের জলধিতে।
নন্দনবাগানে ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে নিমন্ত্রণ হয়েছে ঠাকুরের। ভক্তদের নিয়ে এসেছেন, সঙ্গে রাখাল। কিন্তু তাঁদের দিকে গৃহস্বামীদের লক্ষ্য নেই। উপাসনা শেষ হলে খাবার ডাক পড়ল। কিন্তু এদিক পানে কেউ তাকিয়েও দেখছে না। শুধু বড়লোক আর আত্মীয়-কুটুম্বদের নিয়েই শশব্যস্ত।
'কই রে কেউ ডাকে না যে রে!' ঠাকুর বললেন ভক্তদের।
ভক্তরা আর কি করবে। এদিক-ওদিক তাকায়, কারুরই চোখের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে না। কে না কে এসেছে হেজিপেজি এমনি মনোভাব।
ঠাকুরের কথা শুনে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল রাখাল। বললে, 'মশায়, চলে আসুন।'
রাখালকে বড় বিঁধছে এ অপমান। অন্যায় ঔদাসীন্য অপমান ছাড়া আর কি। কিন্তু চলে আসুন বললেই তো আর চলে যাওয়া যায় না।

'আরে রোস,' রাখালকে নিরস্ত করলেন ঠাকুর : 'গাড়িভাড়া তিন টাকা দু আনা কে দেবে? রোক করলেই হয় না। পয়সা নেই আবার ফাঁকা রোক। আর এত রাত্রে খাই কোথা?'

একসঙ্গে পাত পড়েছে সকলের। অনেক পরে যখন ডাক পড়ল এ-দলের তখন গিয়ে দেখল, জায়গা নেই, সমস্ত আসন ভরে গিয়েছে। তখন এক পাশে নোংরা-মতন একটা জায়গায় ভক্ত সমেত ঠাকুরকে বসানো হল এক ধারে। নুন-টাকনা দিয়ে দিব্যি লুচি খেলেন ঠাকুর।

ভক্তরা মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল ঠাকুরের দিকে। বিন্দুমাত্র অভিমান নেই। নেই এতটুকু দোষদর্শন। কারুণ্য আর সৌশীল্যের প্রতিমূর্তি। উদারতা আর ক্ষমার সমাহার। লোককল্যাণকামনায় সর্বংসহ।

পরের দোষ আর দেখব না। গর্বে আর পর্বত ভাবব না নিজেকে।
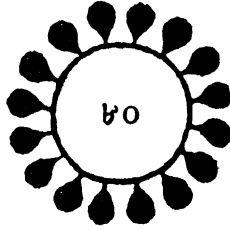
এদিকে, এর আগে, বিজয়ের কি হয়েছিল একটু খোঁজ নিই।

কেশবের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে গিয়েছে। কেশব করেছে 'নববিধান', বিজয় করেছে 'সাধারণ'। জয় হয়েও বিজয়ের শান্তি নেই। শুধু প্রচারে-বিচারে উপদেশে-উপাসনায় ঊষর মরু সজল হয় না। চাই শ্রাবণ-সিঞ্চন। তৃষ্ণা মেটে না শুধু জ্ঞানের খরতাপে। চাই ভক্তির বারিধারা।

শুধু নিরাকারে শান্ত হয় না হাহাকার।

মেছুয়াবাজার স্ট্রিট ধরে এক দিন হেঁটে যাচ্ছে বিজয়কৃষ্ণ, হঠাৎ এক হিন্দুস্থানী সাধুর সঙ্গে দেখা। সাধু-সন্নেসীর দিকে তাকিয়েও দেখেনি কোনো দিন, অথচ এর দিকে চোখ না ফেলে পারল না। যেমনি চোখ পড়ল অমনি থমকে দাঁড়াল। শুধু তাই নয়, যা ধারণার অতীত, পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করে বসল সাধুকে। কি লজ্জা, কেউ দেখতে পায়নি তো!

ব্রাহ্মসমাজে বেদীতে বসে উপাসনা করছে বিজয়, চোখ চেয়ে দেখল এক কোণে সেই সাধু বসে। উপাসনার শেষে বেরিয়ে আসছে মন্দির থেকে, হঠাৎ পিছন দিক থেকে এসে বিজয়ের হাত ধরল সেই সাধু। বললে, 'চলো!'

কোথায়?

কোথাও নয়। এই রাস্তায়। অচেনা ভিড়ের নিরিবিলিতে।
ফাঁকায় চলে এসে হঠাৎ জিগগেস করলে সাধু, 'তোম গুরু কিয়া?'
বিজয় দৃঢ়স্বরে বললে, 'আমি গুরুবাদ মানি না।'
শিবনাথ শাস্ত্রীও বলেছিল সেই কথা। গুরু লাগবে কিসে? আত্মবলে ঈশ্বর লাভ করব। আমি কি কিছু কম?
ঠাকুর একবার তাকালেন গঙ্গার দিকে। দেখলেন হাতের কাছেই সুস্পষ্ট উদাহরণ। চলন্ত স্টিমারের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বাঁধা একটা গাধাবোট। স্টিমারের সঙ্গে-সঙ্গে গাধাবোটও দিব্যি জল কেটে এগিয়ে আসছে পারের দিকে।
ঐ দেখ ঐ গাধাবোট। ওর সাধ্য ছিল আত্মবলে এত তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসতে? হয়তো এক বেলা লেগে যেত। ভাগ্যক্রমে স্টিমারের সঙ্গে বাঁধা পড়েছিল বলেই এত বেগে বেরিয়ে আসতে পারছে। গাধাবোটের পক্ষে পার পেতে হলে শুধু আত্মবলে চলে না, গুরুবল লাগে।
জীবমাত্রই গাধাবোট। শুধু লগি ঠেলে-ঠেলে কত আর তুমি এগোবে— কত দিনে? স্টিমার ধরো। ধরো গুরু। ধরো পারাপারের কর্ণধার। ঠিক তোমাকে পার করে দেবে।
'গু' মানে অন্ধকার আর 'রু' মানে আলোর দ্যোতক। অন্ধকার থেকে যিনি আলোকে নিয়ে যান তিনিই গুরু। অন্ধকারে যিনি আলোর সংবাদ দেন তিনিও। এত বড় যে বিদ্যা-বিশারদ হয়েছ, বলি, বর্ণপরিচয় শিখতে গুরু লাগেনি?
কিন্তু মুখ গম্ভীর করে বিজয় বললে, 'মানি না আমি গুরুবাদ।'
মৃদু-মৃদু হাসল সেই সন্ন্যাসী। বললে, 'এই সি ওয়াস্তে সব বিগড় গিয়া—'
বিজয়ের বুকের মধ্যে কে ধাক্কা দিলে। মুখ ঘুরিয়ে বললে, 'তুমি শুনেছ আমার উপাসনা? ও কিছু নয়?'
'ও সব তো বেদকা বাণী হ্যায়। ওসি মে ক্যা হোগা?'
যেন সহসা কে টলিয়ে দিল বিজয়কে। পথের মধ্যে বসিয়ে দিল। মনে হল গুরু নেই বলে সব পণ্ড হয়ে যাচ্ছে। পঙ্গু হয়ে যাচ্ছে। সমস্ত চেষ্টা নিষ্ফল চেষ্টা।
গুরু চাই। অগ্নিমন্থন কাঠ প্রস্তুত। শুধু একটু ঘর্ষণ দরকার।
আপনি আমার গুরু হোন। ব্যাকুলতায় সমস্ত শরীর কেঁপে উঠল বিজয়ের। আমাকে দিন সেই চৈতন্যের স্ফুলিঙ্গ। যজ্ঞের কাঠ একবার জ্বলে উঠুক।
'নেহি। তোমারা গুরু দোসরা হ্যায়—'
ঠাকুর বললেন, 'তবে এবার এক বাঘিনীর গল্প শোনো—'
ছাগলের পালে এক বাঘিনী পড়েছিল। দূর থেকে তাক করে এক শিকারী তাকে মেরে ফেললে। তখন সেটার প্রসব হয়ে ছানা হয়ে গেল। ছানাটি ছাগলের সঙ্গে মানুষ হতে লাগল। ছাগলেরা ঘাস খায়, বাঘের ছানাও ঘাস খায়। ছাগলদের মত বাঘের ছানাও ভ্যা-ভ্যা করে। আবার কোনো জানোয়ার এলে ছাগলদের মতই ছুটে পালায়। এক দিন সেই ছাগলের পালে আর একটা বাঘ এসে পড়ল।

ঘাসখেকো বাঘটাকে দেখে তো সে অবাক! দৌড়ে তখন ধরল সে ঘাসখেকোকে। সেটা প্রাণপণে ভ্যা-ভ্যা করতে লাগল। সেটাকে টেনে হিঁচড়ে জলের কাছে নিয়ে এল সেই বাঘ। বললে, দ্যাখ, জলের মধ্যে তোর মুখ দ্যাখ—আমার যেমন হাঁড়ির মতন মুখ, তোরও তেমনি। আর এই নে খানিকটা মাংস, চিবিয়ে দ্যাখ। বলে তার মুখের মধ্যে খানিকটা মাংস জোর করে পুরে দিলে। আর যায় কোথা! প্রথমে তো মুখেই তুলবে না, শেষে রক্তের স্বাদ পেয়ে খেতে লাগল। তখন বাঘ বললে, 'এখন বুঝেছিস? দ্যাখ চেয়ে, আমিও যা তুইও তা। এখন আয়, আমার সঙ্গে বনে চলে আয়।'

বাঘ হল সেই গুরু। চৈতন্য এনে দিলে। জলে মুখ দেখালে—তার মানে, চিনিয়ে দিলে স্বরূপ। বনে ডেকে নিয়ে গেল। নিয়ে গেল স্বধামে। ঈশ্বরনিকেতনে।

গুরুর সন্ধানে বেরিয়ে পড়ল বিজয়। তিনি যদি নিজের থেকে না আসেন তাঁকে খুঁজে বের করতে হবে। ভারতবর্ষের আঁতিপাঁতি চষে দেখব। মাটি খুঁড়ে হোক, পাহাড় ফেড়ে হোক, উদ্ধার করতে হবে সেই লুক্কায়িতকে।

কোথায় আমার সেই জল-দর্পণ! যার মধ্যে তাকিয়ে আমি আমার স্বরূপকে চিনব!

বিন্ধ্যাচল পাহাড়ে নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে পথ হারিয়ে ফেলেছে বিজয়। শুনেছিল কোথাকার কে এক সাধু আছে এই জঙ্গলে। রাত্রির অন্ধকার নেমে এল, জন-প্রাণীর দেখা নেই। শুধু লতাগুল্মের জটিলতা। খুঁজতে-খুঁজতে পেল এক ভাঙা বাড়ি—ঠিক করল এখানেই রাত কাটাবে। তাই সই, পরিত্যক্ত ভাঙা বাড়িতেই ডেরা বাঁধলে। কিসের ডেরা—মাঝ-রাতে এক দল ডাকাত এসে হাজির। এটা সাধু-সন্নেসীর ডেরা নয়, এটা ডাকাতের আস্তানা। কেটে পড়ো। সন্নেসীর পোশাক থাকলেই বা কি, বিজয়কে ওরা তাড়িয়ে দিলে। দূরে এক গাছতলায় গিয়ে বসল বিজয়। এ দিকে ভাঙা বাড়ির মধ্যে বসে লুট-করা মালের বখরা করতে লাগল ডাকাতেরা। বখরার পর যখন ঘুমুতে যাবে তখন বিজয়ের কথা ফের মনে পড়ল তাদের। সাধুটা গেল কোথায়? ও তো নির্ঘাৎ পুলিশে খবর দেবে। ওকে ধরো। সাবড়ে দাও এক কোপে।

ডাকাতদের যে সর্দার সে আপত্তি করলে। বললে, নিরীহ সন্নেসীমানুষ, ওর থেকে আমাদের কোনো ক্ষতি হবে এ আমার বিশ্বাস হয় না। ওকে মেরে কাজ নেই।

রাখো তোমার সরফরাজি। ওকে না কেটে ফেললে পুলিশের হাতে ও সাবুদ হবে।

দুটো তরোয়াল নিয়ে দুটো ডাকাত এগিয়ে গেল সেই গাছতলার দিকে। কিন্তু এ কী সর্বনাশ! বিজয়ের সামনে অল্প কয়েক হাত দূরে প্রকান্ড একটা বাঘ বসে। যেন পাহারা দিচ্ছে বিজয়কে। সেই পুরুষব্যাঘ্রকে।

এ দিক থেকে মারা যাবে না দেখছি। যেতে হবে পিছন দিকে। সে দিক থেকেই বসাতে হবে কোপ। সে দিকে গিয়ে দেখে, সে দিকেও আরেক বাঘ। বিশাল

জিভ মেলে থাবা চাটছে বসে-বসে। কে মারে সেই ব্যাঘ্রমূর্তিকে! ডাকাত দুটো তরোয়াল ন্যামিয়ে হেঁটমুখে সরে পড়ল।

এবার এসেছে তিব্বতে। শুনেছিল দুর্গম অরণ্যের মধ্যে কোন এক গোফার ধারে এক বাঙালী মহাপুরুষ আছেন। অহোরাত্রই নাকি সমাধিস্থ। যেই থেকে শোনা সেই থেকেই তাঁর ঠিকানা খুঁজে ফিরছে। ঠিকানা মানে বরফ আর পাথর, জল আর জংগল। তবু বের করা চাই সেই মহাপুরুষকে। খাদ্য নেই, ঘুম নেই, না থাক, চাই শুধু সেই পরমান্ন, শুধু সেই অসংগ-সংগ। কোথায় সে! পথ চলতে-চলতে তিন দিনের দিন অজ্ঞান হয়ে পড়ল বিজয়।

ঘোর অরণ্য। প্রাণস্পন্দহীন। কে তার খবর রাখে!

কিন্তু যাকে সে খুঁজে বেড়াচ্ছে তিনি খোঁজ রাখেন।

নগ্নদেহ কে এক সন্ন্যাসী সহসা তার সামনে এসে দাঁড়াল। স্পর্শ করতেই জেগে উঠল বিজয়। তার শিথিল হাতে কটি ছোট-ছোট বীজ গুঁজে দিলে সন্ন্যাসী। বললে, 'বাচ্চা, এহি দানা লেও, ভুখ-পিয়াস ছুট যায়েগা।'

সত্যিই তাই। দু-এক দানা মুখে দিতেই ক্ষুধাতৃষ্ণা মিটে গেল বিজয়ের। মিটে গেল পথশ্রান্তি।

কিন্তু শুধু দেহের ক্ষুধাতৃষ্ণা মিটিয়েই নিবৃত্তি কোথায়? শুধু এ হলেই মন কেন বলে না সব পাওয়া হয়ে গেল? কোথায় মানুষের সেই 'সবপেয়েছি'-র দেশ?

ক্লান্তি গেলেও ক্ষান্তি আসে না কেন? আবার কেন সন্ধানের ইন্ধন জ্বলে?

সেই সন্ন্যাসী কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল। হল না বুঝি গুরুপ্রাপ্তি। অন্ধকার থেকে আলোতে আগমন।

ঘুরতে-ঘুরতে গয়ায় এসেছে বিজয়। এখানে এসে শুনতে পেল আকাশগংগা পাহাড়ে রঘুবর দাস এক মস্ত সাধু। আর কথা নেই, অমনি ছুটল সেই আশ্রমে। বাবাজীর পায়ে পড়ে কাঁদতে লাগল বিজয় : 'বাবাজী, কি করে উদ্ধার হব? কে আমার হাত ধরবে?'

এমন সাধু আর দেখেনি রঘুবর। যেমন উত্তাল ভক্তি তেমনি উদ্দাম ব্যাকুলতা। আশীর্বাদের ভংগিতে বললে, 'দয়াল রামজী তোমকো আলবৎ কৃপা করেগা। দৈন্য ছোড়ো।'

যতক্ষণ তার দেখা না পাই ততক্ষণ কি করে ছাড়ি এই দীন বেশ?

সেখান থেকে আরেক সাধুর সন্ধানে চলল ব্রহ্মযোনির পাহাড়ে। বিজয়কে দেখে সেই সাধু তো আনন্দে আত্মহারা। বাহু বাড়িয়ে আলিংগন করল বুকের মধ্যে। শুধু বললে, 'আনন্দে রহো। আনন্দে রহো।'

যাই বলো, রঘুবর দাসের আশ্রমটিই বিজয়ের মনে ধরেছে। এই আশ্রমটিই যেন এক দিন সে দেখেছিল স্বপ্নে। এই পাহাড়, এই মন্দির, মন্দিরে এই মহাবীরের মূর্তি। কেন দেখেছিল কে জানে, কিন্তু জায়গাটি ভারি প্রাণজুড়ানো। সংকেতে-সংগীতে ভরা।

এক দিন রঘুবরের সঙ্গে বসে গল্প করছে বিজয়, এক রাখাল ছেলে এসে খবর দিলে, পাহাড়ের উপরে কে একজন মস্ত লোক এসেছেন। স্বপ্নে মহাবীর যেন এই পর্বতশীর্ষের দিকেই ইশারা করেছিল। তাড়াতাড়ি ছুটে গেল দুজনে। দেখল এক অপূর্বকান্তি তেজস্বান মহাপুরুষ। মাথা ঘিরে জ্যোতির্গোলক। কিন্তু তাদের তিনি কাছে ঘেঁষতে দিলেন না। ইশারায় বললেন চলে যেতে।

কি আর করা! ম্লান মুখে ফিরে গেল বিজয়। কিন্তু মন রইল সেই পর্বতের নির্জনতায়।

কিছু গাঁজা কিনল বিজয়। ভাবল গাঁজা পেলে সাধু নিশ্চয় তাকে ফিরিয়ে দেবেন না। দুটো অন্তত কথা কইবেন। একা-একা চলে এল সে গুটি-গুটি। গাঁজা দিতে হল না, কথা কইলেন সাধু। জিগগেস করলেন, 'কি করো?'

ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করি।

'ব্রাহ্মধরম? ও হাম জানতা হ্যায়। কলকাতামে ব্রাহ্মসমাজ হ্যায়। রাজা রামমোহন একঠো বড়া আদমি থা। আগাড়ি ওহি ব্রাহ্মধরম স্থাপন কিয়া। ওলোগ বেলায়েত গিয়া—'

বিজয় তো অবাক। পশ্চিমী সাধু, বাঙলা দেশের এত খবর জানে কি করে?

'দেবেন বাবু কেশব বাবু সব কোইকো হাম পছান্তা—'

যত কথা বলেন সাধু ততই যেন বেহুঁস হয়ে আসে বিজয়। তার আর নড়বার-চড়বার ক্ষমতা নেই। জিভও পর্যন্ত অসাড় হয়ে গেছে। জ্ঞানহারা অবস্থায় নীরবে কাঁদতে লাগল।

মহামানব তাকে টেনে নিলেন কোলের মধ্যে। দেহে শক্তি সঞ্চার করলেন। শুধু তাই নয়, কানে দীক্ষামন্ত্র দিয়ে দিলেন। লাফ দিয়ে উঠে বসল বিজয়। পায়ে লুটিয়ে পড়ে প্রণাম করল। কৃপাসিন্ধুর এ কী কৃপাবিন্দু! একে-একে সাধন-প্রণালী শিখিয়ে দিলেন সাধু। শুধু সাধু নয়, বলো গুরুদেব। বলো আকাশগঙ্গার পরমহংস।

কঠোর সাধনে লেগে গেল বিজয়। শুকনো কাঠে আগুনই শুধু জ্বলছে, কিন্তু কোথায় সেই হিরণ্যগর্ভ?

গুরুদেব হঠাৎ এক দিন আবার দেখা দিলেন। বললেন, 'কাশী যাও। হরিহরানন্দ সরস্বতীর কাছে গিয়ে সন্ন্যাস নাও।'

তক্ষুনি কাশী ছুটল। বের করল সেই সরস্বতীকে। বললে, পৈতে ত্যাগ করে ব্রাহ্মধর্মে ঢুকেছি। এখন প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে আমাকে সন্ন্যাস দিন।

তোমার এই উচ্চাবস্থায় প্রায়শ্চিত্তের দরকার নেই। তবে তোমাকে আবার যথারীতি উপবীত গ্রহণ করতে হবে। তার পরে তিন দিন পরে বিরজাহোমে শিখাসূত্রের আহুতি দিয়ে সন্ন্যাসী হবে তুমি।

তথাস্তু। আমি সন্ন্যাসী হব। সর্বপ্রকার কাম্যকর্ম ত্যাগ করে সম্যকরূপে ভগবানে যে আত্মসমর্পণ করে সেই সন্ন্যাসী। পুরো দস্তুর সন্ন্যাসী হয়েই বিজয় ফিরে এল দক্ষিণেশ্বরে। দক্ষিণেশ্বরের পরমহংসের কাছে। বললে, 'হে শ্রীহরি—' যদিও এখানেই বিজয়ের সাধনার ইতি নয়—এখানে এক মহাস্বীকৃতি।

৮১
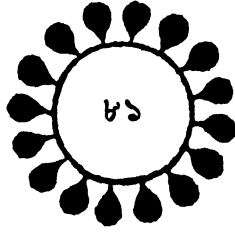
বরানগরে বেড়াতে এসেছে মহেন্দ্র গুপ্ত। আটাশ বছর বয়েস, শ্যামবাজার মেট্রোপলিটান ইস্কুলের হেডমাস্টার। বেড়াতে এসেছে বন্ধু সিদ্ধেশ্বর মজুমদারের বাড়ি।

এণ্ট্রান্সে দ্বিতীয়, এফ-এ-তে পঞ্চম, বি-এ-তে তৃতীয় হয়ে বেরিয়েছে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে। আইন পড়বার শখ, সংসারের প্রয়োজনে চাকরিতে ঢুকেছে। প্রথমে কেরানিগিরি, ইদানীং মাস্টারি। গোড়ার দিকে যশোর নড়ালে, এখন কলকাতায়। সিটি স্কুল, এরিয়ান স্কুল, মডেল স্কুল শেষ করে এখন এসেছে বিদ্যাসাগরের ইস্কুলে। সে ইস্কুলের শ্যামবাজার ব্রাঞ্চে।

'গঙ্গার ধারে চমৎকার একটি বাগান আছে, যাবে বেড়াতে?' জিগগেস করলে সিদ্ধেশ্বর।

প্রসন্ন বাঁড়ুয্যের বাগান দেখে ফিরছিল দুজনে। মাস্টার বললে, 'কার বাগান?'

'রাসমণির বাগান। সেখানে একজন পরমহংস আছেন। যাবে?'

'সে তো শুনেছি উন্মাদ।'

'না হে, এখন আর তার সে অবস্থা নেই। সে এখন শান্ত সদানন্দ বালক। দেখলে চোখ জুড়োয়।'

হাঁটতে-হাঁটতে চলে এল দুজনে। একেবারে ঠাকুরের ঘরে।

এই প্রথম দর্শন! এ কে! এ কি মানুষ, না, শুভ্র স্বচ্ছ অক্ষুণ্ণানন্দ আকাশ! একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল তার দিকে। মনে হল সমস্ত জীবনের সুখ-দুঃখ-মন্থন-ধন যেন বসে আছে সামনে।

কিন্তু এ কোথায় এলাম? কাঁসর-ঘণ্টা খোলকরতাল বেজে উঠেছে একসঙ্গে। দেবালয়ে আরতি হচ্ছে বুঝি?

চলো আগে দেখে আসি মন্দির। দ্বাদশ শিবমন্দির। রাধাকান্তের মন্দির। আর এই ত্রিভুবনজননী কারুণ্যপূর্ণেক্ষণা ভবতারিণী।

মন্দির দেখে আবার ফিরল তারা ঠাকুরের ঘরে। ঘরের দরজা ভেজানো। পাশেই বৃন্দে-ঝি দাঁড়িয়ে। জল-খাবারের জন্যে লুচি বরাদ্দ থাকে—এই সেই বৃন্দে-ঝি। মাঝে-মাঝে অসময়ে কোনো ভক্ত এলে যদি তার বরাদ্দ লুচি খরচ হয়ে যায়, সে বকে অনর্থ করে। বলে, ওমা, কেমন সব ভদ্দরলোকের ছেলে গো, আমারটি সব খেয়ে বসে আছে। সামান্য মিষ্টিটাও পাই না?

পাছে এই সব কথা ছেলেদের কানে যায়, ঠাকুরের দারুণ ভয়। এক দিন তেমনি খরচ হয়ে গেছে লুচি, ঠাকুর প্রমাদ গুনছেন। নবতে চলে এসেছেন শ্রীমা'র কাছে। বলছেন, 'ওগো, বৃন্দের খাবারটি তো খরচ হয়ে গেল! এখন চটপট রুটিলুচি যা-হয় কিছু করে রাখো, নইলে এক্ষুনি এসে বকাবকি করবে। দুর্জনকে পরিহার করে চলতে হয়—'

বৃন্দেকে দেখেই তো শ্রীমা'র মুখ চুন। বললেন, 'বোসো, তোমার খাবারটা তৈরি করে দি।'

থাক। বুঝেছি। ঢের হয়েছে। গরিবের উপরেই যত অত্যাচার।

'বেশিক্ষণ লাগবে না। এখুনি তৈয়ের করে দিচ্ছি।'

'আর তৈয়েরে কাজ নেই বাছা—এমনি দাও।'

শ্রীমা তখন সিধে সাজিয়ে দিলেন। ঘি ময়দা আলু পটল—কত কি।

সেই বৃন্দে-ঝি দরজায়। একটু বোধ হয় ঘাবড়ে গেল মাস্টার। বললে, 'হ্যাঁ গা, সাধুটি কি ভিতরে আছেন?'

'ভিতরে থাকবে না তো যাবে কোথায়?'

'কত দিন আছেন বলো তো এখানে?'

'আমি কত দিন আছি তার হিসেব কে রাখে ঠিক নেই—অন্যের হিসেব রাখতে যাব!'

মাস্টার দ্বিধা করল, তবু জিগগেস না করে পারল না। 'আচ্ছা, ইনি কি খুব বই-টই পড়েন?'

'ও সব তোমরা পড়ো।' বৃন্দে-ঝি ঝামটা মেরে উঠল : 'সব বই ওঁর মুখে-মুখে।'

বই পড়ে না সে আবার কি রকম জ্ঞানী!

গ্রন্থ নয় হে, গ্রন্থি—গাঁট। শুধু পাণ্ডিত্যে মানুষ ভোলাতে পারবে, তাঁকে পারবে না। হাজার বই পড়ো, হাজার শ্লোক আওড়াও, ব্যাকুল হয়ে তাঁতে ডুব না দিলে তাঁকে ছুঁতেও পারবে না। পণ্ডিত খুব লম্বা-লম্বা কথা বলে, কিন্তু নজর কেবল পার্থিব সুখে। যেমন শকুনি খুব উঁচুতে ওঠে, কিন্তু নজর রয়েছে গো-ভাগাড়ে। শুধু-পণ্ডিতগুলো দরকোচাপড়া। না এ দিক না ও দিক।

তাই সংক্ষেপে করো। পিঁপড়ের মতো বালিটুকু ত্যাগ করে চিনিটুকু নাও। শব্দার্থ না খুঁজে মর্মার্থ খোঁজো। সাধুমুখে গুরুমুখে জেনে নাও সেই মর্ম-স্থলের সংবাদ। এক জানার নাম জ্ঞান, অনেক জানার নাম অজ্ঞান।

এক দৃষ্টে শুধু পাখির চোখ দেখ। লক্ষ্যভেদের সময় অর্জুনকে দ্রোণাচার্য কী জিগগেস করলেন? জিগগেস করলেন, 'আমাদের সবাইকে দেখতে পাচ্ছ? এই সব রাজা-রাজড়া, গাছ, গাছের ডাল-পালা, তার উপরে পাখি—দেখতে পাচ্ছ সব?'

অর্জুন বললে, 'শুধু পাখির চোখ দেখতে পাচ্ছি।'

যে শুধু পাখির চোখ দেখে, সেই লক্ষ্যভেদ করে।

'বন্ধ ঘরে ইনি বুঝি এখন সন্ধে করছেন—' বৃন্দে ঝিকে জিগগেস করল মাস্টার।

'তোমার বুদ্ধি কি গো! ঘরে ধুনো দিয়েছি। যাও না, ঘরে গিয়ে বোসো না।'

ঘরে ঢুকে প্রণাম করে বসল দুজনে। মামুলী দু-চারটে প্রশ্ন করলেন ঠাকুর। কথার ফাঁকে-ফাঁকে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছেন। সেই তন্ময়তার মধ্যে শিথিল ঔদাসীন্য নেই, বরং রয়েছে আতীব্র একাগ্রতা। একেই বুঝি ভাব বলে।

সিদ্ধেশ্বর বললে, 'সন্ধের পর এমনি ওঁর ভাবান্তর হয়।'

তবে আরেক দিন সকাল বেলা আসব। দেখব প্রভাত-আলোয়।

শীতের সকাল। নাপিত এসেছে, ঠাকুর কামাতে যাচ্ছেন। গায়ে র‍্যাপার, ধার-গুলো শালু দিয়ে মোড়া, পায়ে চটিজুতো।

'তুমি এসেছ? আচ্ছা, বোসো আমার কাছে।'

দক্ষিণের বারান্দায় কামাতে বসলেন। কামাচ্ছেন আর কথা কইছেন।

হঠাৎ বলে উঠলেন কাতর ভাবে। 'হ্যাঁগা, কেশব কেমন আছে বলতে পারো? তার বড্ড অসুখ।'

'আমিও শুনেছি বটে।'

'তার অসুখ হলেই আমার প্রাণটা বড় ব্যাকুল হয়। রাত্রি শেষ প্রহরে উঠে আমি কাঁদি। বলি, মা, কেশবের যদি কিছু হয়, তবে কার সঙ্গে কথা কবো।'

মাস্টারের বুকের ভিতরটা কেমন করে উঠল। বললে, 'এখন বোধ হয় ভালো আছেন।'

'কেশবের জন্যে মা'র কাছে ডাব চিনি মেনেছি। কলকাতায় গেলে দিয়ে আসব সিদ্ধেশ্বরীকে।' বলে তাকালেন মাস্টারের দিকে। শুধোলেন, 'তোমার কি বিয়ে হয়েছে?'

'আজ্ঞে হাঁ, হয়েছে।'

যন্ত্রণায় প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন ঠাকুর। 'ওরে রামলাল! যাঃ, বিয়ে করে ফেলেছে।'

মাথা হেঁট করে বসে রইল মাস্টার। বিয়ে করা কি এতই দোষ?

আবার জিগগেস করলেন ঠাকুর, 'ছেলে হয়েছে?'

বুকের মধ্যেটা ঢিপ-ঢিপ করছে মাস্টারের। ভয়ে-ভয়ে বললে, 'আজ্ঞে, হয়েছে একটি।'

'যাঃ, ছেলেও হয়ে গেছে।' আবার কাতরোক্তি করে উঠলেন। পরে বললেন স্নেহস্বরে, 'তোমার মধ্যে যে ভালো লক্ষণ ছিল। আমি কপাল চোখ এ সব দেখে বুঝতে পারি—'

জানো, মানুষের মন হচ্ছে সরষের পুঁটলি। সরষের পুঁটলি ছড়িয়ে পড়লে কুড়ানো ভার হয়ে ওঠে। তেমনি কামিনী-কাঞ্চনে মন ছড়িয়ে পড়লে ছড়ানো মন কুড়ানো দায়।

অনেকের কাছে স্ত্রী একেবারে শিরোমণি। বলে, আমাকে কত ভালোবাসে, কত সেবা-যত্ন করে, তাকে ছেড়ে যাই কেমন করে? শিষ্যকে গুরু তাই এক ফন্দি শিখিয়ে দিল। একটা ওষুধের বড়ি দিয়ে বললে, এইটে খেলেই মড়ার মত হয়ে যাবি, তোর জ্ঞান থাকবে না। কিন্তু সব বেশ পাবি দেখতে-শুনতে। তার পর আমি এলে তোর চৈতন্য হবে। যেমন কথা তেমন কাজ। শিষ্যের বাড়িতে

কান্নাকাটি পড়ে গেল। ওগো দিদি গো আমার কি হল গো, তুমি আমাদের কী করে গেলে গো—বলে আছড়ে-আছড়ে কাঁদতে লাগল স্ত্রী। লোকজন সব জড়ো হল। খাট এনে তাকে ঘর থেকে বার করবার যোগাড় করলে। কিন্তু বড়ির গুণে লাশ এঁকে-বেঁকে আড়ষ্ট হয়ে যাওয়াতে দরজা দিয়ে তা বেরুচ্ছে না সিধেসিধি। তখন একজন একখানা কাটারি নিয়ে এল। দরজার চৌকাঠ কাটতে আরম্ভ করলে। দুম-দুম শব্দ শুনে স্ত্রী ছুটে এল অস্থির হয়ে। ওগো, কী হয়েছে গো! কী করছ গো! ইনি বেরুচ্ছেন না তাই দরজা কাটছি। অমন কম্ম করো না গো! স্ত্রী চেঁচাতে লাগল। আমি এখন রাঁড়-বেওয়া হলুম, আমার আর দেখবার-শোনবার কেউ নেই। কটি নাবালক ছেলেকে মানুষ করতে হবে। এ দুয়ার গেলে তো আর হবে না। ওগো, ওঁর যা হবার তা তো হয়ে গেছে, ওঁর হাত-পা কেটে বার করো। ততক্ষণে গুরু এসে গিয়েছে। লাফিয়ে উঠল শিষ্য। হাঁক পাড়লে, তবে রে শালী, আমার হাত-পা কাটবে? এই বলে গুরুর সঙ্গে বেরিয়ে গেল বাড়ি ছেড়ে।

জানো না বুঝি, অনেক স্ত্রী আবার ঢঙ করে শোক করে। কাঁদতে হবে বলে গয়না নৎ খুলে বাক্সের ভেতরে রেখে আসে। তার পর আছড়ে পড়ে কাঁদে—'ওগো দিদি গো, আমার কী হলো গো—'

এই স্ত্রী! এই সংসার!

'আচ্ছা তোমার পরিবার কেমন? বিদ্যাশক্তি না অবিদ্যাশক্তি?'

মাস্টার ভরসা পেয়ে বললে, 'আজ্ঞে ভালো, কিন্তু অজ্ঞান।'

যেন লেখাপড়া শিখলেই জ্ঞান!

ঠাকুর একটু বিরক্ত হলেন। বললেন, 'আর তুমি এক মস্ত জ্ঞানী!'

অহঙ্কার চূর্ণ হয়ে গেল মাস্টারের।

শোনো, বারে-বারে শোনো, এক জানার নাম জ্ঞান, অনেক জানার নাম অজ্ঞান।

চৈতন্যদেব দক্ষিণ দেশে ভ্রমণের সময় দেখলেন একজন গীতা পাঠ করছে, আর একজন একটু দূরে বসে কেঁদে বুক ভাসাচ্ছে। চৈতন্যদেব তাকে জিগগেস করলেন, তুমি এ সব কিছু বুঝতে পারছ? সে বললে, ঠাকুর, আমি শ্লোক কিছুই বুঝতে পারছি না, আমি অর্জুনের রথ দেখতে পাচ্ছি আর তার সামনে ঠাকুর আর অর্জুন কথা কইছেন।

জানতেও বই লাগে না, চিনতেও বই লাগে না। অক্ষরজ্ঞান ছাড়াও সম্ভব সে অক্ষর-জ্ঞান।

কলকাতা যাবার পথে বিষ্ণুপুর ইষ্টিশানে গাড়ির অপেক্ষা করছেন শ্রীমা। হঠাৎ এক হিন্দুস্থানী কুলি তাঁকে দেখতে পেয়ে ছুটে এল। কাঁদতে-কাঁদতে লুটিয়ে পড়ল পায়ের কাছে। বললে, 'তু মেরী জানকী, তুঝে ম্যায় নে কিতনে দিনোঁসে খোঁজা থা। ইতনে রোজ তু কাঁহা থী?'

তুই আমার মা জানকী। তোকে কত দিন ধরে খুঁজছি। তুই এত দিন কোথায় ছিলি?

মা তাকে শান্ত করলেন। বললেন, একটি ফুল নিয়ে আয়। ফুল নিয়ে কি করতে হবে বলে দিতে হল না কুলিকে। মা'র পাদপদ্মে নিবেদন করলে। মা তাকে দিয়ে দিলেন ইষ্টমন্ত্র।
কেশবেরও বড় সাধ রামকৃষ্ণের পা দুখানি ফুল দিয়ে পুজো করে। কিন্তু পাড়ার লোক, দলের লোক কি ভাববে এই ভেবে সাহস পায় না।
সেদিন রামকৃষ্ণের সঙ্গে ব্রহ্মজ্ঞানের কথা হচ্ছিল কেশবের।
কেশব বললে, আরো বলুন।
রামকৃষ্ণ হেসে বললেন, 'আর বললে দলটল থাকবে না।'
স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল কেশব। বললে, 'তবে আর থাক মশাই।'
এই দল-দল করতেই দলা পাকিয়ে গেল। তুমি দল-দল করছ আর এদিকে তোমার দল থেকে লোক ভেঙে-ভেঙে যাচ্ছে।
'আর বলেন কেন মশাই। তিন বচ্ছর এ দলে থেকে আবার ও দলে চলে গেল। যাবার সময় আবার গালাগাল দিয়ে গেল—'
রামকৃষ্ণ বললেন, 'তুমি লক্ষণ দেখ না কেন? যাকে-তাকে চেলা করলে কি হয়?'
যতক্ষণ মোড়লি করছ ততক্ষণ মা আসে না। মা ভাবে ছেলে আমার মোড়ল হয়ে বেশ আছে। আছে তো থাক।
যে ভাবছে, আমি দলপতি, দল করেছি, লোকশিক্ষা দিচ্ছি, সে কাঁচা আমি। ঘি কাঁচা থাকলেই কলকলানি করে। মধু যতক্ষণ না পায় ততক্ষণই ভনভনানি করে মাছি। তুমি এখন ও সব ছাড়ো। পাকা ঘি, পাকা আমি হও। সালিশি-মোড়লি তো অনেক করলে, এখন তাঁর পাদপদ্মে বেশি করে মন দাও। বলে, কার দল কে করে। দল ভাঙে তো তোমার কি। বলে, লংকায় রাবণ মলো, বেহুলা কেঁদে আকুল হলো।
তুমি দলে নও, তুমি শতদলে।
কিন্তু কিছুতেই পুরোপুরি হয় না কেশবের। সিদ্ধি মুখে নিয়ে শুধু কুলকুচোই করলে, পেটে ঢোকালে না। পেটে না ঢোকালে কি নেশা হবে?
অহেতুকী ভক্তি না হলে কি মিলবে ভগবানকে?
কেশব উপাসনা করছে। বলছে, হে ঈশ্বর, তোমার ভক্তিনদীতে যেন ডুবে যাই।
রামকৃষ্ণ বললেন, 'ওগো, তুমি ভক্তিতে ডুবে যাবে কি করে? ডুবে গেলে চিকের ভেতর যারা আছে তাদের হবে কি! বেশি দূর এগোতে চেয়ো না—বেশি এগোতে গেলে সংসার-টংসার ফক্কা হয়ে যাবে। তবে এক কর্ম কোরো। মাঝে-মাঝে ডুব দিয়ো, আর এক-একবার আড়ায় উঠো।'
রামকৃষ্ণকে বাড়িতে নিয়ে এসেছে কেশব। অনেক ফুল নিয়ে এসেছে। অনেক ফুল দিয়ে পুজো করবে রামকৃষ্ণকে। প্রাণ ঢেলে পুজো করবে।
তাই করলে কেশব। কিন্তু—
কিন্তু পুজো করবার আগে ঘরের দরজা বন্ধ করলে। বন্ধ করলে, পাছে তার পাড়ার লোক, তার দলের লোক টের পায়।

মনে-মনে হাসলেন রামকৃষ্ণ। বললেন, 'ও যেমন দরজা বন্ধ করে পূজা করলে, তেমনি ওর দরজাও বন্ধ থাকবে!'

কিন্তু বিজয়? মুক্ত অঙ্গনে সকলের চোখের সামনে ঠাকুরের পাদমূলে লুটিয়ে পড়ল। ঠাকুরের পা দুখানি ধরলে নিজের বুকের মধ্যে। রক্তমাখা প্রাণপুষ্পে অর্ঘ্য দিলে ঠাকুরকে।

মহিমা চক্রবর্তী জিগগেস করলে, 'বহু তীর্থ করে এলেন, দেখে এলেন অনেক দেশ, এখন এখানে কী দেখলেন বলুন।'

'কি বলবো।' অশ্রুভরভর বিজয়ের কণ্ঠস্বর : 'দেখছি, যেখানে এখন বসে আছি, এখানেই সব। কেবল মিছে ঘোরা। কোনো-কোনো জায়গায় এরই এক আনা, দু আনা, বড় জোর চার আনা—এই পর্যন্ত। এখানেই পূর্ণ ষোলো আনা দেখছি।'

'দেখ বিজয়ের কি অবস্থা হয়েছে। লক্ষণ সব বদলে গেছে। যেন সব আউটে গেছে। আমি পরমহংসের ঘাড় ও কপাল দেখে চিনতে পারি। বলতে পারি পরমহংস কিনা।'

নিজের কথা শুনবে না বিজয়। পরের কথা, একের কথা, প্রত্যক্ষের কথা শুনবে। বললে, 'এখানেই ষোলো আনা।'

'কেদার বললে, অন্য জায়গায় খেতে পাই না—এখানে এসে পেটভরা পেলুম।'

মহিমা বললে, 'পেটভরা কি! উপছে পড়ছে।'

হাত জোড় করল বিজয়। বললে, 'বুঝেছি আপনি কে। আর বলতে হবে না।'

ভাবারূঢ় অবস্থায় শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, 'যদি তা হয়ে থাকে তো তাই।'
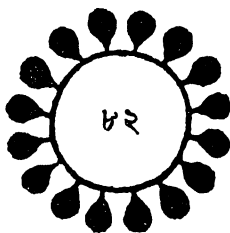
রঙ্গন আর জুঁই ফুল দিয়ে মালা গেঁথেছে সারদা। সাত-লহর গোড়ে মালা। বিকেল বেলা গেঁথে পাথরের বাটিতে জল দিয়ে রাখতেই কুঁড়িগুলি ফুটে উঠেছে। মন্দিরে পাঠিয়ে দিল। জগদম্বার গলার গয়না খুলে রেখে পরানো হল ফুলের মালা।

রামকৃষ্ণ দেখতে এসেছে ভবতারিণীকে। আহা এ কি রূপ! একদিকে নিকষের মতো কালো আকাশ, তার গায়ে সূর্যোদয়ের ছিটে-লাগা শাদা সমুদ্রের ঢেউ। ভাবে একেবারে বিভোর রামকৃষ্ণ।

সেই যে ছ-বছর বয়সে প্রথমে দেখেছিল সরু আল-পথ দিয়ে মাঠে যেতে-যেতে। কাজল কালো আকাশের কোলে সিতপক্ষ বকের বলাকা।
'আহা, কালো রঙে কী সুন্দরই মানিয়েছে!'
যেন জীবন-মৃত্যুর কোলাকুলি। মাঝখানে ঈশ্বরানুরাগের রক্তিমা।
'কে গেঁথেছে রে এমন মালা?' চারদিকে তাকালো রামকৃষ্ণ।
'আর কে!' পাশেই ছিল বৃন্দে-ঝি, টিপ্পনি কাটল।
রামকৃষ্ণের বুঝতে আর বাকি নেই, কে! সে ছাড়া আর কার এমন শুভ্রতা, কার এমন চিকণ-গাঁথন। ভক্তির সুগন্ধে গদগদ হয়ে আছে সারল্যের হাসিটি।
'আহা, তাকে একবার ডেকে নিয়ে এস।' স্নেহের আনন্দে উছলে উঠল রামকৃষ্ণ। 'মালা পরে মায়ের কি রূপ খুলেছে একবার দেখে যাক।'
বৃন্দে-ঝি ডাকতে গেল সারদাকে।
লজ্জায় জড়িপটি খেয়ে গেল। মন্দিরে কেউ আর নেই তো এ সময়?
নেই। তা ছাড়া ঠাকুর যখন ডেকেছেন—
কিন্তু মন্দিরের কাছে আসতেই দেখল সুরেন মিত্তির, বলরাম বোস, আরো কে কে, আসছে এদিকে। হয়েছে! এখন তবে কোথায় যাই! কোথায় লুকোই। বৃন্দের আঁচল টেনে ধরে তাড়াতাড়ি নিজেকে ঢাকা দিল সারদা। কোনো রকমে একটা আড়াল রচনা করে পিছনের সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গেল।
আশ্চর্য, ঠিক নজর রেখেছে রামকৃষ্ণ। বলে উঠল, 'ওগো ওদিক দিয়ে উঠো না। সেদিন এক মেছুনি উঠতে গিয়ে পা পিছলে পড়ে মরেছে। সামনের দিক দিয়েই এস।'
বলরাম বাবুরা সরে দাঁড়ালো। সারদা উঠে দাঁড়ালো। ভাবে-প্রেমে গান ধরল রামকৃষ্ণ।
সেবার সিঁড়ি দিয়ে উঠতে সত্যি-সত্যিই কিন্তু পড়ে গিয়েছিলেন শ্রীমা। দুধের বাটি নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠছেন—বাটিতে আড়াই সের দুধ। ঠাকুরের তখন অসুখ, আছেন কাশীপুরের বাড়িতে। হঠাৎ কি হল, মাথা ঘুরে পড়ে গেলেন শ্রীমা। দুধ তো গেলই, পায়ের গোড়ালির হাড় সরে গেল। নরেন আর বাবুরাম কাছে পিঠে কোথাও ছিল, ছুটে এসে ধরলে মাকে।
ঠাকুর শুনতে পেলেন। ডাকিয়ে আনলেন বাবুরামকে। বললেন, 'তাই তো—এখন তবে আমার খাওয়ার কি উপায় হবে?'
ঠাকুর তখন মণ্ড খান। সে-মণ্ড তৈরি করে দেন শ্রীমা। রোজ উপরের ঘরে গিয়ে খাইয়ে আসেন ঠাকুরকে।
'এখন তবে কে আমার মণ্ড রাঁধবে? কে খাইয়ে দেবে?'
শ্রীমা'র পা বিষম ফুলে উঠেছে, নিদারুণ যন্ত্রণা। ওঠা-চলা সম্ভবের বাইরে। গোলাপ-মা রেঁধে দিচ্ছে মণ্ড। নরেন খাইয়ে দিচ্ছে নিজের হাতে।
একদিন বাবুরামকে নিজের কাছটিতে ডেকে আনলেন ঠাকুর। নিজের নাকের কাছে হাত ঘুরিয়ে ঠারে-ঠোরে বললেন, 'ওকে একবারটি এখানে নিয়ে আসতে

পারিস?' বাবুরাম তো অবাক। পা ফেলতে পারেন না মাটিতে, সিঁড়ি বেয়ে আসবেন কি করে উপরে?
ঠাকুর পরিহাস করে বললেন, 'একটা ঝুড়ির মধ্যে ওকে বসিয়ে দিব্যি মাথায় করে তুলে নিয়ে আসবি।'
নরেন আর বাবুরাম উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠল।
ব্যথাটা একটু কম পড়তেই উঠে দাঁড়ালেন শ্রীমা। নরেন-বাবুরামকে লক্ষ্য করে বললেন, 'আমাকে তোমরা ধরে-ধরে নিয়ে যাও উপরে। হ্যাঁ, খুব পারব আমি। ওঁকে নিজের হাতে খাইয়ে আসি।'
বাবুরাম আর নরেন মাকে নিয়ে চলল ধরে-ধরে।
কিন্তু সেবার যখন ঠাকুরের হাত ভেঙেছিল তখন কী হয়েছিল?
জগন্নাথকে মধুর ভাবে আলিঙ্গন করতে গিয়েই ঠাকুর পড়ে গেলেন। ভেঙে গেল বাঁ-হাত। এর দু-একদিন আগেই সারদামণি ফিরেছে দেশ থেকে। দক্ষিণেশ্বরে ফিরতে না ফিরতেই এই অঘটন।
'কবে রওনা হয়েছিলে?' জিগগেস করলেন ঠাকুর।
'বেস্পতিবার।'
'বেলা তখন কত?'
হিসেব করে দেখা গেল, বারবেলা।
আর কথা নেই। ঠাকুর বললেন দৃঢ়স্বরে, 'বিষ্যুৎবারের বারবেলায় রওনা হয়ে এসেছ বলেই আমার হাত ভেঙেছে। যাও, যাত্রা বদলে এস।'
আর কথাটি নেই। সারদা ফিরে চলল দেশে। যাত্রা বদলে আসতে।
তুমি যেমন বলো তেমনি চলি। তোমার যাতে আরাম তাতেই আমার আনন্দ। বৃক্ষ হয়ে যদি বসতে বলো, বসি। আকাশ হয়ে যদি বলো ওড়ো, উড়ে বেড়াই। বৃক্ষ আর আকাশ, দুইই আমার আশ্রয়।
মথুরবাবুর দেওয়া পিঁড়িতে রামকৃষ্ণ বসে আর সারদা তার গায়ে তেল মাখিয়ে দেয়। সারদা তন্ময় হয়ে দেখে, গা থেকে যেন জ্যোতি বেরুচ্ছে। আর কী রঙ! যেন হরিতালের মত! বাহুতে সোনার ইষ্টকবচ, তার সঙ্গে গায়ের রঙ যেন মিশে গেছে।
ঠাকুর তখন দেহ রেখেছেন, ঠাকুরের ইষ্টকবচ তখন শ্রীমা'র হাতে। ট্রেনে বৃন্দাবন যাচ্ছেন শ্রীমা, দেখতে পেলেন জানলার বাইরে ঠাকুর দাঁড়িয়ে। শুধু দাঁড়িয়ে নয়, জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দিয়েছেন ভিতরে। বলছেন, 'কবচটি যে সঙ্গে-সঙ্গে রেখেছ, দেখো যেন না হারায়।'
মা'র যে হাতখানিতে কবচ ছিল তা বোধ হয় জানলার উপরে অনাবৃত ছিল। দেখতে পেয়ে ঠাকুর তাই সাবধান করে দিলেন।
আগে একবার সত্যিই গিয়েছিল হারিয়ে। সেই কবচ পুজো করতেন শ্রীমা। একবার ঠাকুরের এক তিথিপুজার দিন ফুল-বেলপাতার সঙ্গে তাকেও ফেলে দিয়েছিল গঙ্গায়। কারুর খেয়াল ছিল না। কিন্তু যাঁর কবচ তাঁর খেয়াল

পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ : ২য় খণ্ড

শ্রীশ্রীসারদামণি

আছে। ভাঁটায় জল যখন কমে গেল, তখন গঙ্গার পারে খেলতে গেল হৃষি, বলরামের ছেলে। দিব্যি পেয়ে গেল ইষ্টকবচ।
যা হারাবার নয় তা কে হরণ করে। নিশীথ রাত্রে নিজের হাতে যদি ঘরের আলো নিবিয়েও ফেলি, বাইরে চেয়ে দেখি ধ্রুবতারার জ্যোতিটি তুমি ঠিক জেবলে রেখেছ!
পরনে ছোট তেল-ধুতি, থস-থস করে গঙ্গায় নাইতে যায় রামকৃষ্ণ। কাচের উপর রোদ লেগে যেমন ঠিকরে পড়ে তেমনি তার গা থেকে একটা আভা ছিটকে পড়ছে চারদিকে। যে দেখে তারই আর পলক পড়ে না।
রামকৃষ্ণের জন্যে রাঁধে সারদা। যদিও পরিহাস করে বলে, শ্রীনাথ হাতুড়ে, তবু সারদার রান্নাটিতেই রামকৃষ্ণের অন্তরের রুচি। সজনে খাড়া বা পলতা শাক যেটি যখন রাঁধে সারদা, সেটিই একান্ত মনের মতন হয়ে ওঠে। স্বাদ আর পুষ্টির স্বাভাবিক মিতালি। রাত্রে দু-একখানি লুচি আর একটু সুজির পায়েস। কাশীপুরে তুলোর মতন নরম করে মাংসও রেঁধে দিয়েছেন শ্রীমা।
'আমি যখন ঠাকুরের জন্যে রাঁধতুম কাশীপুরে, কাঁচা জলে মাংস দিতুম। কখানা তেজপাতা আর অল্প খানিকটা মশলা। তুলোর মতন সেদ্ধ হলে নামিয়ে নিতুম।'
থালার উপর টিপে-টিপে ভাত বেড়ে দেয় সারদা। যাতে একটু কম দেখায়। বেশি ভাত দেখলে আঁৎকে ওঠে রামকৃষ্ণ। তাই সরুটি করে দেয় টিপে-টিপে। দুধের বেলায়ও তাই। আধ সের করে রোজ-বাঁধা। কখনো-সখনো একটু বেশি দিয়ে যায় গয়লা। সেটাকে ফুটিয়ে ঘন করে রাখে। সর করে। সর ভালোবাসে রামকৃষ্ণ। এমনি করে ভুলিয়ে-ভুলিয়ে খাওয়ায় সেই সদানন্দ শিশুকে। কিন্তু কিছুতেই লোভ নেই সেই শিশুর। একদিন একটা সন্দেশ মুখে পুরে দিতে গিয়েছিল সারদা, রামকৃষ্ণ বললে, 'ওতে আর কি আছে? সন্দেশও যা মাটিও তা।'
শুধু নারকেলের নাড়ু আর জিলিপির উপর একটু পক্ষপাত।
'ঠাকুর নারকেলের নাড়ু ভালোবাসতেন।' এক স্ত্রী-ভক্তকে বললেন এক দিন শ্রীমা; 'দেশে গিয়ে তাই করে তাঁকে ভোগ দেবে।'
আর জিলিপি?
কেশব সেনের বাড়িতে খেতে বসেছেন ঠাকুর। খাওয়া হয়ে গিয়েছে—হাত তুলে বসেছেন পাত থেকে। আর খাবেন না, শত সাধাসাধি করলেও না। এমন সময় জিলিপি এসে উপস্থিত। আর যায় কোথা! ঠাকুর তুলে নিলেন জিলিপি।
এ হচ্ছে বড়লাটের গাড়ি। ঠাকুর প্রসন্ন চোখে হাসলেন। বড়লাটের গাড়ি দেখলে রাস্তা যেমন ফাঁকা হয়ে যায় তেমনি জিলিপি দেখে ভরা পেট হালকা হয়ে যাচ্ছে। জিলিপির সঙ্গে কার কথা! জিলিপি হচ্ছে অমৃতের লিপি! সেই শিশুকালের অকৃত্রিম সুস্বাদের সংবাদ। সেই কামারপুকুরের সত্য-ময়রার দোকান।
খাবার জায়গা হয়েছে রামকৃষ্ণের। নহবৎ থেকে থালা হাতে নিয়ে আসছে সারদা। ভক্তরা সব এখন সরে যাও। সিঁড়ি থেকে বারান্দায় পা দিয়েছে, কোত্থেকে এক

মেয়ে-ভক্ত হাঁ-হাঁ করে ছুটে এল। 'দাও মা আমাকে দাও।' বলে প্রায় জোর করেই সারদার হাত থেকে টেনে নিল থালা। রামকৃষ্ণের আসনের কাছে ধরে দিয়ে সরে গেল। সারদা বসল এক পাশে। রোজ এমনিই এসে বসে। রামকৃষ্ণের খাওয়া দেখে। খেয়ে যে স্বাদ রামকৃষ্ণ পায় তারও চেয়ে সারদা অধিকতর পায় না-খেয়ে।

'তুমি এ কি করলে?' আসনে বসেই বললে রামকৃষ্ণ, 'আমার খাবার নিজে না নিয়ে ওর হাতে দিলে কেন? তুমি কি ওকে জানো না?'

একটা কলঙ্ক ছিল মেয়েটির। সারদা বললে, 'জানি।'

'জানো তো, দিলে কেন? এখন আমি খাই কি করে?'

মেয়েটির হাতের সেই আকুলতাটি বুঝি মনে পড়ল সারদার। বললে, 'আজকে খাও।'

'তবে বলো, আর কোনো দিন আর কারু হাতে দেবে না আমার খাবার?'

সারদা জোড় হাত করল। বললে, 'ওটি আমি পারব না। যে কেউ চাইলেই আমি ছেড়ে দেব ভাতের থালা।'

করুণাময়ীর এ আরেক অমৃত-পরিবেশন। আমার ভালোবাসার সঙ্গে আর যদি কেউ তার ভক্তির স্বাদটি মিশিয়ে দিতে চায় তা আমি বারণ করি কি করে?

'তবে চেষ্টা করব খুব।' সারদা বললে গাঢ়স্বরে, 'যাতে আমিই বরাবর নিজের হাতে নিয়ে আসতে পারি।' খুশি মনে খেতে লাগল রামকৃষ্ণ।

কাশীপুরে ঠাকুরের জন্যে শামুকের ঝোল ব্যবস্থা হল। ঠাকুরের ইচ্ছে শ্রীমাই তা রান্না করুক। শ্রীমা বললেন, 'ও আমি পারব না।'

'কেন কি হল?'

'ওগুলো জীয়ন্ত প্রাণী, চলে বেড়ায়। ওদের মাথা আমি ইট দিয়ে ছেঁচতে পারব না।'

'সে কি? আমি খাব, আমার জন্যে করবে!'

তখন, কি আর করা, রোক করে করতে লাগলেন শ্রীমা।

'মা, ঠাকুরকে অন্ন ভোগ দেব কি?' জিগগেস করলেন এক স্ত্রী-ভক্ত।

'হ্যাঁ, দেবে বৈ কি। তিনি শুকতো খেতে ভালোবাসতেন। গাঁদাল, ডুমুর, কাঁচকলা—'

'মাছ ভোগ দেব কি?' কুণ্ঠা-ভরা জিজ্ঞাসা মেয়েটির।

'হ্যাঁ, তাও দেবে। তিনি সেদ্ধ চালের ভাত খেতেন, মাছও খেতেন। অন্তত শনি-মঙ্গলবারে মাছ ভোগ দেবে। আর যেমন করে হোক তিন তরকারি ছাড়া ভোগ দেবে না—'

তারপরে পান সাজে সারদা। রামকৃষ্ণের মশলা এলাচ লাগে না। শাদাসিধে সাজা পানেই অন্তরঙ্গ স্বাদ। পান সাজছে নহবতে বসে। কতগুলো বেশ ভালো করে এলাচ-মশলা দিয়ে, কতগুলো শুধু শুপুরি-চুন দিয়েই। যোগেন বসে ছিল পাশে। জিগগেস করলে, 'কই এগুলোতে মশলা-এলাচ দিলে না? ওগুলো বা কার, এগুলোই বা কার?'

সারদা বললে, 'যেগুলো ভালো, এলাচ-দেওয়া, সেগুলো ভক্তদের। ওদেরকে আপনার করে নিতে হবে, তাই একটু আদর-যত্নের ছিটেফোঁটা ওগুলোতে। আর এলাচ-মশলা ছাড়া এগুলো—এগুলো ওঁর জন্যে। উনি তো আপনার আছেনই।'

তোমাকে ভালো ভাষায় ভোলাব না, তোমাকে ভালোবাসায় ভোলাব। তোমার জন্যে আমার কোনো সাজ-সজ্জা নেই, আমার এই সারল্যটুকুই আমার একমাত্র ভূষণ। আমার তো ঘোষণা নয়, আমার আহ্বান। অকপট না হলে তোমার কপাটপাটন হবে না যে।

আহারান্তে রামকৃষ্ণ ছোট খাটটিতে এসে বসে। তামাক খায়। সারদা এসে পা টেপে। শেষকালে, সারদার চলে যাবার আগে সারদাকে আবার প্রণাম করে রামকৃষ্ণ।

সন্ন্যাসী-স্বামীর একটি পরিত্যক্তা স্ত্রী এসেছে দক্ষিণেশ্বরে। একটু সাজগোজ করতে চায় বলে তার উপর তার শাশুড়ির বড় কড়া শাসন। শ্রীমা তাই বলছেন দুঃখ করে : 'আহা, ছেলেমানুষ বৌ, তার একটু পরতে-খেতে ইচ্ছে হয় না? একটু আলতা পরেছে তা আর কি হয়েছে? আহা, ওরা তো স্বামীকে চোখেই দেখতে পায় না—স্বামী সন্ন্যাস নিয়েছে। আমি তো তবু চোখে দেখেছি, সেবা-যত্ন করেছি, রেঁধে খাওয়াতে পেরেছি, যখন বলেছেন যেতে পেয়েছি কাছে, যখন বলেননি, দু'মাস পর্যন্ত নামিইনি নবত থেকে। দূর থেকে দেখে পেন্নাম করেছি—'

সাজতে সারদাও ভালোবাসে।

'কেন বাসবে না? ওরে, ওর নাম সারদা, ও সরস্বতী। তাই তো ভালোবাসে সাজতে।' বললে রামকৃষ্ণ। নিজে টাকা-কড়ি ছুঁতে পারে না, তাই ডাকালো হৃদয়কে। 'দ্যাখ তো, তোর সিন্দুকে কত টাকা আছে। ওকে ভালো করে দু ছড়া তাবিজ গড়িয়ে দে।' সিন্দুক থেকে তিনশো টাকা বেরুলো। তাই দিয়ে তাবিজ হল সারদার।

রামকৃষ্ণের মাইনে নিয়ে হিসেবে কি গোল করেছিল খাজাঞ্চি। কম দিয়েছিল। তাই নিয়ে এক দিন বললে সারদা, 'খাজাঞ্চিকে গিয়ে বলো না—'

রামকৃষ্ণ বললে, 'ছি-ছি, হিসেব করব?'

হিসেব পচে যায়।

এদিকে সর্বস্ব ত্যাগী, অথচ সারদার জন্যে ভাবনা। এক দিন তাকে জিগগেস করলে রামকৃষ্ণ, 'তোমার ক'টাকা হলে হাতখরচ চলে?'

মুখ নামালো সারদা। বললে, 'পাঁচ-ছ টাকা হলেই চলে।'

তারপর, হঠাৎ আরেক অদ্ভুত জিজ্ঞাসা : 'বিকেলে কখানা রুটি খাও?'

এবার লজ্জায় আর বাঁচে না সারদা। কি করে বলি! এ কি একটা বলবার মত কথা! কিন্তু রামকৃষ্ণ ছাড়ে না। জিগগেস করে বারে-বারে। মাটির সঙ্গে মিশে গিয়ে সারদা বললে, 'এই পাঁচ-ছখানা খাই।'

তারপর আরো একটু অন্তরঙ্গ হয় রামকৃষ্ণ। বলে, 'বুনো পাখি খাঁচায় রাতদিন থাকলে বেতে যায়। মাঝে-মাঝে পাড়ায় বেড়াতে যাবে।'

এক দিন ক'টা পাট এনে দিলে সারদাকে। বললে, 'এগুলি দিয়ে আমাকে শিকে পাকিয়ে দাও। আমি সন্দেশ রাখব লুচি রাখব ছেলেদের জন্যে।'
সারদা শিকে পাকিয়ে দিল। ফেঁসোগুলো দিয়ে থান ফেলে বালিশ করলে। কোনো জিনিস অপচয় হতে দেয় না সারদা! যত সামান্য জিনিস হোক, যত্ন করে রেখে দেয়, কাজে লাগায়। বলে সেই অপূর্ব কথা : 'যাকে রাখো সেই রাখে।' পটপটে মাদুর পেতে ফেঁসোর বালিশে মাথা রেখে সারদা শোয়। দিব্যি ঘুম আসে।
পাড়াগেঁয়ে মেয়ে, সারদার জন্যে বড় ভাবনা রামকৃষ্ণের। কোথায় না জানি শৌচে যাবে, নিন্দে করবে লোকে, তখন ভারি লজ্জা পাবে বেচারী! কিন্তু আশ্চর্য, কখন যে কি করে, কাকপক্ষীও টের পায় না।
'বাইরে যেতে আমিও কখনো দেখলুম না।' বলে ফেলল রামকৃষ্ণ।
কথাটা সারদার কানে যেতেই মুখ শুকিয়ে গেল। ওমা, এখন কী হবে! ঠাকুর যা মনে-মনে চান তাইই মা ওঁকে দেখিয়ে দেন। এখন তো তবে এক দিন তাঁর চোখে ঠিক ধরা পড়ে যাব! এখন উপায়? আকুল হয়ে ভবতারিণীকে ডাকতে লাগল সারদা। 'হে মা, আমার লজ্জা রক্ষা করো।'
এমন মা, বিপন্না মেয়ের দায় মোচন করলে। দুই পাখা দিয়ে ঢেকে রাখল মেয়েকে। কত বছর ধরে আছে সারদা, এক দিনও কারু সামনে পড়ল না।
রাত তিনটের সময় উঠে জপে বসে। জপে বসে আর কোনো হুঁস থাকে না। সেদিন জ্যোৎস্না রাত, নবতে সিঁড়ির পাশে বসে জপ করছে সারদা। চারদিকে রুদ্ধ-শ্বাস স্তব্ধতা। ধ্যান খুব জমে গিয়েছে। ঠাকুর কখন বটতলায় গেছেন টেরও পায়নি। অন্য দিন জুতোর শব্দে টের পায়, আজ তাও নয়। লালপেড়ে শাড়ির আঁচল খসে বাতাসে উড়ে-উড়ে পড়ছে, খেয়াল নেই। তন্ময়তার প্রতিমূর্তি।
যখন ধ্যান ভাঙল তাকালো চাঁদের দিকে। হাত জোড় করলে। বললে, 'তোমার ঐ জ্যোৎস্নার মত আমার অন্তর নির্মল করে দাও।'
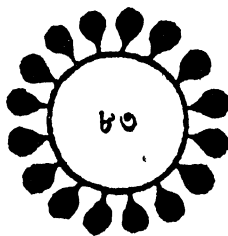
'আজ নরেন এখানে খাবে।' ঠাকুর বললেন এসে নবতে। 'বেশ ভালো করে রাঁধো।' মুগের ডাল আর রুটি করল সারদা। তাই খেল নরেন এক পেট। খাবার পর ঠাকুর জিগগেস করলেন, 'ওরে কেমন খেলি?'

'বেশ খেলুম। যেন রুগীর পথ্য।'

ঠাকুর ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। নবতের উদ্দেশে চেঁচিয়ে বললেন, 'ওকে ওসব কি রেঁধে দিয়েছ? ওর জন্যে ছোলার ডাল আর মোটা-মোটা রুটি করে দেবে।'

তাই আবার করে দিল সারদা। তাই আবার খেল নরেন।

'নরেনের হচ্ছে ব্যাটাছেলের ভাব। নিরাকারের ঘর। পুরুষের সত্তা! ও হচ্ছে পুরুষ-পায়রা। পুরুষ-পায়রার ঠোঁট ধরলে ঠোঁট টেনে ছিনিয়ে নেয়।'

কিন্তু মেয়ে-ভাব প্রকৃতি-ভাব কার? বাবুরামের। ওর হচ্ছে প্রেমের ঘর।

কিন্তু নরেন আর আসে না কেন? কেন দেখা দিয়ে আবার লুকিয়ে থাকে?

নরেন আসেনি কিন্তু সেদিন বাবুরাম এসে উপস্থিত।

যখন পাঁচ বছর বয়েস তখন যদি কেউ বলত, 'তোর এমন বাবুর মত চেহারা, তোকে একটি টুকটুকে সুন্দরী বউ এনে দেব,' অমনি কচি-কচি দুটি হাত নেড়ে অসম্মতি জানাত, 'ও কথা বোলো না—ম'য়ে যাব, ম'য়ে যাব।' সেই বাবুরাম।

বড় বোন কৃষ্ণভাবিনী। শ্যামবাজারের বলরাম বোসের স্ত্রী। ঠাকুরের রসদদার বলরাম বোস।

'যখন আসবে এখানকার জন্যে কিছু নিয়ে এস। শুধু হাতে আসতে নেই।' এ কথা এক দিন বলেছিলেন বলরামকে। আর যায় কোথা! প্রতি মাসে ডালা পাঠায় বলরাম।

কেশবও যখন আসে হাতে করে কিছু নিয়ে আসে। অন্তত একটি ফুল।

শ্যামবাজারে যদু পণ্ডিতের 'বঙ্গ বিদ্যালয়ে' ভর্তি হয়েছে বাবুরাম। থাকে খুড়োর বাড়িতে। পাঠশালায় সহপাঠী কালীপ্রসাদ। স্বামী অভেদানন্দ।

সেইখান থেকে চলে এসেছে মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশনে। মাস্টারমশায়ের ইস্কুলে। ঠিক অঙ্কুরটি উড়ে এসে পড়েছে ঠিক মাঠটিতে।

গঙ্গাপারে সাধুসন্নেসী খুঁজে বেড়ায় বাবুরাম। কতই দেখে কিন্তু মনের মতনটিকে দেখে না। যাকে দেখে আর জিগগেস করতে হয় না, এ কে—সেই জিজ্ঞাসাতীতকে।

ঘূণাক্ষরেও জানে না তেমন একজনকে দেখেছে তার ভগ্নিপতি। দেখেছে তার মা। এমন কি তার দাদা তুলসীরাম।

'কোথায় অমন সাধু খুঁজে বেড়াচ্ছিস?' এক দিন তাকে বললে তুলসীরাম। 'যদি সত্যিকার সাধু দেখতে চাস তবে দক্ষিণেশ্বরে যা! দেখে আয় রামকৃষ্ণ-দেবকে।'

রামকৃষ্ণের কথা শুনেছে বাবুরাম। পড়েছে খবরের কাগজে। জোড়াসাঁকোর এক হরিসভায় এক দিন বুঝি তাঁকে দেখেওছিল দূর থেকে। কিন্তু তাঁর কাছে যাই কেমন করে? কে নিয়ে যায়!

শুধু একবার মনে করো, যাবে, তিনিই ব্যবস্থা করে দেবেন। ছেলে যদি বাপের কাছে যেতে চায়, বাপ টাকা পাঠিয়ে দেয়, লোক পাঠিয়ে দেয়। তোমার কাছে যাব—একবার শুধু একটি খবর পাঠিয়ে দাও তাঁকে। আর দেখতে হবে না।

তিনি পাঠিয়ে দেবেন যান-বাহন লোক-লস্কর টাকা-পয়সা।
রাখালকে চিনত, তাকে বললে খুলে মনের কথা।
'আমি তো যাই প্রায়ই দক্ষিণেশ্বর।'
'আমাকে নিয়ে যাবে?' রাখালের হাত চেপে ধরল বাবুরাম।
কিন্তু যাবে কি করে? পায়ে হেঁটে না নৌকোয়? যাবে তো ফিরবে কি করে? যদি ফিরতে না পাও, খাবে কি? শোবে কোথায়? কোনো প্রশ্ন নিয়েই আর মাথা ঘামায় না বাবুরাম। ঠিকানা জানা হয়ে গেছে। ঠাকুর পাঠিয়ে দিয়েছেন দিশারী।
শনিবার ইস্কুল ছুটি হলে দুই বন্ধু চলে এল হাটখোলার ঘাটে। রামদয়াল চক্রবর্তীও এসেছে দেখছি। হোরমিলার কোম্পানিতে চাকরি করে রামদয়াল, থাকে বলরামের বাড়িতে। সেও দক্ষিণেশ্বরের যাত্রী।
পেঁছুতে সেই সন্ধে। ঠাকুর ঘরে নেই।
রাখাল কখন চলে গেছে মন্দিরের দিকে। বাবুরামকে বসে থাকতে বলে গেছে, তাই বসে আছে বাবুরাম। বসে আছে প্রার্থনার মত। প্রসাদের জন্যে যে প্রতীক্ষা তাই প্রার্থনা।
কতক্ষণ পরে রাখালের কাঁধে হাত রেখে ভাবাবিষ্ট ঠাকুর ঘরে ঢুকছেন। টলছেন মাতালের মত। হতবাকের মত তাকিয়ে রইল বাবুরাম। চোখের সামনে এ কে নয়নভুলানো!
ছোট খাটটিতে বসলেন ঠাকুর। রামদয়াল পরিচয় করিয়ে দিল।
'বলরামের আত্মীয়? তা হলে তো আমাদেরও আত্মীয়।' হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে ডাকলেন বাবুরামকে। 'এসো তো, আলোয় এসো তো একটিবার, তোমার মুখখানি দেখি।'
ঘরের কোণে মিটমিটে একটি দীপ জ্বলছে। সেইখানে বাবুরামকে টেনে আনলেন ঠাকুর। বাবুরামের ভক্তিনম্র কিশোর মুখখানি দেখলেন একদৃষ্টে। বললেন, 'বাঃ, বেশ ছেলেটি তো!' পরে তার হাতখানি টেনে নিলেন তাঁর হাতের মধ্যে। ওজন নিলেন। বললেন, 'বেশ।'
বাবুরামকে দেখলাম—দেবীমূর্তি। গলায় হার। সখী সঙ্গে। ওর দেহ শুদ্ধ—ওর হাড় পর্যন্ত শুদ্ধ। একটা কিছু করলেই ওর হয়ে যাবে।
পরে এক দিন বলেছিলেন ঠাকুর, 'দেহরক্ষার বড় অসুবিধে হচ্ছে। বাবুরাম এসে থাকলে ভালো হয়। নেটো তো চড়েই রয়েছে। ক্রমে লীন হবার যো। আর রাখাল? রাখালের এমন স্বভাব হয়ে দাঁড়াচ্ছে, আমাকেই তাকে জল দিতে হয়। আমার সেবা বড় সে আর করতে পারে না। তবে টানাটানি করে আসতে বলি না, বাড়িতে হাঙ্গামা হতে পারে। আমি যখন বলি চলে আয় না, তখন বেশ বলে, আপনি করে নিন না। রাখালকে দেখে কাঁদে, বলে, বেশ আছে।'
তাই এক দিন যখন মাকে নিয়ে বাবুরাম গিয়েছে দক্ষিণেশ্বর, ঠাকুর বললেন মাতঙ্গিনী দেবীকে, 'তোমার এই ছেলেটি আমাকে দেবে?'

মাতঙ্গিনী দেবী নিজেকে কৃতার্থ মনে করলেন। বললেন, 'এ তো আমার পরম সৌভাগ্য।'

বাবুরামের দেহ-লক্ষণ পরীক্ষা করে ঠাকুর আবার বসলেন ছোট খাটে। হঠাৎ রামদয়ালকে লক্ষ্য করে বললেন স্নেহাকুল কণ্ঠে, 'ওগো নরেনের খবর জানো? সে কেমন আছে?'

'ভালো আছে।' বললে রামদয়াল।

'এখানে অনেক দিন আসে না। তাকে দেখতে বড় ইচ্ছে করছে। কেন আসে না— এক দিন আসতে বোলো।'

কানু ছাড়া গীত নেই, ঈশ্বর ছাড়া কথা নেই। কথায়-কথায় রাত দশটা বেজে গেল।

অমৃতময়ী কথা।

নারদকে রাম বললেন, তুমি আমার কাছে কিছু বর নাও। নারদ বললেন, রাম, আমার আর কি বাকি আছে? কি বর নেব? তবে যদি একান্তই দেবে, এই বর দাও যেন তোমার পাদপদ্মে শুদ্ধাভক্তি থাকে, আর যেন তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ না হই। রাম বললেন, নারদ, আর কিছু বর নাও। নারদ আবার বললেন, রাম, আর কিছু চাই না, যেন তোমার পাদপদ্মে শুদ্ধা-ভক্তি থাকে এই করো।

যেখানে ভক্তি সেখানেই ভগবান।

লক্ষ্মণ রামকে জিগগেস করলেন, রাম, তুমি কত ভাবে কত রূপে থাকো, কিরূপে তোমায় চিনতে পারব? রাম বললেন, ভাই, একটা কথা জেনে রাখো। যেখানে ঊর্জিতা ভক্তি, সেখানে নিশ্চয়ই আমি আছি। ঊর্জিতা ভক্তিতে হাসে কাঁদে নাচে গায়। যদি কারু এরূপ ভক্তি হয় নিশ্চয় জেনো সেখানে ভগবানের আবির্ভাব।

ঠাকুরের তো সেই অবস্থা। প্রেমে হাসে কাঁদে নাচে গায়। তবে কি এইখানেই ঈশ্বরসাক্ষাৎ? বাবুরামকে ঠাকুর যখন আত্মীয় বললেন তখন তার মানে কি বাবুরাম ঠাকুরের ভক্ত? অন্তরঙ্গদের একজন?

রাত দশটা বেজে গেছে। ঠাকুর বললেন, এবার খেয়ে নাও সকলে।

রামদয়াল আর বাবুরাম বারান্দায় শুলো। রাখাল ঠাকুরের সঙ্গে এক ঘরে। শয়ন যেন সাষ্টাঙ্গ প্রণাম এই শুধু মনে হতে লাগল বাবুরামের। যেন বা মাতৃ-অঙ্কে মাথা রেখে শিশুর মতো ঘুমিয়ে আছে। জলে স্থলে অন্তরীক্ষে নিগূঢ় শান্তি। যেন কোন গভীরের দেশে এসে সহজ বিশ্রাম পেয়েছে আজ।

'ওগো ঘুমুলে?'

অতন্দ্র মধ্যরাত্রিই হঠাৎ করুণ স্বরে কেঁদে উঠল নাকি?

বাবুরাম চোখ চাইল, দেখল ঠাকুর। বালকের মত পরনের কাপড়খানি বগলের নিচে ধরা। রামদয়ালের শিয়রের কাছে দাঁড়িয়ে ডাকছেন।

দুজনে ঘুম ফেলে উঠে বসল। বললে, 'আজ্ঞে না, ঘুমুইনি।'

'ওগো আমার ঘুম আসছে না। নরেনের জন্যে আমার প্রাণের ভেতরটা মোচড়

দিচ্ছে! যেন জোরে কে গামছা নিংড়োচ্ছে বুকের মধ্যে। তাকে একবার নিয়ে আসতে পারো?'
'আজ্ঞে, ভোর হোক। ভোর হলেই তাকে আমি সংবাদ দেবো।' বললে রামদয়াল।
'তাই কোরো। শুধু একবারটি একটু চোখের দেখা। তাকে মাঝে-মাঝে না দেখলে থাকতে পারি না।'
এই বুঝি ভগবানের কান্না। বাবুরাম দেখতে লাগল, শুনতে লাগল। ভক্তই শুধু ভগবানের জন্যে কাঁদে না, ভগবানও বিনিদ্র রাত্রি জেগে ভক্তের জন্যে অশ্রুবর্ষণ করে। ভক্ত না থাকলে ভগবানও অনর্থক। যিনি কবি তাঁর একটি রসিক পাঠক চাই। এই রসিকটি না থাকলে সমস্ত রসসমুদ্রই শুষ্ক। সমস্ত কবিতাই মাটি। শুধু ভগবান নন ভক্তও কঠোর হতে জানে। আর সেই ভক্তকে দ্রবীভূত করবার জন্যে ভগবানের এই বিগলিত কান্না।
বাবুরাম ভাবতে লাগল, কী নিষ্ঠুর না-জানি এই নরেন্দ্রনাথ!
শুধু কি এক দিন না এক রাত্রি? ভালোবাসার কি দিন-রাত্রি আছে? কান্নার কি ক্ষান্তি আছে কোনো কালে? এক দিন শেষে মা'র মন্দিরে গিয়ে ধন্না দিলেন। মা গো, তাকে এনে দে। তাকে না দেখে যে থাকতে পাচ্ছি না।
ঠাকুরের কান্নার রোল ঘরের মধ্যে বসে শুনতে পাচ্ছে ভক্তেরা। পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করছে। একটা পরের ছেলের জন্যে এমন করে কাঁদতে পারে কেউ?
মা গো, এক কালে তোর জন্যে কেঁদেছিলাম, এখন নরেনের জন্যে কাঁদছি। তুই দেখা দিলি আর নরেন দেখা দেবে না? আমার এই কান্নার ডাকটি তার কানে পেঁৗছে দে মা। তুই পাষাণ হয়ে শুনতে পেলি আর ও রক্তমাংসের মানুষ হয়ে শুনতে পাবে না?
আবার ভক্তদের মধ্যে এসে বসেন ঠাকুর। বলেন, 'এত কাঁদলাম কিন্তু নরেন্দ্র তো এলো না! সে এত বোঝে আর আমার প্রাণের টানটাই বোঝে না!'
আবার ঘরের বাইরে গিয়ে কান পাতেন! ঐ বুঝি শোনা যাচ্ছে তার পায়ের শব্দ। তার দরাজ গলার কলস্বর।
কোথাও কিছু নেই। তখন নিজেকেই নিজে উপহাস করেন ঠাকুর। 'বুড়ো মিনসে, পরের একটা ছেলের জন্যে এমনি কাঁদছি, লোকে দেখলে কী বলবে বলো দেখি? তোমরা আপনার লোক, তোমাদের কাছে না-হয় লজ্জা নেই, কিন্তু অন্যে কী বলবে? অন্যে কী বলবে ভেবেও তো সামলাতে পাচ্ছি না।'
সেবার ঠাকুরের জন্মোৎসব করছে ভক্তরা। নতুন সাজে সাজিয়েছে ঠাকুরকে। চন্দনচর্চিত পুষ্পমালা দুলিয়ে দিয়েছে গলায়। আনন্দের হাটবাজার বসে গিয়েছে চারদিকে। রাম দত্ত প্রসাদ বিলোচ্ছে। গোষ্ঠমিলন গান শুরু হবে এবার।
কিন্তু ঠাকুর মাঝে-মাঝে একটা বিষণ্ণতার রেখা টানছেন। 'তাই তো, নরেন্দ্র এখনো এলো না।'
নরোত্তম কীর্তন গাইছে। যার কীর্তন তিনি মাঝে-মাঝে আখর দিচ্ছেন। মাঝে-মাঝে আবার তা কান্নার আখর। 'কই, নরেন্দ্র কই?'

নরেন্দ্র ছাড়া সমস্ত ব্যঞ্জন আলুনি। সমস্ত ব্যঞ্জনা বিস্বাদ।

উন্মনা ভাবে কখন একটু তন্ময় হয়ে ছিলেন ঠাকুর, নরেন হঠাৎ এসে তাঁকে প্রণাম করলে। ঠাকুর লাফিয়ে উঠলেন। তাঁর আনন্দ তখন আর দেখে কে! একেবারে নরেনের কাঁধে চেপে বসলেন, বসেই গভীর ভাবাবেশ।

আর নরেন? প্রেমময়ের স্পর্শে বেদান্তবাদীর কাঠিন্য গলে যেতে লাগল। দুটি পরিপূর্ণ চোখ আচ্ছন্ন হয়ে এল অশ্রুতে।

চারদিকে আনন্দের ঢেউ বইতে লাগল। বইতে লাগল সেবার স্রোতস্বিনী।

ঠাকুর খাচ্ছেন, প্রসাদ-লোভে ভক্তরা তাঁকে বেষ্টন করে আছে। হঠাৎ দু'চার গ্রাস খেয়েই ঠাকুর বলে উঠলেন, 'নরেনের গান শুনব। গান শুনতে-শুনতে খাব। তাঁর গুণগান শোনাবার জন্যে মহামায়া নরেনকে অখণ্ডের ঘর থেকে নিয়ে এসেছেন। ওর গান শুনলে আমার ভিতরে কী হয় জানিস? আমার ভিতরে যিনি, তিনি ফোঁস করে ওঠেন।'

নরেন গান ধরল :

'নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে অরূপরাশি
তাই যোগী ধ্যান ধরে হয়ে গিরিগুহাবাসী॥
অভয় চরণ তলে প্রেমের বিজলী খেলে
চিন্ময় মুখমণ্ডলে শোভে অট্ট অট্ট হাসি॥'

গান শুনেই ঠাকুর সমাধিস্থ। অন্নরস ছেড়ে চলে গেছেন অন্য রসে। আনন্দরসে।

কিন্তু ঠাকুরের পরিহাসরসও অফুরন্ত।

বেলা দুটোর সময় ভক্তরা বসেছে পঙক্তিভোজনে। চিঁড়ে দই আর চিনি পরিবেশন হচ্ছে। 'রামের কি ছোট নজর!' বললেন ঠাকুর, 'আমার জন্মোৎসবে কিনা চিঁড়ের ব্যবস্থা করল! এই শীতের দিনে চিঁড়ে-দই! তার বদলে—' ঠাকুর গান ধরলেন : 'মোণ্ডা খাজা খুরমা গজা মোদক-বিপণি-শোভনম্।'

ভক্তবৃন্দ উল্লাসের হিল্লোল তুলল।

গান জমাবার জন্যে 'আরে আরে' বলে ঠাকুর আখর দিচ্ছেন, এমন সময় এক ভক্ত 'হরি হরি' বলে উঠল। সব রস মাটি। ঠাকুর হেসে উঠলেন। 'শালা এমন বেরসিক, রসগোল্লা-রসোগোল্লা না বলে হরি-হরি বললে।'

এমন সময় ফের দই নিয়ে এল। দই দেখে ঠাকুর হাত তুলে গাইতে লাগলেন :

'দে দই দে দই পাতে, ওরে ব্যাটা হাঁড়ি-হাতে।
ওরা কি তোর বাবা খুড়ি, ওদের পাতে হাঁড়ি-হাঁড়ি—'

একটা হুল্লোড় পড়ে গেল।

আর তারই মধ্যে সেই অরসিক ভক্ত 'রসগোল্লা' বলে 'জয়' দিলে।
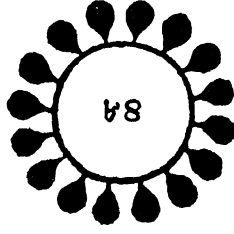
যদু মল্লিকের বাগানে গিয়ে আবার কাঁদে রামকৃষ্ণ।

ভোলানাথ, মোটা বামুন, হাত জোড় করে বলে, 'মশায়, ওর সামান্য পড়াশুনো, ওর জন্যে আপনি কেন এত অধীর হন?'

সামান্য পড়াশুনো? নরেনের জুড়ি আর একটাও ছেলে আছে? ঝলসে ওঠে রামকৃষ্ণ। 'যেমন গাইতে-বাজাতে, তেমনি বলতে-কইতে, তেমনি আবার লেখা-পড়ায়। রাত-ভোর ধ্যান করে, ধ্যান করতে-করতে সকাল হয়ে যায়, হুঁস থাকে না। সে কি যে-সে? তার ভেতর এতটুকু মেকি নেই—বাজিয়ে দেখ গিয়ে, টং-টং করছে। আর সব ছেলেদের দেখি—দেড়টা-দুটো পাশ করেছে হয়তো, ব্যস, ঐ পর্যন্তই। চোখ-কান টিপে কোনো রকমে পাশ করতেই যেন সব শক্তি বেরিয়ে গেছে। আমার নরেনের সে রকম নয়, সে হেসে-খেলে পাশ করে যায়। ব্রাহ্ম-সমাজে ভজন গায় সে—আর-আরদের মতন নয়, সে সত্যিকারের ব্রহ্মজ্ঞানী। বুঝলে, ধ্যান করতে বসে সে জ্যোতি দেখে। সাধে কি আর নরেনকে এত ভালোবাসি?' কিন্তু যাকে এত ভালোবাসেন সে তাঁকে মানতে রাজী নয়। সে তাঁকে কাঁদায়। এক দিন সরাসরি বললে মুখের উপর, 'তুমি ঈশ্বরের রূপ-টুপ যা দেখ তা তোমার মনের ভুল।' আহতের মত অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন রামকৃষ্ণ। বললেন, 'বলিস কি রে! কথা কয় যে!'

'কথা কয় না কচু!' কথাটা হেসে উড়িয়ে দিল নরেন্দ্র। 'সব আপনার মাথার খেয়াল!' বলে কি ছোঁড়া! মাথার খেয়াল?

'বলিস কি রে! মা স্পষ্ট চোখের সামনে দাঁড়ান, হাঁটেন-চলেন, কথা কন—'

'বাজে কথা! মাটির প্রতিমা নড়বে-চড়বে কি! কথা কইবে কি!'

'বাঃ, নিজের চোখ-কানকে অবিশ্বাস করব?'

'মাথার গরমে ছায়া দেখেন আপনি, হয় তো বা অপচ্ছায়া!' নরেন নিষ্ঠুরের মত বললে, 'হাওয়ায় হয়তো বা কি শব্দ হয়, ভাবেন ছায়া বুঝি কথা কইছে।'

'তুই বললেই হল?' নরেনকে উড়িয়ে দিতে চাইলেন রামকৃষ্ণ।

'আপনি বললেই বা হবে কেন?' প্রত্যাখ্যানে দৃঢ় নরেন্দ্রনাথ: 'পশ্চিমের বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে, অনেক জায়গায় চোখ-কান এমনি করে প্রতারণা করে। আপনিও যে প্রতারিত হচ্ছেন না তার প্রমাণ কি? কে বলবে সমস্তই আপনার চোখ-কানের ভুল নয়?'

'সমস্তই আমার চোখ-কানের ভুল?' অসহায়ের মত তাকিয়ে রইলেন রামকৃষ্ণ।
'নিশ্চয়। নইলে যা সত্যি অদৃশ্য তাকে দেখা যাবে কি করে? যা অচল সে কি করে নড়ে-চড়ে?'
এর মধ্যে আবার হাজরা আছে টিপ্পনি ঝাড়তে।
বলছে, 'ঈশ্বর অনন্ত, তাঁর ঐশ্বর্য অনন্ত—সব বুঝি। তাই বলে তিনি কি আর সন্দেশ-কলা খাবেন? না, গান শুনবেন? ও সব ধোঁকা, ধাপ্পাবাজি।'
'তা ছাড়া আবার কি।' তার কথায় দাগা বুলোলো নরেন।
বড় মন-মরা হয়ে গেলেন রামকৃষ্ণ। নরেন তো মিথ্যে বলবার ছেলে নয়! তবে এত দিন তিনি যা সব দেখে এসেছেন, বিশ্বাস করে এসেছেন, সব ভুয়ো! সব কাল্পনিক? ভবতারিণীর কাছে গিয়ে কেঁদে পড়লেন রামকৃষ্ণ।
'মা, এ কী হল? এ সব কি মিছে? নরেন্দ্র এমন কথা বললে! তুই শুধু পাথরের মূর্তি? তুই অচল, অনড়? তুই বোবা, বধির?'
মা কথা কয়ে উঠলেন। বললেন, 'ওর কথা শুনিস কেন? কিছু দিন পরে ও-ই নিজে দেখতে পাবে ঈশ্বরীয় রূপ, সব কথা সত্য বলে মানবে। কিছু ভাবিসনে। যদি মিথ্যে হবে, সব কথা তবে অবিকল মিলল কি করে?'
শুধু তাই নয়, দেখিয়ে দিলেন ভবতারিণী। দেখিয়ে দিলেন, সর্বত্র চৈতন্য, অখণ্ড চৈতন্য—চৈতন্যময় রূপ।
তেড়ে ছুটে গেলেন রামকৃষ্ণ। পাকড়াও করলেন নরেনকে। বললেন, 'শালা, তুই আমায় অবিশ্বাস করে দিয়েছিলি! চলে যা, তুই আর এখানে আসিস নে।'
যার জন্যে এত কান্না, তাকেই কিনা বাড়ির বার করে দেওয়া।
মুখের কথায় নরেন নড়ে না, কেননা সে জানে অন্তরের কথাটি। তাই সে আস্তে-আস্তে বারান্দায় সরে গিয়ে বসে তামাক সাজতে। নীরবে হুঁকোটা বাড়িয়ে দেয় হাজরার দিকে। হাজরাও চুপ।
সেই যে সেদিন চলে গেল নরেন, রামকৃষ্ণের ভয় হল, আর বুঝি সে আসবে না রাগ করে। কিন্তু, না, আবার এসেছে আরেক দিন। সেদিন আনন্দ কত রামকৃষ্ণের! মনে-মনে বলছেন, ও যে আমার আপনার লোক, তাই ওকে বকলেও ও আসবে। যে আপনার লোক তাকে বকলেও সে রাগে না।
তাই তো ঈশ্বর মুখের কথার ধার ধারেন না। অন্তরের বচনহীন ভাষাটি শোনবার জন্যে নিরন্তর কান পেতে থাকেন।
'নরেন্দ্রর কথা আর লই না।'
সেদিন আবার আরেক তর্ক।
রামকৃষ্ণ বললেন, চাতক আকাশের জল ছাড়া আর কিছু খায় না।
নরেন তা মানতে রাজী নয়। বললে, 'বাজে কথা। এমনি জলও চাতক খায়।'
মহা ভাবনা ধরল রামকৃষ্ণের। আবার ছুটলেন ভবতারিণীর মন্দিরে। মা, এ সব কি মিথ্যে হয়ে গেল? যা এত দিন সব দেখেছি-জেনেছি সব গাঁজাখুরি?
সেদিন কি মনে করে নরেন্দ্র এসে হাজির।

ঘরের ভিতরে কতগুলো কী পাখি উড়ছে ফরফর করে। নরেন্দ্র বলে উঠল, 'ঐ, ঐ—'
কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করলেন রামকৃষ্ণ, 'কি?'
'ঐ চাতক। ঐ চাতক!' উল্লাস করে উঠল নরেন।
কতগুলো চামচিকে।
হেসে উঠলেন রামকৃষ্ণ। বললেন, 'সেই থেকে নরেন্দ্রের কথা আর লই না।'
কিন্তু সব সময়ে ভয়, নরেন্দ্র এই বুঝি আর কারু হয়ে গেল। আমার বুঝি হল না! তাই তার সঙ্গে কথা কইতেও ভয়, না কইতেও ভয়।
স্নেহকরুণ চোখে তার দিকে তাকিয়ে থাকেন রামকৃষ্ণ। ভাববিহ্বল হয়ে গান ধরেন :

'কথা বলতে ডরাই না-বললেও ডরাই।
মনে সন্দ হয় পাছে তোমাধনে হারাই-হারাই॥'

গান শুনে অশ্রু-ভরোভরো চোখে তাকিয়ে থাকে নরেন। ভাবে ভালোবাসায় পাহাড় বুঝি দ্রবময়ী নির্ঝরিণী হয়ে যাবে।
কিন্তু ঐ বুঝি আবার হারিয়ে গেল। কত দিন আবার দেখা নেই নরেনের।
কাঁহাতক আর বসে থাকবেন পথ চেয়ে! সেদিন নিজেই রওনা হলেন কলকাতার দিকে। কিন্তু, হঠাৎ খেয়াল হল, আজ তো রবিবার, যদি তার বাড়িতে গিয়ে দেখা না পাই! যদি কোথাও কারু সঙ্গে আড্ডা দিতে বেরিয়ে গিয়ে থাকে! কোথায় আর যাবে! আজ যখন রবিবার, নিশ্চয়ই ব্রাহ্মসমাজে ভজন গাইবার ডাক পড়েছে সন্ধের সময়। সেখানে গেলেই নির্ঘাৎ তাকে দেখতে পাব। আমার তো আর কিছুই বাসনা নেই, শুধু তাকে একটু দেখব কাছে থেকে।
যেমন ভাবনা তেমন কাজ। সরাসরি সমাজে গিয়ে উপস্থিত হলেন রামকৃষ্ণ।
মুহূর্তে একটা প্রলয়-কান্ড ঘটে গেল। বেদিতে বসে আচার্য ভাষণ দিচ্ছেন, জনতার সেদিকে লক্ষ্য নেই। সেই 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' সহসা যেন মূর্তি ধরে আবির্ভূত হয়েছেন সভাস্থলে, এমনি মনে হল জনতার। তাঁকে একবারটি একটু চোখের দেখা দেখবার জন্যে চারদিকে রব পড়ে গেল। শুরু হয়ে গেল বাঁধভাঙা বিশৃঙ্খলা। বেঞ্চির উপর উঠে দাঁড়াল এক দল, অন্য দল ঘিরে ধরতে চাইল রামকৃষ্ণকে।
স্তম্ভিতের মত বসে রইল আচার্য। মাথায় একবার এল না ঠাকুরকে যোগ্য সমাদরে সংবর্ধনা করে নিই। বসাই এনে বেদির উপরে।
আচার্যের কথা ছেড়ে দি, সমাজের কর্তৃপক্ষের কেউই একটা সাধারণ শিষ্টাচার পর্যন্ত দেখালো না। মনে-মনে রামকৃষ্ণের উপর তারা চটা ছিল। তাদের সমাজের দু-দুটো মাথা—কেশব আর বিজয়কে রামকৃষ্ণ বশ করেছে! টেনে নিয়েছে নিজের মতে।

কিন্তু তাই বলে তিনি এমনি ভাবে অপমানিত হবেন? বেদির উপর বসে ছিল নরেন্দ্রনাথ, নিচে লাফিয়ে পড়ল। এগিয়ে গেল ঠাকুরের দিকে।
তাকে দেখতে পেয়ে ভাবে মাতোয়ারা হলেন রামকৃষ্ণ। তার দিকে ধাবমান হতে-না-হতেই সমাধিস্থ হয়ে পড়লেন।
তখন আবার সমাধি-অবস্থায় রামকৃষ্ণকে দেখবার জন্যে জনতা আলোড়িত হয়ে উঠল। এমন সময় কারা ঘরের গ্যাস দিল নিবিয়ে। ঘনান্ধকারে ভরে গেল চার দিক। তুমুল গোলমাল। দিগ্‌ভ্রান্ত দ্বারভ্রান্ত জনতা। এদিক-ওদিক ছুটতে লাগল বিপর্যস্তের মত।
এখন রামকৃষ্ণকে কি করে রক্ষা করবে নরেন্দ্র! কি করে অন্ধকার থেকে নিয়ে আসবে বাইরে। নরেন একাই একশো। একাই আবৃত করে রাখবে। বলিষ্ঠবাহু পুত্র যেমন পিতাকে বেষ্টন করে রাখে। কারু সাধ্য নেই রামকৃষ্ণের ছায়া মাড়ায়।
রামকৃষ্ণের সমাধি ভাঙল। চার পাশে তাকালেন অন্ধকারে। কই, তুই আছিস? আয়, আমাকে ধর। তোকে দেখতে চলে এসেছি কতদূর!
হাত ধরে রামকৃষ্ণকে বাইরে নিয়ে এল নরেন। পিছনের দরজা দিয়ে। অন্ধকার ঠেলে-ঠেলে। একটা গাড়ি ডাকালো। চলো দক্ষিণেশ্বরে।
পথে ঠাকুরকে বকতে লাগলো নরেন। 'কেন আপনি এসেছিলেন এখানে?'
তুই জানিস না কেন এসেছিলাম? সুখস্মিতমুখে তাকিয়ে রইলেন ঠাকুর।
'সেজন্যে এখানে আপনি আসবেন, এই ব্রাহ্মসমাজে? এখানে ওরা আপনাকে সম্মান দেখাল, না, অভ্যর্থনা করল? ঘর অন্ধকার করে পালিয়ে গেল সকলে। আমার জন্যে আপনি কেন এ অপমান নিতে এলেন? আপনার অপমানে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে—'
অপমান! ঠাকুরের মুখপদ্মের প্রসন্নাভা এতটুকু ম্লান হল না।
'অপমান ছাড়া আবার কি। ওরা আপনাকে বোঝে না, বোঝবার ওদের সাধ্যও নেই—ওদের এখানে আসবার আপনার কী দরকার! আমাকে ভালোবাসেন বলে আপনার সমস্ত কাণ্ডজ্ঞান খোয়াতে হবে?'
যা খুশি তাই বল। তোর কথায় কে কান দেয়! তোর কথা আর লই না। তোর দেখা পেয়েছি, তুই আমাকে গাড়ি করে দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছে দিতে যাচ্ছিস এই ঢের। নইলে কে কোথায় কী অনাদর বা উপেক্ষা করল তাতে আমার বয়ে গেল।
'ভালোবাসেন বাসুন, কিন্তু নিজের দিকে খেয়াল রাখেন না কেন?'
ওরে ভালোবাসায় কি নিজের দিকে খেয়াল থাকে? ভালোবাসা যে আত্মনাশী।
'কিন্তু এই ভালোবাসার পরিণতি কি? শেষে ভরত রাজার মতন আপনার না দশা হয়! ভরত রাজা হরিণ ভাবতে-ভাবতে হরিণ হয়ে জন্মেছিল, আপনারো না শেষ পর্যন্ত—'
ঠাকুরের মুখে হঠাৎ চিন্তার ঘোর লাগল। বললেন, 'তুই একেকটা এমন কথা বলিস যে বিষম ভাবনা ধরে যায়।'
'আমি ঠিকই বলি।'

'তাই তো রে, তাহলে কী হবে! আমি যে তোকে না দেখে থাকতে পারি না। আমায় তবে উপায় বলে দে।'

তবু ভালোবাসায় মাত্রা টানতে পারবেন না ঠাকুর। মন্দা পড়তে দেবেন না জোয়ারে। শেষকালে দক্ষিণেশ্বরে পোঁছে মা'র দুয়ারে এসে হাজির হলেন। নরেনকে কেন এত ভালোবাসি? কেন ওকে দেখবার জন্যে চোখ দুটো ক্ষয় হয়ে যায়? ও আমার কে? হাসতে-হাসতে ফিরে এলেন মন্দির থেকে। বললেন, 'যা শালা, তোর কথা আর লই না। মা সব বলে দিলেন, বুঝিয়ে দিলেন—'

'কী বলে দিলেন?'

'বলে দিলেন তুই ওকে সাক্ষাৎ নারায়ণ বলে জানিস, তাই অত ভালোবাসিস। যেদিন ওর মধ্যে নারায়ণকে দেখতে পাবিনে সেদিন ওর মুখদর্শন তোর অসহ্য হবে।' প্রসন্ন আস্য প্রেমে তরল হয়ে এল। 'আমার ভরত রাজার মত দশা হবে বলতে চাস? নারায়ণ ভেবে নারায়ণকে ভালোবেসে যে পাড়ি জমাতে পারে তার আর পারাবারের ভয় কি।' সেই ভালোবাসার কাছে নরেন দাঁড়িয়ে রইল অসহায়ের মত। আত্মবিস্মৃতের মত।

'ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জন্মেছিলেন কিনা জানি না, বুদ্ধ চৈতন্য প্রভৃতি একঘেয়ে,' শিবানন্দকে বিবেকানন্দ চিঠি লিখছেন আমেরিকা থেকে : 'রামকৃষ্ণ পরমহংস দি লেটেস্ট এ্যাণ্ড দি মোস্ট পারফেক্ট—জ্ঞান প্রেম বৈরাগ্য লোকহিতচিকীর্ষা উদারতায় জমাট—কারু সঙ্গে কি তাঁর তুলনা হয়? তাঁকে যে বুঝতে পারে না তার জন্ম বৃথা। আমি তাঁর জন্ম-জন্মান্তরের দাস, এই আমার পরম ভাগ্য, তাঁর একটা কথা বেদবেদান্ত অপেক্ষা অনেক বড়। তস্য দাস-দাস-দাসোহহং। তবে এক-ঘেয়ে গোঁড়ামি দ্বারা তাঁর ভাবের ব্যাঘাত হয়—এই জন্য চটি। বরং তাঁর নাম ডুবে যাক—তাঁর উপদেশ ফলবান হোক। তিনি কি নামের দাস?...'
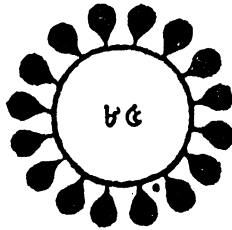
জুড়িগাড়ি করে কারা আসছে দক্ষিণেশ্বরে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল রাখাল। সহজেই চিনতে পারল। কলকাতার এক নামজাদা বড়লোক।

রামকৃষ্ণেরও চোখ পড়েছে। যেমনি দেখা অমনি জড়সড় হয়ে পালিয়ে গেলেন ঘরের মধ্যে। অচেনা আগন্তুক দেখে শিশু যেমন ভয়ে পালায়।

এ কি হল? রাখালও পিছু-পিছু ঘরে ঢুকল।
'যা, যা, শিগগির যা। ওরা এখানে আসতে চাইলে বলিস এখন দেখা হবে না।'
এমনতরো তো কোনো দিন হয় না। অর্থী তো কোনো দিন ফিরে যায় না ব্যর্থ হয়ে।
অবাক মানল রাখাল। বাইরে এসে জিগগেস করলে অভ্যাগতদের: 'কি চাই?'
'এখানে একজন সাধু আছেন না? তাঁকে চাই।'
'কি দরকার?'
'আমার আত্মীয়ের থাক-যাক অসুখ। কিছুতেই সুরাহা হচ্ছে না। উনি দয়া করে যদি কোনো ওষুধ-টোষুধ দেন—'
এতক্ষণে বুঝল রাখাল। কিন্তু অন্তরের ভাবটি কি করে বোঝেন ঠিক অন্তর্যামী তা কে বলবে!
'উনি ওষুধ দেন না। আপনারা ভুল শুনেছেন—'
এক দিন আরেক জন বড়লোক এসেছিল। আমায় বলে, মশায়, এই মোকদ্দমাটি কিসে জিত হয় আপনার করে দিতে হবে। আপনার নাম শুনে এসেছি। আমি বললুম, বাপু, সে আমি নই—তোমার ভুল হয়েছে।
বলছেন রামকৃষ্ণ : 'যার ঠিক-ঠিক ঈশ্বরে ভক্তি হয়েছে, সে শরীর, টাকা—এ সব গ্রাহ্য করে না। সে ভাবে, দেহসুখের জন্যে কি লোকমান্যের জন্যে কি টাকার জন্যে আবার জপ-তপ কি! জপ-তপ ঈশ্বরের জন্যে।'
বলে, দুদিক রাখব! দু'আনা মদ খেলে মানুষ দু'দিক রাখতে চায়। কিন্তু খুব মদ খেলে রাখা যায় দু'দিক?
তেমনি ঈশ্বরের আনন্দ পেলে আর কিছুই ভালো লাগে না। কামকাঞ্চনের কথা যেন বুকে বাজে। শাল পেলে আর বনাত ভালো লাগে না। রামকৃষ্ণ কীর্তনের সুরে গান গেয়ে উঠলেন। 'আন লোকের আন কথা ভালো তো লাগে না—' তখন ঈশ্বরের জন্যই মাতোয়ারা। আর সব আলুনি, পানসে।
ত্রৈলোক্য বললে, 'সংসারে থাকতে গেলে টাকাও তো চাই, সঞ্চয়ও চাই। পাঁচটা দানধ্যান—'
'আগে টাকা সঞ্চয় করে নিয়ে তবে ঈশ্বর?' রামকৃষ্ণ ঝলসে উঠলেন : 'আর, দান-ধ্যানই বা কত! নিজের মেয়ের বিয়েতে হাজার-হাজার টাকা খরচ, আর পাশের বাড়িতে খেতে পাচ্ছে না। তাদের দুটি চাল দিতে কষ্ট হয়। দিতে-থুতে হিসেব কত! ও শালারা মরুক আর বাঁচুক—আমি আর আমার বাড়ির সকলে ভালো থাকলেই হল। মুখে বলে সর্বজীবে দয়া!'
জীবে দয়া! জীবে দয়া! দূর শালা! কীটানুকীট—তুই জীবকে দয়া করবি? দয়া করবার তুই কে? তোর স্পর্ধা কিসের? তুই কিসে এত আত্মম্ভরী?
সেদিন ঠাকুর তাই ধমকে উঠেছিলেন নরেন্দ্রকে। বল, জীবে দয়া নয়, জীবে শ্রদ্ধা, জীবে প্রেম, জীবে সেবা। শিবজ্ঞানে জীবের বন্দনা।
দয়ার মধ্যে একটা উঁচু-নিচুর ভাব আছে। আমি দয়ালু, আমি উপরে দাঁড়িয়ে;

তুমি দয়ার ভিখারী, তুমি নিম্নাসীন। এ অসাম্য সহ্য হল না রামকৃষ্ণের। তিনি সর্বত্র নরায়িত নারায়ণ দেখলেন। দেখলেন আশ্চর্য সৌষাম্য। সব এক, সব সমান, সব বিভক্ত হয়েও অবিচ্ছিন্ন। প্রত্যেককে দাঁড় করিয়ে দিলেন একটি শ্যামল সমভূমিতে—যার পোশাকী নামটি ভূমা, আর চলতি নামটি ভালোবাসা।

এই রামকৃষ্ণের সাম্যবাদ। সকলে আমরা অমৃতস্য পুত্রাঃ, আনন্দময়ীর ছেলে, রামপ্রসাদের ভাষায়, ব্রহ্মময়ীর বেটা। এক বাপের সমাংশভাক বংশধর। অধিকারের স্তরভেদ নেই, আমাদের মধ্যে শুধু প্রেমের সমানস্রোত।

বনের বেদান্তকে ঘরে নিয়ে এলেন রামকৃষ্ণ। একেই বললেন, 'অদ্বৈতজ্ঞান আঁচলে বেঁধে কাজ করা।' একেই বললেন, নিরাকার থেকে আবার সাকারে চলে আসা। এবার সত্যিকারের সাকার। মানুষের মধ্যে ঈশ্বরকে স্বীকার করা, আবিষ্কার করা, অভ্যর্থনা করা।

নরেনের তৃতীয় নয়ন আবার উদ্দীপ্ত হল। দেখল সর্বত্র অভেদ। পণ্ডিত-মূর্খ, ধনী-দরিদ্র, ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল সকলে একই পরমপ্রকাশের খণ্ড মূর্তি। প্রত্যহের তুচ্ছতার মধ্যে সে আচ্ছন্ন হয়ে আছে, তাকে মুক্ত করে যুক্ত করে দিতে হবে সে সর্বভাসকের সঙ্গে। দিতে হবে তাকে তার সুমহান অধিকারের সংবাদ। তার অন্তরের নিভৃত গুহা থেকে জাগাতে হবে সে প্রসুপ্ত কেশরী। তার অনুভবের মধ্যে আনতে হবে তার অস্তিত্বের পরমার্থের আস্বাদ।

শুধু নিজে দেখলে চলবে না, দেখাতে হবে। শুধু নিজে চিনলে চলবে না, চেনাতে হবে। আমি যদি একা জেগে উঠে দেখি আর-সবাই তখনো ঘুমিয়ে রয়েছে, তখন আমার আকাশ-ভরা প্রভাত-আলোর আনন্দ কই?

ছিন্ন কথার খেই ধরল ত্রৈলোক্য। বললে, 'সংসারে তো ভালো লোকও আছে। চৈতন্যদেবের ভক্ত পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, তিনি তো সংসারে ছিলেন—'

'তার গলা পর্যন্ত মদ খাওয়া ছিল।' বললেন রামকৃষ্ণ, 'যদি আর একটু খেত, সংসার করতে পারত না।'

'তা হলে সংসারে কি ধর্ম হবে না?'

'হবে। যদি ভগবানকে লাভ করে থাকতে পারো। তখন কলঙ্ক-সাগরে ভাসো, কলঙ্ক না লাগে গায়। তখন পাঁকাল মাছের মতো থাকো। ঈশ্বরলাভের পর যে সংসার সে বিদ্যার সংসার। তাতে কামিনীকাঞ্চন নেই, শুধু ভক্ত আর ভগবান। এই আমার দিকেই দেখ না। আমারও মাগ্‌ আছে, ঘরে-ঘরে ঘটি-বাটিও আছে—হরে প্যালাদের খাইয়েও দিই, আবার যখন হাবীর মা এরা আসে এদের জন্যেও ভাবি।'

চৈতন্যলাভের পর সংসারে গিয়ে থাকো। যদি অনেক পরিশ্রমের পর কেউ সোনা পায়, তা বাক্সের মধ্যেই রাখো বা মাটির নিচেই রাখো, সোনার কিছুই হয় না। কাঁচা মনকে সংসারে রাখতে গেলেই মন মলিন হয়ে যায়। দুধে-জলে একসঙ্গে রাখলেই যায় সব একাকার হয়ে। দুধকে মন্থন করে মাখন তুলে জলের উপর রাখলে আর গোল থাকে না, ভাসে।

কাগজে তেল লাগলে তাতে আর লেখা চলে না। তবে যদি বেশ করে খড়ি দিয়ে ঘষে নিস, লেখা ফুটবে। তেমনি কামকাঞ্চনের দাগ-ধরা জীবনে সাধন করতে হলে ত্যাগের খড়ি ঘর্ষণ করো।

শশধর পণ্ডিতকে দেখতে যাবেন রামকৃষ্ণ। অত বড় পণ্ডিত, অথচ এক বিন্দু ভয় নেই কাছে ঘেঁষতে। আমার কি! আমার তো বাজনার বোল মুখস্ত বলা নয়, হাতে বাজানো। ওরা শুধু জল তোলপাড় করে, আর আমি অতলতলে ডুব দিই।

ওরে নরেন, তুই সঙ্গে চল। মন্দ কি, পণ্ডিতদের সঙ্গে দর্শনচর্চা করে আসবি।

কিন্তু, দেখা হলে শশধর পণ্ডিত কী বললে? বললে, 'দর্শনচর্চা করে হৃদয় শুকিয়ে গিয়েছে। দয়া করে আমায় এক বিন্দু ভক্তি দিন—'

জ্ঞানের খররৌদ্রে দগ্ধ হয়ে গেলাম, দাও এবার একটু ভক্তির বিষাদ-মেঘ, ভালোবাসার অশ্রুবিন্দু। তোমার জন্যে শুধু সেজে-গুজে সুখ নেই, তোমার জন্যে কেঁদে আনন্দ। আমি তোমার রাজরানি হতে চাই না, আমি তোমার কাঙালিনী হব।

রামকৃষ্ণ শশধরের বুকে হাত বুলিয়ে দিলেন। তৃষ্ণা মিটল শশধরের। দীপ্ত চোখ অশ্রুতে ছলছল করে উঠল।

রামকৃষ্ণেরও পিপাসা পেল হঠাৎ। বললেন, জল খাব।

গৃহস্থ যদি নিজের থেকে কিছু না-ও দেয়, তবু সাধু-সন্নেসী চেয়ে নিয়ে কিছু খেয়ে আসবে। আর কিছু না হোক, অন্তত এক গ্লাশ জল। নইলে অকল্যাণ হয় গৃহস্থের।

আর সকলের হোক বা না হোক, রামকৃষ্ণের ভুল হয় না।

তিলক-কণ্ঠীধারী এক ভক্ত শুদ্ধ ভাবে জল নিয়ে এল। কিন্তু মুখের কাছে গ্লাশ তুলে ধরতেই, এ কী হল হঠাৎ? রামকৃষ্ণ গ্লাশ নামিয়ে রাখলেন। তাঁর কণ্ঠনালী আড়ষ্ট, বিশুষ্ক হয়ে গিয়েছে। এক ফোঁটা জল গলবে না ভিতরে।

গ্লাশের জলে কুটোকাটা পড়েছে বোধ হয়। তাই বোধ হয় আপত্তি করলেন খেতে। গ্লাশের জল ফেলে দিল নরেন। আরেক গ্লাশ জল এনে দিল আরেক জন। এবার সে জল স্বচ্ছন্দে পান করলেন রামকৃষ্ণ। সন্দেহ নেই, আগের গ্লাশে ময়লা ছিল বলেই সেটা প্রত্যাখ্যাত হয়েছে।

কিন্তু নরেনের মন মানতে চাইল না কিছুতেই। নিশ্চয়ই গভীর আর কোনো রহস্য আছে। ঠাকুরকে একাই পাঠিয়ে দিলে গাড়িতে করে। বললে, আমার বিশেষ কাজ আছে। পরে যাব।

বিশেষ কাজ নয় তো কি! সব দিক থেকে যাচিয়ে-বাজিয়ে নিতে হবে ঠাকুরকে। সব কিছুর জানতে হবে হাট-হদ্দ। কেন উনি ঐ ভক্তের হাতের জল খেলেন না?

তিলক-কণ্ঠীধারীকে প্রশ্ন করা যায় না সরাসরি। তার ছোট ভাইকে পাকড়াও করলে। ভাগ্যক্রমে তার সঙ্গে আগে থেকে আলাপ ছিল নরেনের। জিজ্ঞাসা করলে, ব্যাপার কি হে তোমার দাদাটির? বলি, স্বভাবচরিত্র কেমন?

মাথা চুলকোলো ছোট ভাই। বললে, দাদার কথা কি করে বলি ছোট হয়ে?
নিমেষে বুঝে নিল নরেন। কিন্তু ঠাকুর বুঝলেন কি করে? তিনি কি অন্তর্যামী অন্তরজ্ঞ?
আবার গেরুয়া কেন? একটা কি পরলেই হল? রামকৃষ্ণ রসিকতা করলেন, 'একজন বলেছিল চণ্ডী ছেড়ে হলুম ঢাকী। আগে চণ্ডীর গান গাইতো, এখন ঢাক বাজায়।'
সংসারের জ্বালায় জ্বলে গেরুয়া পরেছে—সে বৈরাগ্য বেশি দিন টেঁকে না। হয়তো কাজ নেই, গেরুয়া পরে কাশী চলে গেল। তিন মাস পরে ঘরে চিঠি এল, আমার একটি কাজ হয়েছে, কিছু দিন পরেই বাড়ি ফিরব, ভেবো না আমার জন্যে। আবার সব আছে, কোনো অভাব নেই, কিন্তু কিছুই ভালো লাগে না। ভগবানের জন্যে একা-একা কাঁদে। সে বৈরাগ্যই আসল বৈরাগ্য।
মন যদি ভেকের মত না হয়, ক্রমে সর্বনাশ হয়। তার চেয়ে শাদা কাপড় ভালো। মনে আসক্তি, আর বাইরে গেরুয়া! কী ভয়ঙ্কর!
ভগবতী ঝি এসে দূর থেকে প্রণাম করল ঠাকুরকে। অনেক দিনের ঝি। বাবুদের বাড়িতে কাজ করে। ঠাকুরের জানাশোনা।
প্রথম বয়সে স্বভাব ভালো ছিল না। কিন্তু তাই বলে ঠাকুর তাঁর করুণার সুগন্ধ বারির ধারাটি শুকিয়ে ফেলেননি। দিচ্ছেন তাকে তাঁর অমিয় বচনের আশীর্বাদ। বললেন, 'কি রে, এখন তো ঢের বয়েস হয়েছে। টাকা যা রোজগার করলি, সাধু-বৈষ্ণবদের খাওয়াচ্ছিস তো?'
'তা আর কি করে বলব?' অল্প একটু হাসল ভগবতী।
'কাশী-বৃন্দাবন—এ সব হয়েছে?'
'তা আর কি করে বলব?' কুণ্ঠিত হবার ভান করল ভগবতী: 'একটা ঘাট বাঁধিয়ে দিয়েছি। তাতে পাথরে আমার নাম লেখা আছে।'
'বলিস কি রে?'
'হ্যাঁ, নাম লেখা আছে শ্রীমতী ভগবতী দাসী।'
আনন্দে হাসলেন রামকৃষ্ণ। বললেন, 'বেশ, বেশ।'
কি মনে ভাবল ভগবতী, হঠাৎ ঠাকুরের পা ছুঁয়ে প্রণাম করলে।
যেন একটা বিছে কামড়েছে, যন্ত্রণায় এমনি অস্থির হয়ে পড়লেন ঠাকুর। ছোট খাটটিতে বসে ছিলেন, ঝটকা মেরে দাঁড়িয়ে পড়লেন। মুখে শুধু 'গোবিন্দ', 'গোবিন্দ'। কী যেন একটা অঘটন ঘটে গেল মুহূর্তে। অসহন আর্তির দৃশ্য। শিশুঅঙ্গে কে যেন তপ্ত অঙ্গার ছুঁড়ে মেরেছে।
ঘরের যে কোণে গঙ্গাজলের জালা, সেদিকে হাঁপাতে-হাঁপাতে ছুটলেন ঠাকুর। পায়ের যেখানে ভগবতী ছুঁয়েছিল সেখানে ঢালতে লাগলেন গঙ্গাজল।
জীবন্মৃতার মত বসে আছে ভগবতী। সাড় নেই স্পন্দ নেই, দহনের পর দেহের ভস্মরেখা। জীবনে অনেক সে পাপ করেছে, কিন্তু এ পাপের বোধ হয় তুলনা নেই।

যত তোমার পাপ করবার ক্ষমতা, তার চেয়ে ভগবানের বেশি ক্ষমতা ক্ষমা করবার। পতিতপাবন করুণাসিন্ধু তাই আবার অমৃতবচন বিতরণ করলেন।
বললেন, 'বেশ তো গোড়ায় দূর থেকে প্রণাম করেছিলি। কেন মিছিমিছি পা ছুঁতে যাস?'
যাক গে। তাই বলে মন-খারাপ করিস নে। গা-হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছে এতক্ষণে। শোন, একটু গান শোন। গান শুনলে তুইও ঠাণ্ডা হবি।
ঠাকুর গান ধরলেন।
দুর্গাপূজার দিন মঠে বহু লোক সেবার প্রণাম করছে শ্রীমাকে। প্রণামের পর বারে-বারে গঙ্গাজলে পা ধুচ্ছেন শ্রীমা। যোগেন-মা বললেন, 'মা, ও কি হচ্ছে? সর্দি করে বসবে যে।'
'যোগেন, কি বলব! এক-একজন প্রণাম করে যেন গা জুড়োয়, আবার এক-একজন প্রণাম করে যেন গায়ে আগুন ঢেলে দেয়। গঙ্গাজলে না ধুলে বাঁচিনে।'
তোমার পা ছোঁবার সুযোগ দাওনি। তাই দূর থেকেই তোমাকে প্রণাম করছি। তাতেও যদি পাপস্পর্শের জ্বালা লাগে, গঙ্গাজল কোথায় পাব মা, আমার অশ্রুজলে ধুয়ে নিয়ো পাদপদ্ম।
ভবতারিণীর মন্দিরে গিয়ে ভাবাবস্থায় কথা বলছেন ঠাকুর, 'করছিস কি? এত লোকের ভিড় কি আনতে হয়? নাইবার-খাবার সময় নেই। গলা তো ভাঙা ঢাক। এত করে বাজালে কোন দিন ফুটো হয়ে যাবে যে। তখন কী করবি?'
তবু ভিড়ের কমতি নেই। ভক্তের দল যেমন আসছে তেমনি আসছে আবার ভণ্ডের দল।
'অমন সব আদাড়ে লোকদের এখানে আনিস কেন?' এক দিন সরাসরি জগদম্বার সঙ্গে ঝগড়া করছেন রামকৃষ্ণ। 'আমি অতশত পারব না। এক সের দুধে পাঁচ সের জল—জ্বাল ঠেলতে-ঠেলতে ধোঁয়ায় চোখ জ্বলে গেল। তোর ইচ্ছে হয় তুই দিগে যা। আমি অত জ্বাল ঠেলতে পারব না। অমন সব লোকদের আর আনিসনি।'
সাধুর মধ্যেও ভণ্ডের ছড়াছড়ি।
'যে সাধু ওষুধ দেয়, ঝাড়ফুঁক করে, টাকা নেয়, বিভূতি-তিলকের আড়ম্বর করে, খড়ম পায়ে দিয়ে যেন সাইনবোর্ট মেরে নিজেকে জাহির করে বেড়ায়, তার থেকে কিছু নিবিনে।'
শুধু ভক্তি খুঁজে বেড়াবি। অহেতুক ভক্তি। নারদীয় ভক্তি। ভক্তির আমি-র অহঙ্কার নেই। এ আমি আমির মধ্যেই নয়। যেমন হিঞে শাক শাকের মধ্যে নয়। অন্য শাকে অসুখ করে, হিঞে শাকে পিত্ত যায়। মিছরি মিষ্টির মধ্যে নয়। অন্য মিষ্টিতে অপকার, মিছরি খেলে অম্বল নাশ হয়। ভক্তি অজ্ঞান করে না, বরং ঈশ্বর লাভ করিয়ে দেয়।
আমার শক্তি নেই, আসক্তিও নেই। শুধু ভক্তি নিয়ে বসে আছি এক কোণে। মধুস্নিগ্ধ পদ্ম যদি ফোটে, শুনতে পাব সে ভৃঙ্গের গুঞ্জরণ।
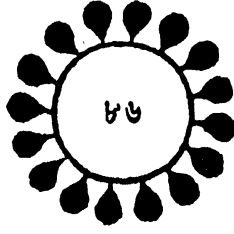
আচ্ছা, রসিক মেথর কি কোনোদিন পা ছুঁয়ে প্রণাম করেছিল ঠাকুরকে? যদি বা করেছিল, গায়ে কি জ্বালা ধরেছিল ঠাকুরের? যেমন হয়েছিল ভগবতীর বেলায়? ময়লা পরিষ্কার করে বলে রসিকও কি ময়লা?

কে বলে! মেথররূপী নারায়ণ। ঝাড়ু অস্পৃশ্য বটে, কিন্তু ঝাড়ুদার অস্পৃশ্য নয়। পা ছুঁয়ে প্রণাম করেছিল কিনা জানা নেই, কিন্তু ঠাকুর একদিন সটান রসিকের বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত। শরীরে না হোক, মনে-মনে।

বলছেন ঈশান মুখুজ্জেকে, 'ধ্যান করছিলাম। ধ্যান করতে-করতে মন চলে গেল রসকের বাড়ি। রসকে ম্যাথর। মনকে বললুম, থাক শালা, ঐখানেই থাক। মা দেখিয়ে দিলেন, ওর বাড়ির লোকজন সব বেড়াচ্ছে, খোল মাত্র, ভিতরে সেই এক কুলকুণ্ডলিনী, এক ষটচক্র।'

রতির মাকে চেনো তো? লালাবাবুর রানি কাত্যায়নীর মোসাহেব, গোঁড়া বৈষ্ণবী। খুব আসা-যাওয়া করে দক্ষিণেশ্বরে। ভক্তি দেখে কে। কিন্তু যেই রামকৃষ্ণকে দেখল মা-কালীর প্রসাদ খেতে, অমনি পালালো।

কী আশ্চর্য, সেই রতির মা'র বেশেই মা-কালী দেখা দিলেন একদিন। যা শক্তি তাই বৈষ্ণবী। বললেন, তুই ভাব নিয়েই থাক।

কিন্তু আমার ভাব কি জানো? চোখ চাইলেই কি তিনি, আর নেই? আমি নিত্য-লীলা দুইই লই। সব মতই সেই এককে নিয়ে। একঘেয়েকে নিয়ে নয়। তাই আমি শাক্তেও আছি, বৈষ্ণবেও আছি, বেদেও আছি, বেদান্তেও আছি। রাম শিবকে পুজো করেছিলেন, শিব রামকে। কৃষ্ণ স্তব করেছিলেন কালীকে, আবার কৃষ্ণই কালীরূপ ধরেছিলেন। আমি সব ঘটে আছি, সব সংঘটে। শুধু অকপট হলেই হল। আকারে যে অনাকারেও সে। কিম্বা বলো, সাকার-নিরাকার আমার বাপ-মা। বাপ নির্গুণ মা গুণান্বিতা। কাকে নিন্দা করে কাকে বন্দনা করবে, দুই পাল্লাই সমান ভারি।

'নির্গুণ মেরা বাপ সগুণ মাহ্‌তারি,
কারে নিন্দো কারে বন্দো, দোনো পাল্লা ভারি।'

'যে সমন্বয় করেছে সেইই লোক।' বললেন রামকৃষ্ণ।

যত মত তত পথ। কিন্তু পথটাই পৌঁছুনো নয়। মতেই না হয় মতিভ্রম। যদি ভুল-পথেও যাও, ঘুর-পথেও যাও, অন্তরে যদি অসরল না থাকে, তবে সে-পথও একদিন সোজা-পথ হয়ে যাবে। হবে ঠিক জগন্নাথদর্শন।
যাত্রার লগ্নে লক্ষ্যটি যদি ঠিক থাকে, পথ যাই হোক, একদিন ঠিক হাত ধরবেন অন্ধকারে। ক্লান্ত হলে কোলে নেবেন। তাঁর হাতে শুধু হিত, পায়ে শুধু ছায়া। ঈশ্বর ক্ষীরের পুতুল। হাত ভেঙে খেলেও মিষ্টি, পা ভেঙে খেলেও মিষ্টি।
এই একমাত্র আসল, যার আসল ভেঙে খেলেও সুদ বাড়ে।
কলকাতায়, পাথুরেঘাটায় যদু মল্লিকের বাড়ি যাচ্ছেন ঠাকুর। কিন্তু গাড়ির যোগাড় হয় কোত্থেকে?
বরানগরের বেণী সা ভাড়ায় গাড়ি খাটায়। কথা আছে, ঠাকুর বলে পাঠালেই দক্ষিণেশ্বরে গাড়ি আসবে। আর, কলকাতা থেকে ফিরতে যত রাতই হোক না, গাড়োয়ান গোলমাল করতে পাবে না। যত বেশি টাইম তত বেশি ভাড়া। আগে রসদদার ছিল মথুর, পরে পেনেটির মণি সেন, শেষে শম্ভু মল্লিক, এখন সিঁদুরে-পটির জয়গোপাল। তবে যার বাড়িতে যাওয়া, সেই দিয়ে দেয় গাড়িভাড়া।
কিন্তু যদু মল্লিক যা কৃপণ। বরাদ্দ দুটাকা চার আনার বেশি গাড়িভাড়া দেবে না। কিন্তু বেণী সা'র সঙ্গে বন্দোবস্ত হয়েছে ফিরতে যত রাতই হোক, তিন টাকা চার আনা দিলেই গাড়োয়ান আর গোলমাল করবে না। নইলে, দেরি হতে দেখলেই গ্যাড়োয়ান কেবল চলো, চলো, করে দিক্ করে। কিন্তু গেলেই কি তক্ষুনি-তক্ষুনি ফেরা যায়? যদুর মা এসেছে, সে কত ভালোবাসে, তার সঙ্গে দুটো কথা না কয়েই বা আসি কি করে? কিন্তু এখন বাড়তি টাকা একটা কে দেয়!
একদিন যদুকে বললেন সরাসরি: 'হ্যাঁ হে, এত টাকা করেছ, এখনো টাকার লোভ গেল না?'
'দেখ ছোট ভটচাজ,' বললে যদু মল্লিক, 'ও লোভ যাবার নয়। তুমি যেমন ভগবানের লোভ ছাড়তে পারো না, তেমনি বিষয়ী লোকও ছাড়তে পারে না টাকার লোভ। আর কেনই বা ছাড়বে? তুমি ভগবানের প্রেমের জন্যে পাগল, আমি তাঁর ঐশ্বর্যের জন্যে পাগল! আচ্ছা, বলো দিকিনি টাকা কি তাঁর ঐশ্বর্য নয়?'
ঠাকুরের মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বললেন, 'যদি এটা ঠিক বুঝে থাকো টাকাটা তোমার নিজের ঐশ্বর্য নয়, ভগবানের ঐশ্বর্য, তাহলে আর তোমার ভাবনা কি গো! কিন্তু এ কথা তুমি সরল ভাবে বলছ, না, চালাকি করে বলছ?'
'সে কথা তুমিই জানো। তোমার কাছ থেকে কি মনের কথা লুকোনো যায়?'
কিন্তু যাই বলো, ও সব মোসাহেবগুলোকে রেখেছ কেন?
'ভদ্দরলোকের ছেলে, ভিক্ষে করতে পারে না, কিছু পাবার আশায় এখানে পড়ে থাকে। ওদের বঞ্চিত করলে ওরা যায় কোথায়?'
'কিন্তু ওদের সঙ্গে মিশলে ক্ষতি হতে পারে।'

'দেখ ছোট ভটচাজ, বিষয়-আশয় রাখতে গেলে অমন লোকের দরকার আছে।'
আবার বিষয়-আশয়! চঞ্চল হয়ে উঠলেন ঠাকুর। 'সবই তো ইহকালের জন্যে সংগ্রহ করছ, ও পারের জন্যে কি যোগাড়যন্ত্র করলে?'
'ও পারের কাণ্ডারী তো তুমি। শেষের দিনে তুমি আমায় পার করবে সেই আশায়ই তো শেষ পর্যন্ত বসে থাকব। আমায় উদ্ধার না করলে তোমার পতিতপাবন নামে কালি পড়বে।'
চলো যদু মল্লিকের বাড়ি।
তার মা ঠাকুরকে কাছে বসে খাওয়ান আর কাঁদেন। তাঁর বাৎসল্য-রস।
গাড়িতে উঠলেন ঠাকুর। সঙ্গে লাটু, হাতে ঠাকুরের বটুয়া আর গামছা। আর হয়তো অতুলকৃষ্ণ, গিরিশ ঘোষের ভাই। কৌতূহলী হয়ে এটা-ওটা দেখছেন ঠাকুর আর শিশুর মত জিগগেস করছেন লাটুকে।
বরানগরের বাজার ছাড়িয়ে চলেছেন এখন মতিঝিলের পাশ দিয়ে। ডাইনে একটা মদের দোকান, ডাক্তারখানা, চালের আড়ত, ঘোড়ার আস্তাবল। তার দক্ষিণে সর্ব-মঙ্গলা আর চিত্তেশ্বরীর মন্দির।
মদের দোকানে মদ খাচ্ছে মাতালেরা আর খুব হল্লা করছে। কেউ-কেউ বা গান ধরেছে স্ফূর্তিতে। কেউ-কেউ বা বিচিত্র অঙ্গভঙ্গি করে নাচছে স্খলিত পায়ে। সব চেয়ে মজার, দোকানের যে মালিক, সে নির্লিপ্ত হয়ে দুয়ার ধরে দাঁড়িয়ে আছে বাইরে চেয়ে। দোকানের চাকর তদারক করছে বেচাকেনা। এ সবে মালিকের যেন আটা নেই। কপালে মস্ত এক সিঁদুরের ফোঁটা কেটে দাঁড়িয়ে আছে দোরগোড়ায়।
যার জন্যে দাঁড়িয়ে আছে সে বুঝি ঘরের সমুখ দিয়ে চলে যাবে। আনমনে চলে যাবে। হয়তো একবার ভুলেও ভ্রূক্ষেপ করবে না।
মদ-বেচা শুঁড়ি, তার আবার আবদার! কিন্তু ঠাকুর তো মদ দেখেন না, ঠাকুর মন দেখেন। জীবিকা দেখেন না, জীবন দেখেন। দোকানের মদের ভাণ্ড আমার পূর্ণ থাকতে পারে কিন্তু অন্তরে করুণার কুম্ভটি আমার শূন্য।
ঠাকুরকে দেখতে পেয়েই হাত তুলে প্রণাম করল দোকানি। ঠাকুরের চোখ পড়ল দোকানের দিকে। তরল-অনল-উচ্ছল মাতালদের দিকে। তাদের বিহ্বল মাতা-মাতির দিকে। এ কি! ঠাকুরও যে মুহূর্তে বিভোর হয়ে গেলেন নেশায়। তাঁর গা-হাত-পা টলতে লাগল, এড়িয়ে গেল কথা! এ কি! ঠাকুরও মদ খেয়েছেন নাকি? কখন খেলেন?
মদ দেখে কারণের কথা মনে পড়েছে ঠাকুরের—জগৎকারণের কথা। কারণানন্দ দেখে মনে পড়েছে সচ্চিদানন্দকে। ঠাকুরও মদ খেয়েছেন, কিন্তু এ মদের নাম হরিরসমদিরা। এ মদের নাম সুরা নয় সুধা। এ মদ মদের চেয়েও দুর্মদ।
শুধু তাই নয়, চলতি গাড়ির পা-দানিতে এক পা রেখে মাতালের মত নাচতে শুরু করলেন ঠাকুর। হাত নেড়ে-নেড়ে বলতে লাগলেন চেঁচিয়ে : 'বা, বেশ হচ্ছে, খুব হচ্ছে, বা, বা, বা!'

এ কি, পড়ে যাবেন যে! চলতি গাড়ি থেকে রাস্তায় ছিটকে পড়লে কি আর রক্ষে আছে? ত্রস্তব্যস্ত হয়ে অতুল ধরতে গেল ঠাকুরকে, হাত বাড়িয়ে টানতে গেল ভিতরে। লাটু বাধা দিয়ে বললে, 'পড়ে যাবেন না, ভয় নেই। নিজে হতেই সামলাবেন—'

আড়ষ্ট হয়ে রইল অতুল। বুক ঢিপ-ঢিপ করতে লাগল। নিজে হতেই সামলাবেন! কে জানে। পড়ে গেলেই তো সর্বনাশ! আর নয়, পাগলা ঠাকুরের সঙ্গে আর কখনো যাব না এক গাড়িতে। দিব্যি সহজ মানুষের মত কথাবার্তা বলছিলেন, হঠাৎ কোথাকার কতগুলো মাতাল দেখে মত্ত হয়ে গেলেন। এ কখনো শুনিনি।

শুনিনি তো ঠিক, কিন্তু দেখছি স্বচক্ষে। কারণীভূতকে দেখে কারণশরীরে অকারণ আনন্দ!

গাড়ি ছাড়িয়ে গেল শুঁড়িখানা। ঠাকুর স্থির হয়ে বসলেন এসে ভিতরে। স্বাভাবিক সহজ সুরে বললেন, 'ঐ সর্বমঙ্গলা। বড় জাগ্রত। প্রণাম করো।' নিজেই প্রণাম করলেন সর্বাগ্রে।

মদ খেয়ে টং হয়েছে গিরিশ। এমন মাতাল, বেশ্যাও তখন দরজা খুলে দিতে নারাজ। হঠাৎ কি হল, দক্ষিণেশ্বরের কথা মনে পড়ে গেল আচমকা। একটা ঘোড়ার গাড়ি ডাকিয়ে নিয়ে উঠে বসল। চলো দক্ষিণেশ্বর। সেখানে এমন একজন আছেন যিনি দরজা কখনো বন্ধ করেন না।

রাত নিশুতি। মন্দিরের ফটক কখন বন্ধ হয়ে গিয়েছে। সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে এতক্ষণে।

তা হোক, তবু কোথাও যদি জায়গা থাকে, সে দক্ষিণেশ্বর। কলকাতার উত্তরে, কিন্তু আসলে দক্ষিণ।

যা ভেবেছিল। ফটক বন্ধ। চার পাশ অন্ধকার। নিস্পন্দ।

কিন্তু যিনি ঘুমোন না, আর্ত জনের অন্ধ জনের কান্না শোনবার জন্যে উৎকর্ণ হয়ে আছেন তাঁকে ডাকতে দোষ কি!

'ঠাকুর! ঠাকুর!' চীৎকার করে ডাকতে লাগল গিরিশ।

কে, গিরিশ না? সেই নোটো নেচো গিরিশ! নির্জন নিঃসহায় অন্ধকারে আমাকে ডাকছে কাতর প্রাণে! আমি কি থাকতে পারি স্থির হয়ে?

বাইরে বেরিয়ে এলেন ঠাকুর। ফটক খোলালেন। মাতাল গিরিশের হাত ধরলেন আনন্দে। মদ খেয়েছিস তো কি, আমিও মদ খেয়েছি। সুরাপান করি না রে, সুধা খাই রে কুতূহলে। আমারে মন-মাতালে মাতাল করে, মদ-মাতালে মাতাল বলে। বলে গিরিশের হাত ধরে হরিনাম করতে-করতে নাচতে লাগলেন ঠাকুর।

স্বভাব আর ছাড়তে পারে না গিরিশ। সে দিন আবার মাতাল হয়ে এসেছে গাড়িতে করে।

কি করেই বা ছাড়বে? গল্প করলেন ঠাকুর: 'বর্ধমানে দেখেছিলাম। একটা দামড়া গাই-গরুর কাছে যাচ্ছে। জিগগেস করলুম, এ কী হল? তখন গাড়োয়ান বললে, মশায়, এ বেশি বয়সে দামড়া হয়েছিল। তাই আগেকার সংস্কার যায়নি।

একটা বাটিতে যদি রশুন গোলা হয়, রশুনের গন্ধ কি যায়? বাবুই গাছে কি আম হয়?'

ঠাকুরও তেমনি তাঁর স্বভাব ছাড়তে পারেন কই? তাঁর অযাচিত করুণার স্বভাব। ওরে গিরিশ এসেছে। নিজেই এগিয়ে গিয়ে আদর করে ধরে নিয়ে এলেন। মাতাল বলে প্রত্যাখ্যান করলেন না।

লাটুকে বললেন, 'যা তো, দ্যাখ তো গাড়িতে কিছু আছে কিনা।'

লাটু গিয়ে দেখে মদের বোতল পড়ে আছে। আর গ্লাশ আছে কাঁচের। ঠাকুরের হুকুম, নিয়ে চলল গ্লাশ-বোতল। ভক্তরা যারা দেখল হেসে উঠল।

ঠাকুর বললেন, 'রেখে দে তোর কাছে। এখানে খোঁয়ারি এলে তখন কোথায় পাব?'

মদের মধ্য দিয়েই ওর মুক্তি আসবে। শেষকালে আর মদ থাকবে না, থাকবে মাদকতা। ক্রোধ থাকবে না থাকবে তেজ। কাম থাকবে না থাকবে প্রেম। লোভ থাকবে না থাকবে ব্যাকুলতার হাওয়া।

গিরিশের চোখের দিকে তাকিয়ে রইলেন ঠাকুর। রাঙা চোখ শাদা করে দিলেন। গিরিশ বললে, 'আমার আস্ত বোতলের নেশাটাই মাটি করে দিলে।'

'যদি পাপ থেকে পরিত্রাণ পাবই জানতুম,' গিরিশ আপশোষ করেছিল, 'তবে আরো কিছু পাপ করে নিতুম শখ মিটিয়ে।'

সে বার লছমনঝোলায় শরৎ-মহারাজ আর হরি-মহারাজ খুব ভাঙ খেয়েছে। নেশা করে শুধু ঠাকুরের কথাই কইতে লাগল। কইতে-কইতে চোখ শাদা হয়ে গেল, নেশার লেশমাত্র রইল না।

বাকি রাতটুকু তোমার কথাই কইতে দাও। এই ব্যাধির রাত, বিকারের রাত কেটে যাক। তোমার কথায় জাগুক একবার সেই আরোগ্যের সুপ্রভাত।
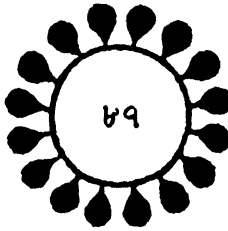
'আমাকে বিদ্যাসাগরের কাছে নিয়ে যাবে?' মাস্টারমশাইকে জিগগেস করলেন ঠাকুর। 'আমার দেখতে বড় সাধ হয়।'

বিদ্যাসাগরের ইস্কুলে মাস্টারি করেন, একদিন কথাটা পাড়লেন গিয়ে মাস্টারমশাই। বিদ্যাসাগর জিগগেস করলেন, 'কেমনতরো পরমহংস হে? গেরুয়া কাপড় পরে থাকেন নাকি?'

'না, লালপেড়ে কাপড় পরেন। গায়ে জামা, পায়ে বার্ণিশ-করা চটিজুতো। রাসমণির কালীবাড়িতে থাকেন একটি ঘরে, তক্তপোশের উপর সামান্য বিছানা, তাতেই শোন, মশারি খাটান। দেখতে অত্যন্ত শাদাসিধে, কিন্তু এমন আশ্চর্য লোক আর দেখা যায় না। ঈশ্বর ছাড়া আর কিছু জানেন না সংসারে।'

বটে? খুশি হয়ে উঠলেন বিদ্যাসাগর। বললেন, 'শনিবার চারটের সময় নিয়ে এস।'

গাড়ি করে যাচ্ছেন রামকৃষ্ণ। সঙ্গে মাস্টার, ভবনাথ আর হাজরা।

আহা, ভবনাথ কেমন সরল! বিয়ে করে এসে আমায় বলছে, আমার স্ত্রীর উপর এত স্নেহ হচ্ছে কেন? তা, স্ত্রীর উপর ভালোবাসা হবে না? এটিই জগৎমাতার ভুবনমোহিনী মায়া।

এই স্ত্রী নিয়ে মানুষ কী না দুঃখভোগ করছে। তবু মনে করে এমন আত্মীয় আর কেউ নেই। কুড়ি টাকা মাইনে—তিনটে ছেলে হয়েছে—তাদের ভালো করে খাওয়াবার শক্তি নেই, বাড়ির ছাদ দিয়ে জল পড়ছে, পয়সা নেই মেরামত করার—ছেলের নতুন বই কিনে দিতে পারে না, ছেলের পৈতে দিতে পারে না—এর কাছে আট আনা ওর কাছে চার আনা ভিক্ষে করে—

বিদ্যারূপিণী স্ত্রীই যথার্থ সহধর্মিণী। এক হাতে সংসারের কাজ করে, আরেক হাতে স্বামীর হাত ধরে নিয়ে চলে ঈশ্বরের পথে।

আর হাজরা?

অনেক জপতপ করে, মন পড়ে আছে বাড়িতে, স্ত্রী-ছেলে জমি-জমার উপর। তাই ভিতরে-ভিতরে দালালিও করে। টাকাওয়ালা লোক দেখলে কাছে ডাকে, লম্বা-লম্বা কথা শোনায়, বলে, রাখাল-টাখাল যা সব দেখছ, জপতপ করতে পারে না, হো-হো করে ঘুরে বেড়ায়।

'যদি কেউ পর্বতের গুহায় বাস করে, গায়ে ছাই মাখে, উপবাস করে, নানা কঠোর সাধনা করে, কিন্তু ভিতরে-ভিতরে বিষয়ে মন, কামকাঞ্চনে মন, সে লোককে বলি ধিক। আর যার কামকাঞ্চনে মন নেই, খায় দায় বেড়ায়, তাকে বলি ধন্য।'

পোল পার হয়ে শ্যামবাজার হয়ে আমহার্স্ট স্ট্রিটে পড়েছে গাড়ি। এই বাদুড়-বাগানের কাছে এসে গেলাম। মুহূর্তে ভাবাবেশ হল রামকৃষ্ণের।

এই রামমোহন রায়ের বাগান-বাড়ি।

রামকৃষ্ণ বিরক্ত হয়ে বললেন, 'এখন ও সব আর ভালো লাগছে না।'

এখন শুধু বিদ্যাসাগর। বিদ্যা—যা থেকে ভক্তি, দয়া, প্রেম, জ্ঞান—যা শুধু ঈশ্বরের পথে নিয়ে যায়। সেই বিদ্যার সমুদ্র।

দোতলা, ইংরেজ-পছন্দ বাড়ি। চারদিকে দেয়াল, পশ্চিম ধারে ফটক। পাঁচিল থেকে নিচের ঘর পর্যন্ত ফুলের কেয়ারি। বিদ্যাসাগর উপরে থাকেন। সিঁড়ি দিয়ে উঠেই উত্তরে একটি কামরা, তার পুবে হল-ঘর। হল-ঘরের পুব প্রান্তে টেবিল-চেয়ার। সেইখানে পশ্চিমমুখো হয়ে বসে কাজ করেন বিদ্যাসাগর। হল-ঘরের দক্ষিণে বিদ্যাসাগরের লাইব্রেরি। সে আরেক বিরাট শব্দসমুদ্র। পাশেই নিরীহ শোবার-ঘর।

'মা গো, পণ্ডিতের সঙ্গে দেখা করতে চলেছি। আমার মুখ রাখিস মা।'

গাড়ি থেকে নামলেন রামকৃষ্ণ। গায়ে একটি লংক্লথের জামা, পরনে লালপেড়ে ধুতি, আঁচলটি কাঁধের উপর ফেলা। পায়ে বার্ণিশ-করা চটি জুতো। উঠোন পেরিয়ে যেতে-যেতে জিগগেস করলেন মাস্টারকে, 'জামার বোতাম খোলা রয়েছে, এতে কিছু দোষ হবে না?'

'আপনার কিছুতে দোষ হবে না।' বললে মাস্টার। 'আপনার বোতাম দেবার দরকার নেই।'

নিশ্চিন্ত হলেন ঠাকুর। বালককে বোঝালে যেমন নিশ্চিন্ত হয়, তেমনি।

হল-ঘরে না বসে উত্তরের কামরায় বসেছেন বিদ্যাসাগর। বয়স আন্দাজ বাষট্টি। রামকৃষ্ণের থেকে ষোলো-সতেরো বছরের বড়। খর্বাকৃতি, মাথাটি প্রকাণ্ড, চার পাশ উড়িয়াদের মতো কামানো। পরনে শাদা থান কাপড়, গায়ে হাত-কাটা ফ্লানেলের জামা, গলার পৈতে দেখা যাচ্ছে, পায়ে ঠনঠনের চটি জুতো। বাঁধানো দাঁতগুলো ঝকঝক করছে।

রামকৃষ্ণ ঘরে ঢুকতেই বিদ্যাসাগর উঠে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা করলেন। যে টেবিল সামনে রেখে দক্ষিণাস্য হয়ে বসে ছিলেন বিদ্যাসাগর, তার পুব পাশে এসে দাঁড়ালেন রামকৃষ্ণ। বাঁ হাতখানি টেবিলের উপর। যেন সংলগ্ন হয়ে আছেন বিদ্যাসাগরে। একদৃষ্টে তাঁকে দেখছেন আর হাসছেন ভাবাবেশে। ভাবাবেশ সংবরণ করবার জন্যে মাঝে-মাঝে বলছেন রামকৃষ্ণ, 'জল খাব।' 'জল খাব।'

দেখতে-দেখতে ভিড় হয়ে গেল ঘরের মধ্যে। পিছনে একটা পিঠ-তোলা বেঞ্চি ছিল, তাতে বসলেন রামকৃষ্ণ। সেখানে একটি ছেলে বসে। বিদ্যাসাগরের কাছে ভিক্ষে করতে এসেছে, পড়াশোনার খরচ চলে না। তার থেকে সরে বসলেন ঠাকুর। বললেন, 'মা, এ ছেলের বড় সংসারাসক্তি। তোমার অবিদ্যার সংসার। এ অবিদ্যার ছেলে।'

আর এ ছেলেটি? সামনে-বসা আরেকটি ছেলেকে নির্দেশ করলেন বিদ্যাসাগর।

'এ ছেলেটি সৎ। যেন অন্তঃসার ফল্গু নদী। উপরে বালি, কিন্তু একটু খুঁড়লেই জল দেখতে পাবে ভিতরে।'

জল এসে গেল ভিতর থেকে। বিদ্যাসাগর মাস্টারকে জিগগেস করলেন, 'কিছু খাবার দিলে ইনি খাবেন কি?'

'আজ্ঞে আনুন না।' বললে মাস্টার।

বিদ্যাসাগর ব্যস্ত হয়ে ছুটে গেলেন বাড়ির মধ্যে। একথালা মিষ্টি নিয়ে এলেন। বললেন, 'এগুলি বর্ধমান থেকে এসেছে।'

মিষ্টিমুখ করলেন রামকৃষ্ণ। ভবনাথ আর হাজরাও কিছু অংশ পেল। মাস্টারের বেলায় বিদ্যাসাগর বললেন, ও তো ঘরের ছেলে। ওর জন্যে আটকাবে না।

মিষ্টিমুখের পর বিদ্যাসাগরের দিকে চেয়ে মিষ্টি হেসে বললেন রামকৃষ্ণ, 'আজ সাগরে এসে মিললাম। এতদিন খাল বিল হ্রদ নদী দেখেছি, এইবার সাগর দেখলুম!'

বিদ্যাসাগর হেসে জবাব দিলেন, 'তবে নোনা জল খানিকটা নিয়ে যান।'
'না গো! . নোনা জল কেন? তুমি তো অবিদ্যার সাগর নও, তুমি যে বিদ্যার সাগর। তুমি যে ক্ষীরসমুদ্র।'
এক ঘর লোক। কেউ বসে কেউ দাঁড়িয়ে। কথার রসগ্রহণ করে হাসছে সবাই। কিন্তু বিদ্যাসাগর চুপ।
'তোমার কর্ম সাত্ত্বিক কর্ম।' বলছেন রামকৃষ্ণ, 'সত্ত্বগুণ হয় দয়া থেকে। শুকদেবাদি লোকশিক্ষার জন্যে দয়া রেখেছিলেন। তোমার বিদ্যাদান অন্নদান—সেও ঐ দয়া থেকে। নিষ্কাম হয়ে করতে পারলে ঐতেই ভগবান-লাভ। কেউ করে নামের জন্যে, পুণ্যের জন্যে, তাদের কর্ম নিষ্কাম নয়। আর তোমার হচ্ছে দয়ার থেকে, দয়ার জন্যে। তাই তুমি তো সিদ্ধ গো!'
'আমি সিদ্ধ?' চমকে উঠলেন বিদ্যাসাগর। 'আমি আবার ভগবানের জন্যে সাধন করলুম কবে?' রামকৃষ্ণ হাসলেন। বললেন, 'আলু-পটল সিদ্ধ হলে কী হয়? নরম হয়। তুমিও তো তেমনি নরম হয়ে গেছ। পরের দুঃখে তোমার হৃদয় দ্রবীভূত হয়েছে। তোমার এত দয়া, তুমি নও তো আর কে সিদ্ধ?'
শিবনাথের কোলে একটি সাত-আট বছরের মেয়ে। শিবনাথ তখন আছে বন্ধু যোগেনের সঙ্গে। যোগেন দ্বিতীয়পক্ষে একটি বিধবা মেয়েকে বিয়ে করে সমাজপরিত্যক্ত হয়ে বাস করছে নিরালায়। একটা হিন্দু চাকর পর্যন্ত জোটেনি। থাকবার মধ্যে আছে সতীর্থ বন্ধু শিবনাথ আর মহাপ্রাণ অধ্যক্ষ বিদ্যাসাগর। বিদ্যাসাগরই পুরোত যোগাড় করে দিয়েছেন বিয়ের, নিমন্ত্রিতদের খাওয়াবার খরচ দিয়েছেন, নববধূকে দিয়েছেন মূল্যবান উপহার।
যোগেনের বাড়িতে প্রায়ই আসেন বিদ্যাসাগর। মজার-মজার গল্প বলে হাসিয়ে যান সবাইকে। বিষাদভার লাঘব করেন। কঠোর ব্রতোদ্‌যাপনের প্রতিজ্ঞাতে ধার যোগান। সে দিন এসে দেখেন, শিবনাথের কোলে সুশ্রী একটি মেয়ে।
'কে এই মেয়ে?'
'নাপিতদের মেয়ে। আমাদের পাড়াতেই থাকে। দাদা বলে আমাকে।'
'বা, বেশ মেয়েটি তো?' একটু আদর করতে হাত বাড়ালেন বিদ্যাসাগর।
'কিন্তু জানেন কি?' কণ্ঠ প্রায় রুদ্ধ হয়ে এল শিবনাথের : 'ও বিধবা।'
বিধবা? যেন বাজ পড়ল ঘরের মধ্যে। স্তম্ভিতের মত দাঁড়িয়ে রইলেন বিদ্যাসাগর। যন্ত্রণায় মুদ্রিত করলেন দু'চোখ। শিবনাথ দেখতে পেল, বড়-বড় জলের ফোঁটা গড়িয়ে পড়ছে গাল বেয়ে।
হঠাৎ দু'বাহু বাড়িয়ে অবোলা শিশুটাকে টেনে নিলেন বুকের মধ্যে।
শিবনাথ বললে, ওকে ফের বিয়ে দেবার জন্যে ওর মাকে বোঝাচ্ছি ক'দিন থেকে।
'কিছু ভাবতে হবে না। ওকে আগে বেথুন ইস্কুলে ভর্তি করে দাও। খরচ-পত্র যা লাগে সব আমি দেব। তার পর একদিন পালকি ভাড়া করে ওকে আর ওর মাকে পাঠিয়ে দিও আমার বাড়িতে, আমার মা'র কাছে।'
বিদ্যাসাগর কি সিদ্ধ নয়?

শিবনাথ যখন ব্রাহ্ম হয়, তখন তার বাবা কেঁদেছিলেন। বলেছিলেন বিদ্যাসাগরকে, 'মানুষ যেমন যমকে ছেলে দেয়, তেমনি আমি কেশবকে ছেলে দিয়েছি।'
শুনে স্থির থাকতে পারেননি বিদ্যাসাগর। বাপের দুঃখে কেঁদেছিলেন আকুল হয়ে।
শিবনাথকে বাড়ির থেকে বের করে দিয়েছে বাপ। ত্যাজ্যপুত্তর করেছে। স্ত্রী আর ছোট্ট একটি মেয়ে নিয়ে আলাদা বাসা করে আছে কায়ক্লেশে। স্কলারশিপের টাকা ক'টিই ভরসা।
পথে-ঘাটে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে দেখা হয় মাঝে-মাঝে। মুখ ফিরিয়ে নেন না বিদ্যাসাগর। বরং মুখ বাড়িয়ে গলা নামিয়ে জিগগেস করেন আলগোছে, 'হ্যাঁ রে, কেমন করে চলে?'
শুধু বাপের কষ্টেই কাঁদেন না, ছেলের কষ্টেও কাঁদেন। প্রায়ই খোঁজ নিতে আসেন। এটা-ওটা পরামর্শ দেন। শিবনাথ যদি কখনো অর্থ সাহায্য চেয়ে বসে, বোধ হয় তারই জন্যে নীরবে অপেক্ষা করেন।
কত ছেলেবেলা থেকে ভালোবাসেন শিবনাথকে। যখনই তাদের বাড়ি যান, দু'আঙুলের চিমটেতে শিবনাথের ভুঁড়ির মাংস টেনে ধরেন। ওটাই তাঁর আদরের চেহারা। সে আদরের ভয়ে পালিয়ে বেড়ায় শিবনাথ। কিন্তু বিদ্যাসাগর ঠিক তাকে ধরে আনেন। তার ভুঁড়িতে চিমটি না কাটতে পেলে বিদ্যাসাগরের শান্তি নেই।
তখন তো বাপে-ছেলে একসঙ্গে ছিল। এখন ছেলে একা, বাপ একা। দুয়ের দুঃখেই কাঁদেন বিদ্যাসাগর। একবার এ বাড়ি যান, আরেক বার ও বাড়ি।
কাঁদবার আগে পর্যন্তই বিচার। একবার কান্না এসে গেলে বিচার ধুয়ে যায়।
বিদ্যাসাগরের কাছে কত লোক এসে গাল পাড়ে শিবনাথকে। ব্রাহ্মসমাজে ঢুকেছে বলেই সবাইর রাগ। কিন্তু বিদ্যাসাগর বলেন, 'যাই ও করুক, ফেলতে পারব না ওকে। যাই বলো, ওকে বুকে রাখলে আমার বুক ব্যথা করে না।'
সেই শিবনাথের ঘরে আরেক জন তার বন্ধু এসেছে। বন্ধুটিও শিবনাথের মত সমাজদ্রোহী, বিধবা বিয়ে করেছে, আর শিবনাথের মতই পিতৃ-পরিত্যক্ত। খুব ধনী বাপের ছেলে, এখন একেবারে দুরবস্থার চরম। তার উপর রোগ হয়েছে মারাত্মক। বিধবা-বিয়ে ঘটাতে হাত ছিল শিবনাথের, তাই এখন ত্যাগ করতে পারল না বন্ধুকে। সপুত্রকলত্র আশ্রয় দিল। ডাক্তার ডাকাল। কিন্তু কিছুই সুরাহা হল না। তখন বন্ধু বললে, বাবাকে একটা খবর দাও। তিনি ক্ষমা না করলে আর সারব না আমি। তার বাবার সঙ্গে পরিচয় নেই শিবনাথের। কি করে তাঁকে ধরে! নিজে গেলে হয়তো উলটো ফল হবে। বন্ধুর অন্তিম কামনা পূর্ণ হবে না।
তখন অগতির গতি, বিদ্যাসাগরকে গিয়ে ধরল শিবনাথ। বিদ্যাসাগর তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন। 'জানো ও ছোকরার চরিত্র? ওর সব অতীত কীর্তি?'
সব জানে শিবনাথ। মুখ বুজে হেঁট হয়ে রইল। বুঝল, বৃথা, আশালতা দগ্ধ হয়ে গেল সূর্যতেজে।

'ওকে সাহায্য করবে না আর কিছু! উলটে ওকে চাবকে দেওয়া উচিত।'
সেই বিরাট আননের উপর ক্রোধের রুদ্ররঙ্গ দেখতে লাগল শিবনাথ। নিরুপায়ের মত প্রণাম করল বিদ্যাসাগরকে। চলে যাবার আগে ফিরে দাঁড়িয়ে বললে, 'একজন মৃত্যুপথযাত্রীর শেষ ইচ্ছাটি পূর্ণ করতে পারলাম না।'
মহামানুষটি নড়ে উঠলেন। ধমক দিলেন শিবনাথকে। 'বোস্। আমি তোকে চলে যেতে বলেছি? হ্যাঁ, সেই কাল সকালের আগে তো আর কিছু হবে না? যা, কাল সকালেই নিয়ে যাব তার বাপকে। আর, শোন, দাঁড়া, এই ক'টা টাকা নিয়ে যা।' শিবনাথের হাতে ক'টা টাকা গুঁজে দিলেন বিদ্যাসাগর: 'তুই একা কদ্দিন চালাবি? এই নে। দেখিস ওর স্ত্রী আর সন্তান যেন কষ্টে না পড়ে।'
বলো, সিদ্ধ কি নয় বিদ্যাসাগর? যে মাতৃভক্ত সে কি সাধক নয়? মা বলেছেন ভাইয়ের বিয়েতে হাজির হতে, যেমন করেই হোক, দামোদর সাঁতরেই চলে গেলেন। তার পর মা যখন চলে গেলেন, বাড়ি-ঘর ছেড়ে চলে গেলেন নির্জনে। আর কিছুর জন্যে নয়, মা'র জন্যে কাঁদতে বুক ভরে। পরের জন্যে যে কাঁদে সে তো পরমের জন্যেই কাঁদে। পরই তো পরম। পরেশও যে, পরমেশও সে-ই। ব্রহ্মই তো পরব্রহ্ম। ব্রহ্মের জন্যে যে কাঁদে সেই তো সিদ্ধ। বিদ্যাসাগর বললেন রামকৃষ্ণকে, 'কিন্তু জানেন তো, কলাইবাটা সেদ্ধ হলে শক্ত হয়ে যায়।'
'তুমি তেমনি নও গো। তুমি দরকচা-পড়া পণ্ডিত নও। শকুনি খুব উঁচুতে ওঠে, কিন্তু তার নজর ভাগাড়ের দিকে। যারা শুধু পণ্ডিত, শুনতেই পণ্ডিত, এদিকে কামকাঞ্চনে আসক্তি, তারা শকুনির মতই পচা মড়া খুঁজছে। তুমি সে রকম নও। বিদ্যার ঐশ্বর্য—দয়া ভক্তি বৈরাগ্য খুঁজছ। তুমি সিদ্ধ নও তো কে সিদ্ধ?'
এক জ্ঞানময় পুরুষ দেখছেন এক আনন্দময় পুরুষকে।
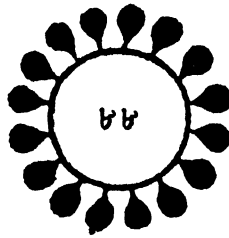
'ছেলেরা মেলায় যাবার বায়না ধরেছে,' হেনরিয়েটা কাঁদো-কাঁদো মুখে বললে ঘরে ঢুকে, 'কিন্তু হাতে মোটে আমার তিন ফ্রাঙ্ক—'
তখনকার হিসেবে দেড় টাকার কাছাকাছি।
মধুসূদন তাকাল একবার শূন্য চোখে। বললে, 'শুধু আজকের দিনটা অপেক্ষা করো।'

'কত দিন-রাতই তো গেল এমনি অপেক্ষা করে-করে। তুমি কি মনে করো তোমার দেশের লোক কেউ তোমাকে সাহায্য করবে?'

সে আশা ছেড়েছে মধুসূদন। সাহায্য দূরের কথা, পাওনা টাকাই পাঠাচ্ছে না সরিকেরা। এদিক-সেদিক করে চার হাজার টাকা পাওনা। একটি কপর্দকেরও দেখা নেই।

সরিক তো নয় কালসাপ। তাদের কথা ভাবছে না মধুসূদন। দেশে কত-কত মানী-গুণী। কত-কত টাকার আণ্ডিল। তাদের কথাও ভাবছে না। হেন লোক নেই যার সঙ্গে চেনাশোনা নেই মধুসূদনের। এক-এক করে মনে করতে লাগল মুখগুলো। একটা মুখও এমন নয় যে মন উন্মুখ হয়। বিত্তবান তো অনেক আছে, কিন্তু চিত্তবান কোথায়!

না, একজন বোধ হয় আছে।

একজন নয়, দুজন। একজন ঈশ্বর, আরেকজন ঠিক সেই ঈশ্বরের নিচেই।

তারই জন্যে অপেক্ষা করতে বলছে স্ত্রীকে।

এমনিতে অস্থিরমতি মধুসূদন, মুহূর্তের বশে কাজ করতে গিয়ে অনেক ভুল সে করেছে জীবনে, অনেক নির্বুদ্ধিতা, কিন্তু এবার পরিত্রাতা খুঁজতে গিয়ে ভুল করেনি এতটুকু। এত দিনে একটি স্থিরবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছে। অন্তত এই একবার।

'শুধু আজকের দিনটা—'

'কি আছে আজকে?'

'আজকে ডাক আসবার দিন। আজ ঠিক চিঠি আসবে। একটা শুভসংবাদ এসে যাবে কিছু।'

'যদি না আসে?'

'যদি না আসে!' চেয়ার ছেড়ে উঠে পায়চারি করতে লাগল মধুসূদন: 'তাহলে আমি সটান জেলখানায়, আর তোমরা, তুমি আর ছেলেমেয়েরা, কোনো একটা অনাথ-আশ্রমে।'

জামার হাতায় চোখ মুছল হেনরিয়েটা।

'কিন্তু, কান্নাটা শেষ পর্যন্ত স্থায়ী নাও হতে পারে। কেননা টাকার জন্যে যাকে এবার লিখেছি—'

'কে সে?'

'সমস্ত বাংলা দেশে সে শুধু একজনই। আর্য ঋষির মত জ্ঞানী, ইংরেজের মত কর্মোৎসাহী আর বাঙালী মায়ের মত কোমলহৃদয়! এখানেও যদি না হয়! না, না, হতেই হবে, নিজে বিপন্ন হয়েও আসবে বিপদুদ্ধারে। আমি নদী-নালার কাছে যাইনি, গিয়েছি সমুদ্রের কাছে।'

দরজার কড়া নড়ে উঠল।

ঐ এলো বুঝি সেই সমুদ্রের মুক্ত হাওয়া! বাধাহীন স্বাধীনতার শুভ্রতা।

আদালতের বেলিফ। দরজা একটু ফাঁক করে উঁকি মেরে দেখল হেনরিয়েটা।

ক্ষিপ্র হাতে ফের বন্ধ করে দিল। ক্রোক করবার মত আর নেই কোনো মালামাল। এবার হাতে-হাতে গ্রেপ্তার করতে এসেছে। আবার নড়ে উঠল কড়া।

'কে?'

'চিঠি।'

উল্লাসে লাফিয়ে উঠল মধুসূদন। 'বলিনি, চিঠি আসবে দেশ থেকে?' ত্বরিত হাতে খুলে ফেলল দরজা। 'কোথাকার চিঠি?'

তোমাকে বলিনি। সাগরের মত প্রাণ! বাঙালী মায়ের মত হৃদয়! আশ্চর্য, এমন আকাঙ্ক্ষাও ফলে মানুষের জীবনে! এই দেখ। পনেরো শো টাকার ড্রাফট পাঠিয়েছে বিদ্যাসাগর।

শুধু কি সেই একবার? আরো বহুবার টাকা পাঠালেন। জড়িয়ে পড়লেন ঋণ-জালে। শেষ পর্যন্ত ব্যারিস্টারি পাশ করিয়ে ছাড়লেন।

সেই মাইকেল দেশে ফিরছে এত দিনে। বিদ্যাসাগর তার জন্যে পছন্দসই বাড়ি ভাড়া করে রেখেছেন। বিলেত-ফেরতের মত উপযুক্ত করে সাজিয়ে দিয়েছেন জিনিসে-আসবাবে। কিন্তু সে-বাড়িতে উঠল না মাইকেল। গেল স্পেন্স হোটেলে।

অবজ্ঞা দেখে অভিমান করলেন না বিদ্যাসাগর। নিজে থেকে আনতে গেলেন ডেকে।

এক কথায় ফিরিয়ে দিল মাইকেল। ঐ নেটিভ পাড়ায় ঐ নোংরা পরিবেশের মধ্যে সে থাকবে! বিলেত থেকে ব্যারিস্টার হয়ে আসা ব্যর্থ করে দেবে এমন করে!

বিষণ্ণ মনে ফিরে এলেন বিদ্যাসাগর। শূন্য সাজানো বাড়ির দিকে তাকালেন শূন্য চোখে।

তবু কি সেই বাঙালী মায়ের হৃদয় শুষ্ক হয় কখনো? কত বাধা-বিপদ ফিরতে লাগল পদে-পদে—এমন কি, হাইকোর্টেই ঢুকতে পাচ্ছে না মাইকেল। চিরযোদ্ধা বিদ্যাসাগরের ডাক পড়ল। গাঁয়ের নামে যাঁর নাম—আর কে আছে অমন বীরসিংহ! হটিয়ে দিলেন সব বাধা-নিষেধ, ঢুকিয়ে দিলেন হাইকোর্টে।

কর্মে ঢুঢু, শুধু মুখেই কৃতজ্ঞতা। শুধু চলচিত্তের চলচ্চিত্র। স্থিরদ্যুতি লক্ষ্য নয়, ধাবিত স্খলিত উল্কাপিণ্ড।

টাকার কথাটা একবার মনে করিয়ে দিলেন বিদ্যাসাগর। টাকা? কত চাই? দুই-দশ-কুড়ি হাজার টাকা এই এসে পড়ছে হাতের মুঠোয়। মধুসূদনের জন্যে কত ধার হয়েছে বিদ্যাসাগরের?

মুখে শুধু বড়-বড় কথা। যত বহ্বাস্ফোট। হাতে টাকা এলে আর ধার শোধ নয়, নির্বিরোধ স্বেচ্ছাচার। ছন্দে যেমন অবন্ধন ব্যয়ে তেমনি উড়নচণ্ডি।

শুধু বিদ্যাসাগরেরই ঋণ বাড়ে। তাঁর সংস্কৃত প্রেসের দুই-তৃতীয়াংশ বিক্রি হয়ে যায়। তবু কি বাঙালী মায়ের হৃদয় নিষ্ঠুর হয়, নীরস হয়?

বলো, এ কোন সাধনায় সিদ্ধ বিদ্যাসাগর? রামকৃষ্ণ কি আর ভুল বলেন?

এই মধুসূদনই রামকৃষ্ণের কাছে কটি কথা চেয়েছিল। শান্তির কথা, আশ্বাসের

কথা। মা-কালী রামকৃষ্ণের মুখ চেপে ধরেছিলেন, ধর্মত্যাগীর সঙ্গে বলতে দেননি কথা।
কিন্তু কথার চেয়ে গান বড়। ধর্মের চেয়ে বড় ঈশ্বরকরুণা।
সেই করুণায় বিগলিত হল রামকৃষ্ণ। করুণার ধারা নেমে এল সুরস্রোতে। কথা বলতে দিচ্ছেন না, কিন্তু গান তো কথা নয়, গান গাইতে দোষ কি। আর এ গান তো অন্যের রচনা, রামপ্রসাদের রচনা। রামকৃষ্ণ গান ধরল। আর, মধুসূদনের কৃতজ্ঞতা নেমে এল অশ্রুবর্ষণে।
আমি অমিত্রাক্ষর লিখি, কিন্তু হে অক্ষর, তুমি তো অমিত্র নও।
'তুমি মিথ্যেবাদী, তুমি প্রবঞ্চক।' গর্জন করে উঠলেন বিদ্যাসাগর: 'ভদ্রলোকের ছেলে বলে এসে আমার সঙ্গে এই চাতুরীটা করলে?'
সামান্য একজন পুলিশ সাব ইন্‌স্পেকটর। ভয়ে-দুঃখে দাঁড়িয়ে আছে বিমূঢ় হয়ে। কী যে অপরাধ করেছে বুঝতে পারছে না।
অপরাধের মধ্যে টাকা ধার নিয়েছিল বিদ্যাসাগরের কাছ থেকে। বিপদে না পড়ে কি আর কেউ কর্জ করে! আর, সে কী নিদারুণ বিপদ। ছ মাসের জেলের হুকুম হয়েছে, চাকরিরও দফা রফা। এখন হাইকোর্টে মোশন করতে হবে। মনোমোহন ঘোষকে ব্যারিস্টার দেবার ইচ্ছে, কিন্তু তার সাতশো টাকা ফি। বাড়িতে লেখা হয়েছে, এখনো এসে পৌঁছয়নি টাকা।
সুতরাং মুরুব্বি ধরে চলো বিদ্যাসাগর। অনুপায়ের উপায়, অশরণের আশ্রয়।
'কি করতে হবে তাই বলো না।'
মনোমোহন ঘোষকে আপনি শুধু একটা চিঠি লিখে দিন যেন বিনা ফি-তে কাজটি করে দেয়। হ্যাঁ, আজকেই দিন মামলার। হপ্তা খানেকের মধ্যেই টাকা এসে যাবে বাড়ি থেকে, তখন দিয়ে দেব ঘোষ-সাহেবকে—নির্ঘাৎ দিয়ে দেব।
'বাড়ি কোথায়?'
নাটোর। পুলিশে চাকরি করে, বিরুদ্ধ দল মিথ্যেমিথ্যি ফাঁসিয়ে দিয়েছে। জেলটা রদ করাতে না পারলে একটা পরিবার ছারখারে যাবে। শুধু যদি একটা সুপারিশ লিখে দেন—
চুপচাপ কতক্ষণ ভাবলেন বিদ্যাসাগর। বললেন, 'এ কর্ম আমার দ্বারা হবে না। এক পা জেলে এক পা বাইরে এমন লোকের টাকা বাকি রেখে কাজ করতে বলা অবিচার করা। মামলায় যদি হার হয়? জেলের হুকুম যদি বহাল থাকে? না বাপু, অসম্ভব, এমনটি পারব না কিছুতেই।'
তবে আমি যাই কোথা? শুনেছি যার কেউ নেই তার বিদ্যেসাগর আছে। যার বিদ্যেসাগরও নেই সে যাবে কোন দুয়ারে?
কাগজ-কলম টেনে নিলেন বিদ্যাসাগর। ঘসঘস করে লিখতে লাগলেন, মাই ডিয়ার ঘোষ—
হঠাৎ থেমে পড়ে বললেন, 'অসম্ভব। এ কর্ম হবে না আমার দ্বারা। অন্যায় অনুরোধ করি কি করে?'

দারোগা কেঁদে ফেললে। বললে, 'তা হলে আমি জেলেই যাব?'
একটা তীর যেন এসে বিদ্ধ করল বিদ্যাসাগরকে। চোখের কোণ ভিজে উঠল। জানা ছিল, তবু ব্যাঙ্কের খাতা খুলে আরেকবার দেখলেন এক পয়সাও মজুত নেই। তবু, আশ্চর্য, একটা চেক কাটলেন। সাত শো টাকার চেক। বললেন, 'এই চেক নিয়ে গিয়ে ঘোষকে দাও। আর বলো, কাল সাড়ে এগারোটার আগে যেন ব্যাঙ্কে না পাঠায়। যে করে হোক আজকের দিনের মধ্যে সাত শো টাকা ব্যাঙ্কে জমা করে দেব।'
হাইকোর্টে খালাস পেয়েছে দারোগা। ধার শোধ করতে টাকা নিয়ে এসেছে। এক আধলা কম নয়, পুরো সাত শো টাকা। সাত দিনের মধ্যে ধার শোধ দেবার কথা ছিল, চার দিনের দিনই পেঁছে দিয়েছে টাকা। সহাস্য মুখে প্রণাম করে উঠেছে। কিন্তু হঠাৎ এ কী বিস্ফোরণ! তুমি মিথ্যেবাদী, তুমি প্রবঞ্চক, তুমি অভদ্র—
'তা ছাড়া আবার কি।' বিদ্যাসাগর তেমনি গরজাতে লাগলেন : 'তুমি না বলেছিলে তুমি পুলিশে কাজ করো?'
'আজ্ঞে হ্যাঁ—'
'মিথ্যে কথা। একশো বার মিথ্যে।'
'সে কি কথা? আপনি খোঁজ নিন, খোঁজ নিলেই জানতে পারবেন। সামান্য চাকরি, মিথ্যে বলতে যাব কেন?'
'মিথ্যে ছাড়া আর কী বলব!' একটু যেন প্রশমিত হয়েছেন বিদ্যাসাগর। কণ্ঠস্বরে নির্জলা ক্রোধের পরিবর্তে এসেছে যেন একটু অভিমানের ঝাঁজ : 'এত দিনে কত লোক "দেব" বলে টাকা নিয়ে আর দিল না। অপারগের কথা ছেড়ে দিই, কত সম্পন্ন বড়লোকও টাকা ধার নিয়ে মেরে দিলে। বন্ধুবান্ধবের তো কথাই নেই। যে দেশে নিলে আর দিতে চায় না, সে দেশের লোক হয়ে, শুধু তাই নয় পুলিশের দারোগা হয়ে, পুরোপুরি ফিরিয়ে দেবে, এ বিশ্বাস করি কি করে? তা ছাড়া সাত দিনের কড়ার করে চতুর্থ দিনে ফেরৎ দেবে এ কল্পনার অতীত। তবে তোমাকে মিথ্যাবাদী বলব না তো কি! তোমার খালাস পাওয়া উচিত হয়নি। সাত দিনের কড়ারে টাকা নিয়ে চার দিনের দিন যে শোধ দেয় সে পুলিশের দারোগাগিরি করে জেলে যাবে না তো কে যাবে!'
কাউকে চিঠি লিখতে বসেই প্রথমে লেখেন : 'শ্রীহরিঃ শরণম্'। বাজে বা বেফাঁস কথা লেখবার লোক নন বিদ্যাসাগর। কিন্তু সংসারে বাস্তবচক্ষে যদি কারু শরণ নিয়ে থাকেন, তবে সে বাপ-মা। পাকপাড়া রাজবাড়ির হডসন সাহেবকে দিয়ে দুখানা ছবি করিয়ে নিয়েছেন—তাদের সামনে দিনারম্ভের প্রথম প্রণামটি না রেখে জলস্পর্শ করেন না বিদ্যাসাগর। ওই তাঁর হর-গৌরী। তাঁর রাম-সীতা। তাঁর লক্ষ্মী-নারায়ণ।
'পাকপাড়া রাজবাড়িতে ভালো এক সাহেব পোটো এসেছে, মা,' ভগবতী দেবীকে বললেন বিদ্যাসাগর, 'ইচ্ছে করছে তোমার একখানা ছবি আঁকিয়ে নি।'
'দূর, আমার ছবি কী হবে! ছি-ছি!' ভগবতী দেবী মুখ ফিরিয়ে নিলেন।

'ছবি তো তোমার জন্যে নয়, ছবি আমার জন্যে। যখন যেখানে থাকি, সকাল-সন্ধে থাকবে আমার চোখের সামনে। প্রাণটা যখন কেমন করে উঠবে তখন একবার দেখব চোখ ভরে।'

রামকৃষ্ণের সেই কথা। যাকে দেখতে এসেছিস, চোখ মেলে চোখ ভরে দ্যাখ মা'র মুখখানি। ঈশ্বরের মুখের আভাস যদি কোথাও থাকে তবে এই মা'র মুখে।

'না বাপু, সাহেবের সামনে বসে ছবি আঁকাতে পারবো না।' ভগবতী দেবী আবার পাশ কাটাতে চাইলেন।

'না, মা, সে খুব ভালো লোক, আমাকে খুব ভালোবাসে, তার সামনে বসতে দোষ নেই।'

একটু বোধ হয় নরম হলেন ভগবতী। বললেন, 'তা সে এখানে আসবে তো?'

'না মা, তোমাকে পাকপাড়ার রাজবাড়িতে গিয়ে বসতে হবে। সেখানে সে আড্ডা করেছে। সে আড্ডা ভেঙে এখানে আনতে গেলে ছবি হয়তো ভালো হবে না—'

পুত্রের মুখের দিকে তাকালেন ভগবতী। বললেন, 'তোর যা ইচ্ছে তাই কর। নিন্দে হলে লোকে তো আর আমাকে নিন্দে করবে না, তোরই নিন্দে করবে। বলবে, বিদ্যাসাগর মাকে পাকপাড়া ছবি তুলতে নিয়ে গেছে।'

লোকের নিন্দাকে বিদ্যাসাগর যেন কত ভয় করে! আমি মাতৃবন্দনা করব তায় লোকনিন্দা!

সেই মা'র মৃত্যুতে দশ দিক শূন্য হয়ে গেল বিদ্যাসাগরের। বালকের মত কাঁদতে লাগলেন অঝোরে। মৃত্যুর সময় কাছে থাকতে পাননি, সেবা করতে পাননি, দুটো কথা শুনতে পাননি, এ দুঃখ রাখবার জায়গা নেই। নির্জনে চলে গেলেন, ফিরতে লাগলেন দীনহীনের মত। পায়ে জুতো নেই, মাথায় ছাতা নেই, বেশে-বাসে পরিচ্ছন্নতা নেই। থাকেন একাহারে, স্বপাকে নিরামিষ খেয়ে। নিতান্ত অসুস্থ হয়ে না পড়লে সাহায্য নেন না দিনময়ীর। কঠিন মেঝের উপর শুয়ে ঘুমোন। আর নিরবচ্ছিন্ন ভাবে তদ্গত চিত্তে মা'র গুণাবলীর ধ্যান করেন।

এমনি এক বছর। একটানা এক বছর।

কত বছর তার পর চলে গেছে। এক দিন কি কথায়-কথায় এক বন্ধু হঠাৎ তাঁর মা'র গুণের কথার উল্লেখ করলেন। যেই শোনা, কাতর কান্নায় ফেটে পড়লেন বিদ্যাসাগর।

বন্ধু তো অপ্রস্তুত। বিদ্যাসাগর অত্যন্ত পীড়িত, দেখা করতে এসেছিলেন। কথাচ্ছলে উঠে পড়েছিল ভগবতী দেবীর প্রসঙ্গ। কিন্তু ফল এমন হবে অনুমান করতে পারেননি। এ যে একেবারে শোকসমুদ্র!

'এত কষ্ট দেব জানলে ও-কথা পাড়তুম না।'

'কষ্ট? তুমি আমাকে কষ্ট দিলে কোথায়? তুমি তো আমার বন্ধুর মত কাজ করলে। তোমার জন্যে আমার মায়ের কথা মনে পড়ল, মায়ের নামে দু ফোঁটা চোখের জল ফেললাম। এত দুর্দশা, সব সময়ে বাপ-মাকে স্মরণ করতে পারি কই?'

এই বিদ্যাসাগর। সাগরের তুলনা সাগর। 'সাগরং সাগরোপমং'।
এই মাতৃসাধক কি সিদ্ধ নয়? নয় কি তপঃপরায়ণ ঋষি?
রামকৃষ্ণ কী করতেন? যত দিন চন্দ্রমণি জীবিত ছিলেন, রোজ সকালে গিয়ে প্রণাম করে আসতেন। বৃন্দাবনে থেকে যাবেন ভেবেছিলেন মায়ের কথা মনে পড়তেই বৃন্দাবন ভেসে গেল। তার পর মা যখন গত হলেন তখন রামকৃষ্ণের সে কী কান্না! রামকৃষ্ণের মন্ত্রই তো মা! মুখেই হোক আর মনেই হোক মাকে যে ডাকে সে তো ভগবতীকেই ডাকে। বিদ্যাসাগরের মা-ও তাই ভগবতী!
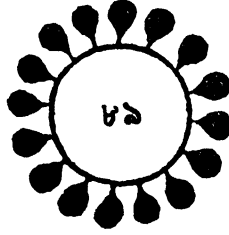
'ব্রহ্ম যে কি মুখে বলা যায় না।' বিদ্যাসাগরকে বলছেন রামকৃষ্ণ : 'সব শাস্ত্র-দর্শন এঁটো হয়ে গেছে। তার মানে মুখে পড়া হয়েছে, মুখে উচ্চারণ হয়েছে। কিন্তু একটি জিনিস কেবল এঁটো হয়নি। সে ব্রহ্ম। সে অনুচ্ছিষ্ট।'
আনন্দে লাফিয়ে উঠলেন বিদ্যাসাগর। 'বা, এটি তো বেশ কথা। এ কথা তো কোথাও শুনিনি! একটি নতুন কথা শিখলাম আজ।'
ব্রহ্ম অনুচ্ছিষ্ট।
একেবারে মুখের মধ্যে এনে ছেড়ে দিয়েছেন। ঘনিষ্ঠ আস্বাদের মধ্যে। রসনার রসাশ্রয়ে। কিন্তু সাধ্য নেই দন্তস্ফুট করো। মুখ খুলেছ কি উড়ে পালিয়েছে!
বাক্যের ব্যর্থ অলঙ্কারে ভাবস্বরূপের বন্দনা চললেও বর্ণনা চলে না। ভূষণ দিয়ে কি রূপের উদ্ঘাটন হয়?
'কিন্তু যারা ব্রহ্মজ্ঞানী?'
'তারা নুনের পুতুল। নুনের পুতুল সমুদ্র মাপতে গিয়েছিল। কত গভীর জল তার খবর দেবে। খবর দেওয়া আর হল না। যাই নামা অমনি গলে যাওয়া। কে কার খবর দেবে?'
মানুষ তো খুব বাহাদুর, তাই মনে করে আমরা তাঁকে জেনে ফেলেছি। সেই সে পিঁপড়ের গল্প। একটা পিঁপড়ে চিনির পাহাড়ে বেড়াতে গিয়েছিল। এক দানা খেয়ে পেট ভরে গেল। আরেক দানা মুখে করে বাসার দিকে নিয়ে যাচ্ছে। যাবার সময় ভাবছে এবার এক সময় এসে গোটা পাহাড়টা নিয়ে যাব।
ব্রহ্ম তো নির্লিপ্ত, কিন্তু ভগবানটি কে?

যিনিই ব্রহ্ম তিনিই ভগবান। একজনেরই দু রকমের পোশাক। বাড়িতে থাকার মত শাদাসিধে চেহারার একজন, আরেকজন বাইরে বেরুবার মত একটু ফিটফাট সাজগোজ। একজন গুণাতীত, আরেকজন গুণময়। একজন ষড়্‌ভাবশূন্য, আরেকজন ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ।

আপনার কাকে বেশি পছন্দ, ব্রহ্মকে না ভগবানকে?

ব্রহ্ম যেন গতসর্বস্ব দেউলে। যেন নিষ্কিঞ্চন পথের ভিখিরি। চাল নেই চুলো নেই, যেন গাছতলায় আশ্রয়। যে বাবুর ঘর নেই দ্বার নেই, বিনি পয়সায় যে বিকিয়ে গেল, সে বাবু আর কিসের বাবু? ভগবান ষড়ৈশ্বর্যে প্রকাশমান। কত তাঁর প্রতাপ কত তাঁর প্রভুত্ব। তাঁর যদি ঐশ্বর্য না থাকত তা হলে কে মানত তাঁকে? আমার কিন্তু বাপু ব্রহ্মের চেয়ে ভগবানকে বেশি ভালো লাগে। ভগবান হচ্ছে রাজা, কিন্তু ব্রহ্ম হচ্ছে জমিহীন জমিদার।

'ঈশ্বর যদি সর্বভূতেই আছেন, তবে একজনকে বেশি শক্তি আরেকজনকে কম শক্তি দিয়েছেন এর মানে কি?'

যেমন আধার তেমনি শক্তির আয়তন। শক্তি আধারের নয়, শক্তি তাঁর। তিনিই বিকশিত হয়েছেন। যেমন দীপ তেমনি আলো। যেমন মাঠ তেমনি ফসল। যেমন কলসী তেমনি সরা।

সব তিনি। তোমাকে যখন কেউ মানে তখন জানবে তাঁকেই মানে। তোমাকে যে মানে তাতে তোমার শিং বেরিয়েছে দুটো?

শুধু পাণ্ডিত্যে কিছু নেই। তাঁকে জানবার জন্যেই বই পড়া, জনে-জনে জানাবার জন্যে নয়। পাণ্ডিত্য হচ্ছে ঢাকের বাদ্যি। পাড়া-পড়শীর ঘুম না ভাঙিয়ে ক্ষান্তি নেই। সারা গায়ে গয়না পরে একা-একা নিজের ঘরের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে কে কবে শান্তি পায়! বাইরের লোককে দেখাবার জন্যে রাস্তায় ছোটে। নামের পেছনে পদবীর পুচ্ছ নাড়ে। নিজের কথাটি পরের কথার উদ্‌ধৃতির স্তূপে চাপা দেয়।

শুধু কোটেশন আর ফুটনোট। জানতে তো জেনেছি কিছুই নয়, তবু কতটা পড়েছি তার ফর্দ নাও। আমার বাক্যের বহরে যদি একটু অবাক হও। যেমন ঐশ্বর্য দেখিয়ে সূক্ষ্মভাবে চাই তোমাকে একটু ঈর্ষালু করতে। শুধু নিজকে দেখানো। শুধু প্রাচীরপত্রে নিজের নামজারি।

যদি কাউকে জাহির করতে হয়, তাঁকে জাহির করো। যদি কাউকে সাব্যস্ত করতে হয় তাঁকে সাব্যস্ত করো।

'আমি ও আমার, এই দুটি অজ্ঞান। আমার বাড়ি, আমার টাকা, আমার বিদ্যা, আমার ঐশ্বর্য, এই যে ভাব এ হয় অজ্ঞান থেকে।' বললেন রামকৃষ্ণ : 'আর, হে ঈশ্বর, তুমিই সব কর্তা, আর এ সব তোমার জিনিস—বাড়ি-ঘর, ধন-দৌলত, পুত্র-পরিবার, বন্ধু-বান্ধব—আমার বলতে কেউ কিছু নয়, সব তোমার—এইটিই জ্ঞানভাব।'

লোকে বুঝেও বোঝে না। ঘা খায়, আবার উঠে বসে অহঙ্কারের বেড়া মেরামত

করে। সূর্য যে অস্তে চলেছে সেদিকে খেয়াল নেই। সারা দিন চলে শুধু এই মেরামতির টুকটাক। আত্মরতির ক্ষুদ্র-সংস্কার। দিন যায় দৈন্য আর যায় না। তার পর মৃত্যুর পর আবার খবরের কাগজে হেডলাইন দিতে ছোটে। হোমরা-চোমরা কে-কে এসেছিল শ্রাদ্ধ খেতে তার ফিরিস্তি ঝাড়ে। চাকরি থেকে পেনসন নিয়ে বাড়ি করে দরজার উপরে ছাড়া-চাকরির নেম-প্লেট ঝোলায়।

সন্ন্যাসী শুয়ে আছে লোহার কাঁটার উপর। সংসারী শুয়ে আছে অহঙ্কারের কণ্টকে।

বড় মানুষের বাগানের সরকার, বাগান যদি কেউ দেখতে আসে, খুব আড়ম্বর করে বলে, এ বাগানটি আমাদের, এ পুকুরটি আমাদের। কিন্তু কোনো দোষ দেখে বাবু যদি তাকে ছাড়িয়ে দেন, তখন তাঁর আম কাঠের সিন্দুকটাও নিয়ে যাবার তার যোগ্যতা থাকে না। বাবুর দারোয়ানকে দিয়ে সিন্দুকটা পাঠিয়ে দেয়।

হেসে উঠলেন বিদ্যাসাগর।

বদলি হবার সময় আদালতের ফার্নিচার ফেরৎ দাও। মায় দোয়াতদানটি পর্যন্ত।

ভগবান দুই কথায় হাসেন, বললেন আবার রামকৃষ্ণ। এক হাসেন, কবরেজ যখন রুগীর মাকে বলে, মা, ভয় কি? আমি তোমার ছেলেকে ভালো করে দেব। এই বলে হাসেন, আমি মারছি, আর এ কিনা বলে, বাঁচাবে! আর হাসেন, দু ভাই যখন দড়ি ফেলে জায়গা ভাগ করে, আর বলে, এ দিক আমার, ও দিক তোমার। এই বলে হাসেন, আমার জগৎ ব্রহ্মাণ্ড, আর ওরা বলছে, এ জায়গা আমার!

'আচ্ছা, তোমার কী ভাব?' ঈষৎ ঝুঁকে পড়ে জিগগেস করলেন বিদ্যাসাগরকে।

মৃদু-মৃদু হাসছেন বিদ্যাসাগর। বললেন, 'সে এক দিন আপনাকে গিয়ে বলব আমি চুপি-চুপি।'

আমার পরোপকারের ভাব। পর মানে ভগবান, উপ মানে সমীপস্থ, আর কার মানে কার্য। আমি এমন কার্য করব যাতে মুহূর্তে ভগবানের সমীপস্থ হয়ে যাব। ভগবানকে কি করে আনন্দিত করব? এত যাঁর আছে তাঁকে আর আমি কী দিয়ে খুশি করতে পারি? তাঁকে খুশি করতে পারি শুধু পরের অশ্রু মুছিয়ে। আপনি বলছেন ভগবান হাসছেন। আমি তো দেখি অহর্নিশি কাঁদছেন তিনি। কাঁদছেন ঘরে-ঘরে, পথে-পথে। শৃঙ্খলে নিপীড়িত হয়ে কান্নার ভাষা হারিয়ে, শাসনের কারাগারের দেয়ালে মাথা ঠুকে-ঠুকে।

তিনিই সব এ ভাবটুকু থাকলেই হল। তাঁর জন্যেই সব করছি, নিজের নাম-যশের জন্যে নয়, গীতায় একেই বলেছে নিষ্কাম কর্ম। গীতায় এমনিতেও যা, ওলটালেও তাই। এমনিতেই গীতা, ওলটালে তাগী। তাগী মানে ত্যাগী। ত্যজ ধাতুর উপর বিহিত প্রত্যয়ে তাগী-ও সিদ্ধ। মরা-মরা বলতে-বলতে যেমন রাম হয়েছিল তেমনি গীতা-গীতা বলতে-বলতে ত্যাগী হয়ে যাও। নিজের সমস্ত জ্ঞান-কর্ম বিদ্যাবুদ্ধি তাঁর হাতে, একটা বৃহত্তম সত্তার উপলব্ধিতে, উৎসর্জন করো। এর জন্যে চাই বিশ্বাস। সংশয়ের ঝড়ের রাতে প্রত্যয়ের দীপবর্তি। এর হদিস পণ্ডিতের বিচারে নেই, আছে একটি নির্মলসরল বালকের বিশ্বাসে।

ষড়দর্শনেও তাঁর দর্শন হয় না, দর্শন হয় শুধু বালকের পবিত্রতায়। সেই যে কথায় বলে না, স্বয়ং রামের সাগর বাঁধতে হল আর হনুমান রামনামের বিশ্বাসের জোরে ডিঙিয়ে গেল এক লাফে।

'যদি তাঁতে বিশ্বাস থাকে,' বললেন রামকৃষ্ণ, 'তা হলে পাপই করুক আর মহা-পাতকই করুক, কিছুতেই ভয় নেই।'

শক্তিতে হয় না, ভক্তিতে হয়। একের পর এক গান ধরলেন রামকৃষ্ণ। সুরে-সুরে সুধার হ্রদ নেমে এল মর্ত্যধামে।

তত্ত্ব অতি সোজা। শুধু একটি ভালোবাসার তত্ত্ব। যাতে ঐ ভালোবাসাটি আসে তার জন্যেই তাঁকে মা বলা। মা বড় ভালোবাসার জিনিস।

বিদ্যাসাগরের চোখ ছলছল করে উঠল। এ কি আর বিদ্যাসাগরকে বোঝাতে হবে? পুজা হোম যাগযজ্ঞ, ও-সব কিছুই নয়। আসল হচ্ছে ভালোবাসা। যদি একবার ভালোবাসা আসে তবে কী হবে ও-সব অনুষ্ঠানে? যদি ভালোবাসা হবে কী হবে আর বেশভূষায়? চোখে যদি জল আসে কাজলের রেখা আর থাকে না।

'তুমি যে সব কর্ম করছ এ সব সৎকর্ম।' বললেন রামকৃষ্ণ, 'যদি আমি কর্তা এই অহংকার ত্যাগ করে নিষ্কামভাবে করতে পারো তা হলেই হল। এই নিষ্কাম কর্ম করতে-করতেই ঈশ্বরে ভালোবাসা আসবে।'

একেক জনের একেক রকম পথ। কারু জ্ঞানে, কারু ভক্তিতে, কারু বা শুধু নিষ্কাম কর্মে। নিষ্কাম কর্মই নিয়ে যাবে মনস্কামের চরম তীর্থে।

'আমি বলছি, নিষ্কাম কর্মই হচ্ছে ঈশ্বরপ্রেম। আর ভালোবাসা হলেই দর্শন। আর সব দর্শনে চোখাচোখি হয় না, ভালোবাসাতেই মুখচন্দ্রিকা। হ্যাঁ গো, দেখা যায় ঈশ্বরকে। তার সঙ্গে কথা কওয়া যায়। এই যেমন তোমাকে দেখছি চোখের উপর চোখ রেখে। এই যেমন কথা কচ্ছি তোমার সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে।'

রাত হচ্ছে, এবার উঠবেন রামকৃষ্ণ।

'যা সব বলছি তোমাকে তুমি সব জানো।' হাসলেন রামকৃষ্ণ: 'তবে খবর নেই। বরুণের ভাণ্ডারে কত-কি রত্ন আছে, বরুণ রাজার খবর নেই।'

'তা আপনি বলতে পারেন।' হাসলেন বিদ্যাসাগর।

'অন্তরে সোনা আছে, কিন্তু একটু মাটি চাপা পড়ে আছে। যদি একবার সন্ধান পাও, তখন অন্য কর্ম কমে যাবে। শুধু খনন করবে সেই গহন অন্তর। ঐ দেখ না, গৃহস্থের বউর কত কর্ম, অন্তঃসত্ত্বা হলেই কর্ম কমে আসে। শেষে ছেলে হলে ছেলেটিকেই নিয়ে থাকে, ওটিকে নিয়েই নাড়াচাড়া করে। সংসারের কাজ আর শাশুড়ি করতে দেয় না।'

তাই শুধু এগোও। কর্মারণ্যে কুঠার হাতে করে কাঠ কাটতে বেরিয়েছ, কিন্তু শুধু চন্দন গাছ দেখেই থেমে যেও না। ঐ কুঠারে যে রুপোর খনি সোনার খনিও খুঁড়তে হবে। তবে থামছ কেন? এগোও, এগিয়ে যাও। মণি-মাণিক্যের ভাণ্ডার রয়েছে সামনে। অন্তরেই সেই আকর, অন্তরেই সেই রত্নাগার। থেমো না, আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে পোড়ো না—

এখনি অন্ধ বন্ধ কোরো না পাখা! অনেক তোমার সম্ভাবনা। অনেক তোমার প্রতিশ্রুতি। তোমার মাত্রাহীন যাত্রা। তোমার সংক্রান্তিহীন দিনপঞ্জী। প্রতিদিনই তোমার জন্মদিন।

'সব জানো, তবে খবর নেই।'

'তা কখনো হয়?'

'হ্যাঁ গো, অনেক বাবু জানে না চাকর-বাকরের নাম কি।' উঠলেন রামকৃষ্ণ। 'একবার যেয়ো বাগান দেখতে। রাসমণির বাগান। ভারি চমৎকার জায়গা।'

'যাবো বৈ কি। আপনি এলেন আর আমি যাবো না?'

'আরে আমার কাছে যাবে কি? ছি-ছি! বাগান দেখতে যাবে।'

'সে কি কথা!' একটু ক্ষুণ্ণ হলেন কি বিদ্যাসাগর? বললেন, 'ও কথা বলছেন কেন?'

'আরে, আমরা হচ্ছি জেলেডিঙি। খাল-বিলেও যেতে পারি, আবার বড় নদীতেও যেতে পারি। কিন্তু তুমি হচ্ছ জাহাজ, কি জানি যদি যেতে গিয়ে চড়ায় হঠাৎ ঠেকে যায়—'

সকলে হেসে উঠল।

রামকৃষ্ণ টিপ্পনি কাটলেন : 'তবে এ সময় যেতে পারে জাহাজ।'

ইঙ্গিত বুঝে নিলেন বিদ্যাসাগর। বললেন, 'হ্যাঁ, এটি বর্ষাকাল বটে।'

নবানুরাগের বর্ষা। নবানুরাগের সময় মান-অপমান থাকে না, বিদ্যা-অবিদ্যা থাকে না, শুধু জলে জলময়। তখন প্রেমের নদী, প্রেমের হাওয়া, প্রেমের ময়ূরপঙ্খী। প্রেমের অঞ্জনে তখন বিশ্বময় নিরঞ্জন।

দাঁড়িয়ে মূল মন্ত্র জপ করছেন রামকৃষ্ণ। ভাবারূঢ় হয়েছেন। হয়তো বিদ্যাসাগরের আধ্যাত্মিক মঙ্গলের জন্যে প্রার্থনা করছেন মা'র কাছে।

ভক্তসঙ্গে সিঁড়ি দিয়ে নামছেন ধীরে-ধীরে। নিজের হাতের মধ্যে একটি ভক্তের হাত ধরা। আগে-আগে বাতি-হাতে চলেছেন বিদ্যাসাগর।

শ্রাবণের কৃষ্ণপক্ষ। ষষ্ঠীর চাঁদ দেখা দেয়নি এখনো। বাগানে অন্ধকার। তার মধ্য দিয়ে বাতির একটি ক্ষীণ রেখা চলেছে ফটকের দিকে। সেই ক্ষীণ রেখার পিছনেই জ্যোতিষ্মান দিনকর। জগৎজোড়া অন্ধকারের মধ্যে দেখা যাচ্ছে কি সেই আশার ক্ষীণ দ্যুতি? সেই আভাসের পিছনে নব ভাস্করের আবির্ভাব?

ফটকের সামনে কে একজন গৌরবর্ণ সুপুরুষ দাঁড়িয়ে। বয়েস চল্লিশের কাছাকাছি। মাথায় পাগড়ি, দাড়িগোঁফ একমুখ। শিখ নাকি? অথচ পরনে ধুতি, পায়ে জুতো-মোজা। বাঙালী তো, গায়ে চাদর নেই কেন?

রামকৃষ্ণকে দেখামাত্রই পাগড়িশুদ্ধু মাথা পায়ে লুটিয়ে দিল।

'এ কি? তুমি? বলরাম? এত রাত্রে?'

'অনেকক্ষণ এসেছি। দাঁড়িয়েছিলাম এখানে।'

'সে কি? ভেতরে যাওনি কেন?'

'সবাই আপনার কথা শুনছেন, এর মধ্যে আমি গিয়ে কেন তালভঙ্গ করি?'

ঘরের মধ্যেই থাকি আর দরজার বাইরেই থাকি, আমি আছি আমার ভাবের ঘরের দরজা খুলে।

ঠাকুর গাড়িতে উঠলেন।

মাস্টারের কানে-কানে বললেন বিদ্যাসাগর, 'গাড়িভাড়া দেব?'

'আজ্ঞে না, ও হয়ে গেছে।'

বিদ্যাসাগর প্রণাম করলেন ঠাকুরকে। প্রত্যেকে, একে-একে।

গাড়ি চলল দক্ষিণেশ্বর। কিন্তু গাড়ির মধ্যে যিনি বসে তিনি চলেছেন কোথায়? তিনি চলেছেন জীবের ঘরে-ঘরে। কায়ে মনে আর বাক্যে একটি শুধু বাণী নিয়ে। সে বাণী ভালোবাসার বাণী। শুধু ভালোবাসা। ঈশ্বরকে ভালোবাসা। ঈশ্বরকে ভালোবাসলেই আর সকলকে ভালোবাসবে। এ জীবন পেয়েছ শুধু সেই ভালোবাসার আলো জ্বালাতে। গাঁথতে শুধু সেই একটি ভালোবাসার বরমালা।
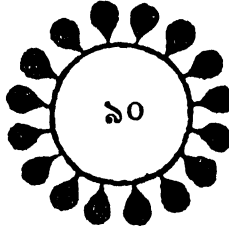
তুমি তোমার সিংহাসন ছেড়ে নেমে এলে। নেমে এলে আমার পর্ণকুটিরের ভগ্ন-দুয়ারে। আমার দুয়ারের চৌকাঠে ঠেকে যাবে বলে ফেলে এলে তোমার রাজমুকুট। আমি দীনদুঃখী বলে পরে এলে রিক্ততার সাজ। আমি ছোট বলে তুমিও ছোট হলে। আমি কি তোমাকে ছোট করেছি? তুমি নিজেই ছোট হয়েছ আমার জন্যে। আমি দুর্বল বলেই সুলভ হয়েছ। ভঙ্গুর বলেই হয়েছ সুকোমল। নইলে তোমাকে ধরি কি করে? রাখি কি করে বুকের নিবিড়ে?

কিন্তু, ছোট হয়ে শুনতে চাও তুমি বড় কথা। আমার ছোট মুখের বড় কথা। সে-কথাটির নাম ভালোবাসি। তোমাকে ভালোবাসতে পারলেই বিশ্বসংসার ভরে উঠবে, ঘুচে যাবে সব ঘর-গড়া ব্যবধান। এইটিই বড় কথা। এইটিই শোনবার জন্যে ছোট হয়ে কাছে এসেছ। ছোট হয়েছ বড় করবার জন্যে। রিক্ত সেজেছ মুক্তির পথ দেখাতে।

তুমি ভিখারি শিব। ভস্মমাখা। হাড়ের মালা গলায় দোলানো। তুমি নিষ্কিঞ্চন বলেই তো প্রবঞ্চিতের বন্ধু। সরল বলেই তো ডাক দিয়েছ সহজ হতে।

কিন্তু এ কেমনতরো শিব? কেমনতরো সাধু? থেকে-থেকে কেবল হাত পাতে। কেবল খেতে চায়।

দু পয়সার দেদো সন্দেশ কিনে দক্ষিণেশ্বরে এসেছে অঘোরমণি। থাকে কামারহাটিতে, দত্তদের ঠাকুরবাড়ির দক্ষিণের কোঠায়। রাধাকৃষ্ণের মন্দির। নিজের হাতে ভোগ রাঁধে অঘোরমণি। কলাপাতায় করে গোপালের জন্যে ভোগ সাজায়। গঙ্গাজলের ছোট গ্লাশ পাশে রেখে পিঁড়ি পাতে সামনে। এস, বসো, খাও—আহ্বান করে গোপালকে।

দুপয়সার দেদো সন্দেশের জন্যেই হাত বাড়ায় রামকৃষ্ণ। বলে, 'কই, কি এনেছ আমার জন্যে? দাও। ওকি, ঢাকছ কেন আঁচলে?'

ছি-ছি, অমন রোথো সন্দেশও কেউ চায় হাত বাড়িয়ে! লজ্জায় পিছিয়ে গেল অঘোরমণি। কত ভালো জিনিস এনে খাওয়াচ্ছে ভক্তেরা, কত তবক-দেওয়া, কত-বা রাংতা-জড়ানো। অঘোরমণির যেমন অদৃষ্ট, দুপয়সার দেদো সন্দেশের বেশি জোটেনি। তা, লুকিয়ে এনেছি আঁচলের তলায়, একেবারে আসামাত্রই খেতে চাওয়ার কী হয়েছে? একটু রয়ে-সয়ে ধীরে-সুস্থে চাইলেই তো হয়।

'দাও না গো! এনেছ তো লুকোচ্ছ কেন?'

কুণ্ঠিতভঙ্গিতে সন্দেশগুলো বের করে দিল অঘোরমণি। তুচ্ছ জিনিস নিয়ে এসেছি তোমার জন্যে, কিন্তু তুমি কি আমার নৈবেদ্যের দৈন্য ধরবে? দেখবে না কি আমার নিবেদনের ভাবটি? তুমি কি ভাবে নও? তুমি কি উপকরণে?

স্বচ্ছন্দে মুখে পুরল সেই দেদো সন্দেশ। সানন্দে খেতে লাগল রামকৃষ্ণ। বললে, 'তুমি গরিব মানুষ, পয়সা খরচ করে বাজার থেকে সন্দেশ আনো কেন?'

ন বছরে বিয়ে হয়েছিল, তেরো বছরে বিধবা হয়েছে। অল্প কিছু ধানজমি পেয়েছিল শ্বশুরঘর থেকে, বিক্রি করে তারই সামান্য আয়ে দিন চালায়। দিন কি আর চলে? দিন না চলে তো মনও চলে না। মন অচল হয়ে পড়ে থাকে বিগ্রহের পদমূলে।

গোপালমন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছে অঘোরমণি। সমস্ত সৃষ্টির যে সম্রাট তাকে সে সন্তানরূপে কাছে টেনে এনেছে। দিন কাটাচ্ছে শুধু মন্দিরের তদারকে। ফুল তুলছে, মালা গাঁথছে, চন্দন বাটছে, বাসন মাজছে, ঝাঁটপাট দিচ্ছে। তারপর কোনোরকমে নিজের স্নানাহার সেরে বাকি সময় শুধু জপযজ্ঞ। শুধু মানসনামগুঞ্জন। এমনি এক-আধ দিন নয়, একটানা তিরিশ বছর।

'নারকোলের নাড়ু করবে নিজের হাতে, তাই আনবে দুটো-একটা।' কিন্তু এতেও বিশেষ আগ্রহ নেই রামকৃষ্ণের। বললে, 'যা নিজের জন্যে রাঁধো, তারই থেকে কিছু নিয়ে এলেই তো ভালো হয়। কী রেঁধেছিলে আজ? লাউশাকের চচ্চড়ি, না, আলুবেগুন-বড়ি দিয়ে সজনেখাড়ার ঘ্যাঁট? তাই নিয়ে এসো না দু-একদিন। তোমার হাতের রান্না খেতে বড় সাধ যায়।'

কেবল খাওয়া আর খাওয়া। এ ছাড়া সাধুর কি আর কোনো কথা নেই? দত্তগিন্নি খুব ভালো সাধুরই খোঁজ দিয়েছে যা হোক। গোপাল-গোবিন্দের কথা নেই, শুধু এ-খাই না ও-খাই। দূর ছাই, আর আসব না। আমি অনাথ-কাঙাল লোক, কোথায় পাব অত ভোজনের পারিপাট্য। নিজের পেট চলে না, এখন আবার অতিথি খাওয়াই!

তাও, যে অতিথি দুয়ারে এসে দাঁড়ায় না, দূর থেকে বসে হুকুম দেয়। দরকার নেই অমন আদিখ্যেতায়। কিন্তু কি হল অঘোরমণির, কদিন যেতে না যেতেই চচ্চড়ি রেঁধে হাজির হল দক্ষিণেশ্বরে।

'দাও, দাও, কী এনেছ বাটিতে করে? লাউশাক না সজনেখাড়া?' হাত বাড়িয়ে বাটিটা টেনে নিল রামকৃষ্ণ। কোনোরকম ভূমিকা না করে খেতে লাগল রসিয়ে-রসিয়ে। বললে, 'আহা, কী রান্না! সুধা! সুধা!'

অঘোরমণির চোখে জল এল। কী এমন রেঁধেছি, সাধু একেবারে স্বাদে-গন্ধে গদগদ হয়ে উঠেছে। কী করুণা এই সাধুর! দরিদ্র বলে উপেক্ষা করল না, সাধারণ ব্যঞ্জনে কী অসাধারণ ব্যঞ্জনা পেল না জানি। এমন একটি মশলা এসে মিশেছে যা বাজারে কেনা যায় না, সেটি হৃদয়-রসের পাঁচফোড়ন। ভক্তি-প্রীতির সম্বরা।

যতই খায় ততই শুধু খাই-খাই। এটা আনো ওটা আনো। এটা রাঁধো ওটা রাঁধো। আর কোনো প্রসঙ্গ নেই, শুধু ভোজনবিলাস! শুধু নোলার শকশকানি। অনেক সাধু দেখেছি জীবনে কিন্তু এমন পেটুক সাধু দেখিনি!

এ তুমি আমাকে কোথায় এনে ফেললে! গোপালের কাছে মনে-মনে কাঁদে অঘোরমণি। এমন সাধুর কাছে আনলে যার খাওয়া ছাড়া আর কথা নেই। ধর্ম-কর্মের ধার ধারে না, যেন খাওয়াই পরমার্থ। এত আমি খাওয়াই কি করে? আমার ভাঁড়ার কি অফুরন্ত?

রাত তিনটের সময় জপে বসেছে অঘোরমণি। জপ সেরে প্রাণায়াম শুরু করেছে, কে একজন তার পাশে এসে বসল। গা ছমছমিয়ে উঠল অন্ধকারে। কে, কে তুমি? চমকে চোখ চেয়ে দেখল—একি, এ যে সেই দক্ষিণেশ্বরের সাধু। ডান হাত মুঠ করে ধরা, যেমনটি দেখেছে দক্ষিণেশ্বরে, আর মুখে সেই মধুর মৃদুল হাসি। এত রাতে এল কি করে এখানে? অন্ধকারে পথ চিনে-চিনে?

আশ্চর্য একটা সাহস হল অঘোরমণির। নিজের বাঁ হাত বাড়িয়ে ধরল রামকৃষ্ণের বাঁ হাত। মুহূর্তে ঘটে গেল অভাবনীয়। পাশে বসে আর সেই প্রৌঢ় রামকৃষ্ণ নেই, তার বদলে একটি দশ মাসের শিশু। নধর নবনীতকোমল। স্নেহদ্রব নবজলধর। একি, এ যে সত্যিকার গোপাল! হামা দিয়ে একেবারে বুকের কাছে চলে এল দেখছি। হাত তুলে মুখের দিকে তাকিয়ে বলছে, 'মা গো, ননী দে।'

এ কি কাণ্ড! অঘোরমণি আকুলকণ্ঠে কেঁদে উঠল : 'বাবা, আমি কাঙালিনী চির-দুখিনী। ননী কোথা পাব? আমি খুদ খাই পাতা কুড়ুই।'

সেকথা শুনে নিবৃত্ত হবার ছেলে নয় গোপাল। অঘোরমণির আঁচল টানে, হাত থেকে মালা কেড়ে নেয়। বলে, 'ও-সব আমি শুনি না। মা হয়েছিস কেন তবে? খেতে দিবি কি না বল—'

শিকে থেকে নারকেল-নাড়ু বের করে অঘোরমণি। ছোট হাতখানি ভরে নাড়ু দেয়। বলে, 'বাবা গোপাল, তোমাকে এ বাসি জিনিস দিতে বুক ফেটে যাচ্ছে—'

তার আগে যে খিদেয় আমার পেট চুপসে যাচ্ছে। বাসি নাড়ু, বাসি নাড়ুই সই। সন্তানবিরহে যে মা উপবাসী, তার সঞ্চিত স্নেহ কি কখনো বাসি হয়?

মুখ ভরে খেতে লাগল গোপাল। উপভোগের আনন্দে চোখের পাতা নাচতে লাগল। কিন্তু খেয়েই কি সে শান্ত হবে? না কি সে শান্ত হবার মত ছেলে? ঘরময় ছুটোছুটি করে বেড়াতে লাগল। কখনো বা অঘোরমণির কোলে, কখনো বা কাঁধে চেপে বসতে লাগল। জপ-তপ ঘুচে গেল অঘোরমণির।

সকাল হলেই ছুটল দক্ষিণেশ্বরের দিকে। ছুটল প্রায় পাগলিনীর মত। অগোছাল চুল, অসামাল বেশবাস। বুকের উপর দুবাহুর মধ্যে কখন উঠে এসেছে গোপাল। তার রাঙা পা দুখানি টুকটুক করছে বুকের উপর।

গোপাল! গোপাল! বলতে-বলতে রামকৃষ্ণের ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল অঘোরমণি। কোনো দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই, রামকৃষ্ণের পাশ ঘেঁষে বসে পড়ল। আর, এরই জন্য যেন অপেক্ষা করছিল রামকৃষ্ণ। ভাবাবেশে অঘোরমণির কোলে চড়ে বসল।

যে দেখল সেই অবাক। বাষট্টি বছরের বুড়ির কোলে আটচল্লিশ বছরের প্রৌঢ় সন্তান! যে ঠাকুর স্ত্রীজাতির ছোঁয়া সহ্য করতে পারেন না তাঁর এ কেমনতরো ব্যবহার! কেমনতরো তা কে বোঝে! একবার মা হয়ে কোলে নিয়েছিল ছেলেকে, রাখালকে, এবার ছেলে হয়ে কোলে বসলো মা'র!

ক্ষীর-সর খাইয়ে দিতে লাগল অঘোরমণি। খাইয়ে দিচ্ছ তো কাঁদছ কেন? অন্তরের স্নেহধারা নয়নের অশ্রুধারা হয়ে বেরুচ্ছে। আমি নন্দরানি—তুমি নন্দদুলাল। তুমি গোপাল আর আমি গোপালের মা—

ভাব সংবরণ করে সরে বসল রামকৃষ্ণ। কিন্তু গোপালের মা'র আর ভাব থামে না। ছেলে সরে বসে, কিন্তু মা'র স্নেহভাবের কি ইতি আছে? সে ভালোবাসায় কি ভাঁটা পড়ে? সেখানে শুধু জোয়ারের জল। শুধু ঢেউয়ের পর ঢেউ। তাই ঘরময় নাচতে লাগল অঘোরমণি। আর গাইতে লাগল, 'ব্রহ্মা নাচে বিষ্ণু নাচে আর নাচে শিব।'

'দেখ দেখ আনন্দে ভরে গেছে। গোপাললোকে চলে গেছে গোপালের মা।' বললে রামকৃষ্ণ।

'এই যে গোপাল আমার কোলে, এই যে আবার তোমার ভেতর—' নৃত্যের আর বিরাম নেই অঘোরমণির: 'আয়রে গোপাল বেরিয়ে আয়, আয়রে আমার কঠিন কোলে—'

এবার ছেলের হাতে কিছু খাও গোপালের মা। ছেলের ভালোবাসার কিছু স্বাদ নাও। নিজের হাতে খাইয়ে দিল রামকৃষ্ণ। বুকে হাত বুলিয়ে ভাবভূমি থেকে নিয়ে এল বাস্তবভূমিতে।

'বড় দুঃখে দিন কেটেছে বাবা। কোথায় ছিলি তুই এতদিন? টেকো ঘুরিয়ে সুতো কেটে দিন কেটেছে। আজ বুঝি তোর দুখিনী মায়ের কথা মনে পড়লো? তাই এত আদর করছিস্ মাকে? বল্, যখন একবার তোকে কোলে পেলাম, আর তুই যাবি না কোল ছেড়ে—'

রামকৃষ্ণ এখন নিজেই রামলালা।

অনেক বলে-কয়ে সন্ধের দিকে পাঠিয়ে দিল অঘোরমণিকে। নিজের বাড়ি

কামারহাটিতে। কিন্তু যখনই পথে নেমেছে, গোপাল কখন ছুটে এসে দিব্যি কোলে চড়ে বসল। তা বসেছিস বোস, বুকে করে নিয়ে যাচ্ছি বাড়ি। কিন্তু বাড়ি এসে এ তুই কী রঙ্গ শুরু করে দিলি? এ কি, আমাকে আজ তুই জপ করতে দিবিনে দুষ্টু ছেলে? বেশ, তাই, করব না জপ, মালার থলে গঙ্গাজলে ফেলে দেব। কিন্তু এখন তুই কী চাস বল তো? এই তো দেখছিস আমার বিছানার ছিরি, শুকনো তক্তপোশের উপর ছেঁড়া মাদুর পাতা। নরম বিছানা-বালিশ আমি পাব কোথায়? শুবি তো শো এই শুকনো কাঠে। শুয়েছে বটে কিন্তু গোপালের স্বস্তি নেই। খুঁতমুত করতে লেগেছে। দুধের শিশুকে কি তার মা এমন কঠিন বিছানায় শুতে দেয়? বালিশ নেই তোষক নেই, এ কী নিষ্ঠুরতা!

'বাবা, আজ এরকমই শোও, কাল কলকাতায় গিয়ে নরম বিছানা করিয়ে দেব।'

বাঁ বাহুর বালিশে গোপালের মাথা রেখে ঘুম পাড়াল গোপালের মা। মাতৃঅঙ্গের স্নেহস্পর্শ পেয়েছে, আর চাই কি গোপালের! অঘোরে ঘুমিয়ে পড়ল।

অঘোরমণিকে দেখিয়ে রামকৃষ্ণ বললে, 'এ খোলটা কেবল হরিতে ভরা। হরিময় শরীর।' মাথা থেকে পা পর্যন্ত হাত বুলিয়ে দিলে। শিশু যেমন মাকে আদর করে তেমনি। পায়ে হাত দিয়েছে বলেও চমকাল না গোপালের মা। ছেলে যদি পায়ে হাত দেয়, মা কি চমকায়, না, প্রসন্ন হয়ে আশীর্বাদ করে?

সেদিন বাড়ি ফেরবার সময় মাকে অনেকগুলি মিছরি দিলে রামকৃষ্ণ। ভক্তরা যত এনেছিল উপহার, সমস্ত। গোপালের মা বললে, 'এত মিছরি দিয়ে কী হবে?'

তার চিবুক ধরে সোহাগ করে বললে রামকৃষ্ণ, 'ওগো, আগে ছিলে গুড়, পরে হলে চিনি, এখন হয়েছ মিছরি। এখন মিছরি খাও আর আনন্দ করো।'

সন্তান কোলে নিয়ে মেয়েরা যেমন কোমর বেঁকিয়ে হাঁটে, তেমনি করে চলে গোপালের মা। 'না বিইয়ে কানায়ের মা।' সর্বজীবে গোপাল দেখে। ক্ষুধার্ত ভগবান মাতৃহৃদয়ের কাছে স্নেহের নবনী ভিক্ষা করে ফিরছেন।

আত্মীয়ের মধ্যে একটি শুধু বেড়াল। বেড়ালের মধ্যে ঠাকুর দেখেছেন কালী, অঘোরমণি দেখছে গোপাল। সেবার ঠাকুর তখন অপ্রকট হয়েছেন, বোসপাড়া লেনের বাড়িতে সিস্টার নিবেদিতার ঘাড়ে বেড়ালটি ঘুমিয়ে আছে। নিবেদিতাও নির্বিকার। এ কি দুর্দৈব, কে একজন স্ত্রী-ভক্ত তাড়িয়ে দিল বেড়ালটাকে।

'আহাহা, কি করলি মা, কি করলি? গোপাল যে চলে গেল, চলে গেল—'

কিন্তু কোথায় সে যাবে? সে যে বস্ত্রাঞ্চলের নিধি। সকাল হতেই চলেছে সে বাগানে মা'র সঙ্গে কাঠ কুড়োতে। পিঠে পড়ে মা'র রান্না দেখতে। পুকুরে নেমে ঝাঁপাই ঝুড়তে।

দিন যায়। অঘোরমণি বুড়ো হয়, কিন্তু গোপাল আর বড় হয় না। চিরকাল মা'র বুকের আঁচল ধরে টানে আর কাঁদে, 'মা খেতে দে, খিদে পেয়েছে—'

কোথায় তুমি খেতে দেবে, তা নয়, তুমিই খেতে চাও! ভ্রমর হয়ে ফিরছ গুঞ্জন করে, গুনগুন করে বলছ, কোথায় ফুলটি ফুটেছে, কে আমাকে একটু মধু দেবে!

॥ দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত ॥

দ্বিতীয় খণ্ড লিখতে নিম্নলিখিত পুস্তকাবলীর উপর নির্ভর করেছি

স্বামী সারদানন্দকৃত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ
শ্রীম-কথিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত
অক্ষয়কুমার সেন প্রণীত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি
উদ্বোধন-প্রকাশিত শ্রীশ্রীমায়ের কথা
ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্যকৃত শ্রীশ্রীসারদা দেবী
শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত লিখিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ অনুধ্যান
বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল প্রণীত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলামৃত
স্বামী বামদেবানন্দ রচিত সাধক রামপ্রসাদ
শ্রীঅমৃতলাল সেনগুপ্ত লিখিত শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী
স্বামী জগদীশ্বরানন্দকৃত নবযুগের মহাপুরুষ
শ্রীচন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায় রচিত শ্রীশ্রীলাটুমহারাজের স্মৃতিকথা
উদ্বোধন-প্রকাশিত স্বামী ব্রহ্মানন্দ
শ্রীকমলকৃষ্ণ মিত্র প্রণীত শ্রীরামকৃষ্ণ ও অন্তরঙ্গ প্রসঙ্গ
লক্ষ্মী দেবী ও যোগীন্দ্রমোহিনী বিশ্বাসকৃত শ্রীরামকৃষ্ণস্মৃতি
স্বামী বিবেকানন্দ লিখিত পওহারী বাবা
শ্রীপ্রমথনাথ বসু রচিত স্বামী বিবেকানন্দ
বিবেকানন্দের পত্রাবলী
স্বামী ওঙ্কারেশ্বরানন্দকৃত প্রেমানন্দ জীবনচরিত
চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত বিদ্যাসাগর জীবনী
শিবনাথ শাস্ত্রীকৃত আত্মচরিত
শিবনাথ শাস্ত্রী লিখিত মেন আই হ্যাভ সিন
স্বামী গম্ভীরানন্দ রচিত শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তমালিকা